ঈমানী শক্তির অলৌকিক ধারা

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর
ইতিহাসখ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনীসম্বলিত উপন্যাস....

শেষ আঘাত

২

আলতামাস

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

শেষ আঘাত
[দ্বিতীয় খণ্ড]

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
অনূদিত

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর ইতিহাসখ্যাত রোম ও মিসর অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

শেষ আঘাত

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদ

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

আল-এছহাক প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১২ ইং
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০১৬ ইং

ঐতিহাসিক উপন্যাস
শেষ আঘাত ২ [দ্বিতীয় খণ্ড] : এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস
অনুবাদ : মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন: ০২৭১২৩৫২৬, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ১৬০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র

984-837-062-5-[SET]

আমার কথা

'শেষ আঘাত' প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পেতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেলো। যদিও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো অনেক আগেই। তবুও প্রকাশকের একান্ত আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও 'সিডিউল বিজির' কারণে এই বিলম্বটুকু হয়েই গেলো। তাই পাঠকের কাছে বিনীত দুঃখ প্রকাশ করছি।

শেষ আঘাত দ্বিতীয় খণ্ড এমন কাহিনী অবলম্বনে উপস্থাপিত হয়েছে পাঠকের চোখে কখনো কখনো তা অবিশ্রুত বা অলৌকিক মনে হতে পারে। অতি দৈব ঘটনা বলেও মন্তব্য করতে পারেন পাঠক। সত্য কথা হলো, এসব কাহিনী বা ঘটনা ইতিহাসের প্রামাণ্য নির্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। সত্যনিষ্ঠ পাঠক এ থেকে ইতিহাসের অনিন্দ্য পাঠ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

—মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

প্রকাশকের নিবেদন

আশাতীত না হলেও এক প্রকার স্বস্তির সঙ্গেই বলা যায়, ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে এক সময় যে শূন্যতা ছিলো আজ তার অনেকটাই কেটে গেছে। এক ঝাক সৃজনপিয়াসী প্রতিভাধর আলেম নিরলস সাহিত্য চর্চার আলোকে বাংলা ভাষাকে প্রতিনিয়ত করে তুলেছে আরো সমৃদ্ধময়। এক্ষেত্রে কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক উপন্যাস উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে গড়ে উঠে বিপুলসংখ্যক ইসলামমুখী পাঠক শ্রেণী।

বলা বাহুল্য, এ সব নান্দনিক ও পাঠক প্রিয় সাহিত্যকর্ম প্রকাশনায় "আল-এছহাক প্রকাশনী" বরাবরই অগ্রণী থাকার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযী-এর সবগুলো জনপ্রিয় উপন্যাসের অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশ করে আমরা পাঠক মহলের কাছ থেকে পেয়েছি বিপুল সাড়া। বিদগ্ধ পাঠকমহলেরই উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়ে উপমহাদেশের আরেক প্রবাদতুল্য ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস-এর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোও সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে "আল-এছহাক প্রকাশনী"।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পেলো এনায়েতুল্লাহ আলতামাস-এর 'শেষ আঘাত' প্রথম খণ্ডের পর 'শেষ আঘাত' দ্বিতীয় খণ্ড। বিশিষ্ট আলেম, সাহিত্যিক, পাঠকপ্রিয় লেখক অনুবাদক মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন এর অনুবাদ করেছেন, তার অনুবাদে সবসময় মৌলিককতার স্বরূপ আরো শিল্পায়িতভাবে বিস্তৃত হয়। বিদগ্ধ পাঠককে যা আরো আকির্ষত ও আলোড়িত করে তুলে। এই বইতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে ২য় খণ্ডের প্রকাশনায় অনাকাংখিত বিলম্ব ঘটায় পাঠকের কাছে বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

— তারিক আজাদ চৌধুরী

মুহাফিজ দলের কমান্ডার তার দায়িত্ব পালনে বের হয়ে গেলেন। প্রথমেই আশপাশের এলাকার বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ অশরিরীকে কোথায় কোথায় দেখা গিয়েছে?

তারা কয়েকটি স্থানের কথা বললো। আর দু'জন লোক নির্দিষ্ট করে একটি স্থানকে চিহ্নিত করলো।

কমান্ডার তার মুহাফিজ বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে শহরের এমন এমন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন। যেখানে ঘন বন-জঙ্গলের সংলগ্নতা রয়েছে।

সূর্যাস্ত তখনো হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে জঙ্গুলে এলাকায় আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। এ সময় এক দল মুহাফিজ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের একটি চিৎকার শুনতে পেলো।

'আমি হেরাক্লের রক্ত পান করতে যাচ্ছি।'

এ শব্দটিও চিৎকারের সঙ্গে ভেসে এলো। মুহাফিজদের এই দলটি আরেক মুহাফিজ দলকে জানালো। তারা সেখানে এসে গেলো। চৌদ্দ পনেরজন মুহাফিজ একত্রিত হয়ে গেলো।

দলের মধ্যে প্রৌঢ় একজনকে ওরা কমান্ডার বানিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। কমান্ডার বলে দিলেন, সবাই মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করে ও কুরআন শরীফের কোন এক আয়াত পড়তে পড়তে অগ্রসর হও। একটু পর পর অশরিরীর ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যেতে লাগলো। তার ছুটন্ত পদশব্দও যেন বার কয়েক শোনা গেলো।

অবশেষে সেই প্রেত বা অশরীরিকে দেখা গেল। লোকেরা তার যে অববের বর্ণনা দিয়েছিলো তাকে সে অবয়বেই পাওয়া গেলো। মুহাফিজরা প্রায় ঘেরাওয়ের মতো করে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। আর সে আস্তে আস্তে পেছন দিকে হটেছিলো। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছিলো।

'তুমি যদি ভূত-প্রেত বা অশরিরী কিছু হয়ে থাকো এখনি অদৃশ্য হয়ে যাও'– প্রৌঢ় কমান্ডার বললেন এবং তার বর্শাটি এমনভাবে উঠালেন যেন ছুড়ে মারবেন। তিনি আবার বললেন– 'তুমি মানুষ হলে আমাদের সঙ্গে চলো। তোমাকে আমরা মানুষের মতোই

যথাযোগ্য মর্যাদা দেবো। আমরা তোমাকে ভয় পাচ্ছি না। তুমিও আমাদেরকে ভয় পেয়ো না।'

'আমাকে হেরাকলের কাছে পৌছে দাও'- সে যেই হোক, চিনচিনে কণ্ঠে বলে উঠলো- 'আমার রক্ত ঝরিয়েছে হেরাকল। আমি ওর রক্ত পান করতে যাচ্ছি।'

'শোন মেয়ে! আমরা তোমাকে হেরাকলের কাছে পৌছে দেবো'- কমান্ডার বললেন- 'তুমি জানো হেরাকল আমাদেরও দুশমন। আমরাও তাকে কতল করতে চাই। আমাদের একজন সৈন্য তোমার সাথে যাবে। তুমি এতে নিরাপদেও থাকবে। আবার তোমার কাজটিও সে সেরে আসবে!'

কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতে বর্শাটিও ধরে রাখলেন। কমান্ডার বড় আদুরে গলায় তার সুরে সুরে এটা ওটা বলে তার দিকে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন। একেবারে কাছে গিয়ে তাকে বললেন,

'চলো আমাদের সাথে। তোমাকে আমরা ইয্যত সম্মান দিয়েই নিয়ে যাবো'।

মেয়েটি খুব স্বাভাবিকভাবে কমান্ডারের সাথে হাটতে লাগলো। ঘোড়ার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে দেয়া হলো। আর এক মুহাফিজ ঘোড়ার লাগাম নিজ হাতে নিয়ে নিলো। অন্যরা সবাই যার ঘোড়াতেই সওয়ার ছিলো। সবাই আবার গন্তব্যের দিকে রুখ করলো।

মুহাফিজদের সবার নজর নিবিষ্ট রইলো মেয়েটির ওপর। সবাই আশংকা করছিলো এই বুঝি মেয়েটি এখনই গায়েব হয়ে যাবে। কিন্তু সালারের তাঁবু পর্যন্ত পৌছেও সবাই দেখলো মেয়েটি গায়েব হয়নি।

✪ ✪ ✪

সূর্যাস্ত অনেক আগেই হয়েছে। সালার তার মুহাফিজদের প্রতীক্ষায় ছিলেন বড় ব্যাকুল হয়ে। তিনিও এ আশংকা করছিলেন, তার মুহাফিজরা সত্যিকার কোন অশরিরীকেই ধরতে বের হয়েছে। তাহলে তো মুহাফিজরা তার দ্বারা আক্রান্তও হতে পারে। কে জানে, এতক্ষণে তাদের বড় কোন ক্ষতি হয়ে গেছে কি না। ---- তিনি এসব ভাবছিলেন। এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, মুহাফিজরা একটি মেয়ে নিয়ে এসেছে। সালার হয়রান হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, শুধু কমান্ডার যেন মেয়েটিকে নিয়ে আসে। আর অন্য কারো তাঁবুর ভেতর আসতে হবে না।

ইতিমধ্যে তাঁবুর বাইরে সিপাহী ও শহরবাসীসহ অনেক মানুষ জমা হয়ে গেছে। শহরবাসীদের মধ্যে যারা সালারের কাছে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা এক প্রেতাত্মা

দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে– তারাও ব্যকুল হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলো। সবাই এক নজর ঐ প্রেতাত্মাকে দেখতে চায়। তার কথা শুনতে চায়। সালারকে জানানো হলো, বাইরে শত শত মানুষ জমা হয়ে গেছে। প্রেতাত্মা দেখার জন্য তারা অস্থির হয়ে উঠেছে। সালার তো মেয়েকে দেখেই নিশ্চিত হয়ে গেছেন এ মেয়ে নিঃসন্দেহে কোন মানবী। তিনি সরদার গোছের কয়েকজনকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

দশ বার জনের একটা দল তাঁবুর ভেতর ঢুকলো। সালার সবাইকে বসালেন। সবার পলকহীন দৃষ্টি এখন এক যোগে মেয়েটির ওপর।

মেয়েটি অলস চোখে এদিকও দিক তাকাচ্ছে। সে যে এত মানুষের ভিড়ে মধ্যমনি হয়ে বসে আছে, সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

'তোমার নাম কি মেয়ে' ? – সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার নাম ইউকেলিস'– মেয়েটি জবাব দিলো।

লোকদের মধ্যে কানাঘূষা শুরু হয়েগেলো। একজন বলে উঠলো, 'এতো পুরুষালী নাম। 'এমন নাম রুমীয়দের হয়ে থাকে'।

'আমার নাম ইউকেলিস– মেয়েটি যেন রেগে গেলো– 'আর ইউকেলিস হলো রোজী .... ইউকেলিস জীবিত আছে আর রোজী কতল হয়ে গেছে।'

'রোজীকে কে হত্যা করেছে ?' – সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'হেরাক্ল। অমি হেরাকলকে কতল করতে যাচ্ছি। আমি ওর রক্ত পান করবো .... যে পথ ধরে হেরাকল পর্যন্ত পৌছা যাবে তোমরা কেউ আমাকে সে পথ দেখিয়ে দাও।'

'তুমি কি নিজের আত্মা না দেহ ?' – সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার আত্মা ইউকেলিস। আর ইউকেলিসের আত্মা আমার মধ্যে–' মেয়েটি জবাব দিলো।

'রোজী কার মেয়ে ? সে কোত্থেকে এসেছে ? –' সালার জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি এর উত্তরে বিড় বিড় করে কি যেন বললো। কে কেউ কিছুই বুঝলো না। সালার নিশ্চিত হলেন, এ মেয়ের মানসিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এ মেয়ের ব্যাপারে কি করবেন না করবেন তার ফয়সালা করা সালারের জন্য মুশকিল হয়ে গেলো। মুসলিম সালারের জায়গায় কোন রোমীয় জেনারেল হলে এতক্ষণে এ মেয়েকে পাগল সাব্যস্ত করে কতল করতো এবং তার লাশ জঙ্গলে ফেলে দেয়ায় নির্দেশ দিতো। কিন্তু কোন মুসলিম সালারের পক্ষে এ ধরণের চিন্তাও অসম্ভব। কারণ, ইসলামে কোন সালার বা জেনারেলের হুকুম চলে না, বরং এখানে চলে মহান আল্লাহর হুকুম।

যা হোক, সালার ঐ মেয়ে অর্থাৎ রোজীকে মুজাহিদদের নারীমহলে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েকে ভালো করে গোসল করিয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন। সেখানে শহরের লোকেরা এখনো বসে আছে।

'এখন আমাকে পরামর্শ দিন'— সালার উপস্থিতিদের উদ্দেশ্যে বললেন— 'এ মেয়েকে আমি কারোও ঘরেও রাখতে পারছি না, আবার তার এ অবস্থায় তাকে আমি এখান থেকে বেরও করে দিতে পারছি না। ওর দেখভাল ও আবরু ইজ্জতের হেফাজত করা আমার দায়িত্ব। তাই কোন নিষ্ঠাবান ও সহৃদয় কারো কাছে এ মেয়ের ভার ন্যস্ত করতে চাই। যে তার দায়িত্ব নেবে তার ঘরে সে তাকে রাখবে! আমার বিশেষ ডাক্তার তার চিকিৎসা করবে।হয়তো সে সুস্থ হয়ে একদিন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে।'

সবাই একেবারে চুপসে গেলো। এর অর্থ হলো, একটি পাগল মেয়ের দায়িত্ব নিতে কেউ প্রস্তুত নয়। সবার পেছনে তিনজন লোক বসা ছিলো। তারা পরস্পর কি যেন বলাবলি করতে লাগলো।

'আমীরে ইন্তাকিয়া! – তাদের একজন বললো— 'আমরা তিনজন মিসর থেকে এসেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ করে এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদের কাছে শুনতে পেলাম এখানে একটি প্রেতাত্মা ধরে আনা হয়েছে। তাই কৌতূহলী হয়ে আপনার তাঁবুতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ মেয়ে জলজ্যান্ত একজন মানবী। আমরা নিশ্চিত এ মেয়ে মুসলমান নয়। কোন খ্রিস্টান গোত্রের। আমরা কিবতী খ্রিস্টান। আমাদের বিশ্বস্ত মনে হলে ওকে আমাদের কাছে হাওলা করে দিন। আমরা ওকে নিয়ে যাবো। ওর চিকিৎসাও করবো। সুস্থ হয়ে গেলে ওকে আমরা ওর ঠিকানায় পৌছে দেবো। আর যদি বিয়ে বসতে রাজী হয় উপযুক্ত পাত্র দেখে ওকে পাত্রের হাতে সোপর্দ করে দেবো। এ মেয়ের রূপ যৌবন ওর জন্য বিপদ ডেকে আনবে নিশ্চিত। ও যেহেতু খ্রিস্টান আর আমরাও খ্রিস্টান তাই ওকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে ওর দেখভাল করবো।'

এ প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকজন আওয়াজ তুললো। যারা নিরব ছিলো তাদের চোখে মুখেও প্রত্যাখ্যানের আভাস দেখা গেলো না। সালার তাই ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন, রোজীকে ওদের হাতেই তুলে দেয়া হবে।

'রোজী যদি তোমাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে তাহলে কি হবে ? – সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমীরে ইন্তাকিয়া! – সে লোক বললো— 'এ মেয়ে তো এখন অবোধ শিশুর মতো। তার মাথায় একটা জিনিসই এখন খেলা করছে। আর তাহলো, সে হেরাকলকে কতল করতে যাচ্ছে। আমি ওকে বলবো, আমার সঙ্গে চলো। আমরা দু'জনে মিলে হেরাকলকে কতল করবো।'

তার একথায় সবাই মাথা হেলিয়ে সায় দিলো। লোকটি যে মোটামুটি বুদ্ধিসম্পন্ন এতে এটাও প্রমাণিত হলো।

সালার রোজীকে ডাকিয়ে আনালেন। রোজী যখন তাঁবুতে প্রবেশ করলো পুরো তাঁবু স্তব্ধ হয়ে গেলো। গোসল করিয়ে এখন ভালো কাপড় পরানো হয়েছে ওকে। তারপর উপাদেয় খাবারও খাওয়ানো হয়েছে। এতেই তার রূপের পাখা যেন পতপত করে উড়ছে। সবিস্ময়ে সবাই ওকে দেখছিলো। সালার ওকে জানালেন, ওর জন্য তিনজন লোককে তৈরি করা হয়েছে। হেরাকলকে কতলের ব্যাপারে ওকে তারা সাহায্য করবে।

রোজীর ঠোঁটে আশ্বস্তের হাসি ফুটে উঠলো। তিন কিবতী খ্রিস্টান বিশ্বস্ত সূরে ওর সঙ্গে কথা বললো। ওরা যে রোজীর জন্য নিরাপদ ও সাহায্যকারী সঙ্গী হবে এটা তাদের কথাবার্তা ও আচরণে ফুটিয়ে তুললো। রোজীও তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলো।

সালার শেষ ফয়সালা শোনালেন, আজ রাতে এ মেয়ে মুজাহিদদের নারী মহলে মেহমান হিসেবে থাকবে। কাল সকালে তিন কিবতী ওকে নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে অতিরিক্ত দুটি ঘোড়াও দিয়ে দেয়া হবে।

✪ ✪ ✪

পর দিন ফজরের পর যথারীতি তিন কিবতীর কাছে রোজীকে সোপদ করে দেয়া হলো। ওরা সামুদ্রিক জাহাজে মিসর রওয়ান হয়ে গেলো।

জাহাজেও রোজীর মুখে ঐ একই জপ। আমি হেরাকলকে খুন করতে যাচ্ছি। ওর রক্ত পান করতে যাচ্ছি। আর ঐ তিন কিবতী ওকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে যে, তারা ওকে সব রকম সাহায্য করবে। রাতে রোজী তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়তো। আর তিন কিবতী জাহাজের মাস্তুলে বসে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আড্ডা মারতো। গভীর রাতে ওরা যেতো ঘুমাতে।

'হুরশিস! – ঐ তিনজনের একজন তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'আমার মনে হয় তোমার মেয়ে বেঁচে গেছে। মনে হচ্ছে এ মেয়ে কুমারী হবে।'

'আশা তো করি তাই'– হুরশিস বললো– 'আমি তো এক প্রকার প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার মেয়েকে এবার বলি দেয়া হবে। শোক বেদনায় তখন তো আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। খোদার বিশেষ রহমত। এ মেয়েটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের আসকাফ (খ্রিস্টান পাদ্রী) একে গ্রহণ করলে মেয়ে হারানোর চরম শোক থেকে আমি বেঁচে যাবো।'

'বেঁচে তো যাবে অবশ্যই। খোদার মদদ তুমি পেয়ে গেছো– হুরশিসের আরেক সঙ্গী বললো।

রোজীকে পেয়ে হুরশিস অনেক বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে। সে বিপদ তার জন্য অনাগত এক শোকের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। যা তার জন্য সহ্য করা ছিলো অসম্ভব ব্যপার। ইন্তাকিয়ার আমীর বা সালারের এতটুকু সন্দেহ জাগেনি যে, এ লোক সহানুভূতি ও সহমর্মীর আড়ালে তাকে ও রোজীকে অনেক বড় এক ধোকা দিয়েছে। রোজীর তো এ ব্যপারে জানার কথা নয়। সে তো এখন বুদ্ধিলুপ্ত এক অবলা নারী।

হুরশিসের এ প্রতারকের ভূমিকায় আসার প্রেক্ষাপটটা এরকম, কিবতী খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রতি বছর এক বিশেষ রাতে কোন যুবতী কুমারী মেয়েকে নীল দরিয়ার বলি দিয়ে থাকে। তবে যে মেয়েকে বলি দেয়া হতো তার মা বাবার এক ধরণের সম্মতিও তাতে থাকতো। জোর জবরদস্তি করে কোন মেয়েকে নীল দরিয়ায় বলি দেয়া হয়েছে এরকম কখনো হয়নি। তবে বলি দেয়ার জন্য কুমারী মেয়ে অত্যাবশ্যকীয় ছিলো। আর এ বলি দেয়ার দায়িত্ব পড়তো পালা করে বিভিন্ন গোত্রের ওপর।

এবার যে গোত্রের পালা সে গোত্রে একমাত্র হুরশিসের যুবতী মেয়েই কুমারী রয়ে গেছে। অন্যান্য মেয়েরা হয় খুব ছোট ছোট, না হয় বিবাহিতা। আসকাফ (পাদ্রী সরদার) হুরশিসকে ডেকে বলে দিয়েছেন, এ বছর তার মেয়েকে বলি দেয়ার পালা।

এই একটি মাত্র মেয়ে হুরশিসের। তার আর কোন সন্তানও নেই। মেয়েটি হুরশিসের বড় আদরের। যদিও আসকাফ ওদের সম্মতি ছাড়া মেয়েকে বলি দিতে পারবে না। তবুও হুরশিস জানে, সে তার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গুরুর হুকুম প্রত্যখান করতে পারবে না। এ কারণে হুরশিসের বাড়ি তো এখনই শোকের বদ্ধ বাতাসে ভারী হয়ে উঠছে।

হুরশিস তো তার মেয়ের মাকে এ নিয়ে ভীষন বকা ঝকা করতো। সে সব সময় বলে এসেছে, তার মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে। সে কথা শুনলে আজ তার এ অবস্থা হতো না। তাছাড়া তার মেয়েও এই বলির জন্য প্রস্তুত নয়। সে তো ক্ষোভে দুঃখে এই হুমকিও দিয়েছে যে, গির্জায় দাঁড়িয়ে আসকাফে আজীমকে সে বলবে, তার বিয়ে না হলেও সে কুমারী না। সে দুই যুবকের সঙ্গে পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। এজন্য তার বলি নীল দরিয়া গ্রহণ করবে না। তখন নীলনদ শুকিয়ে যাবে।

অবশ্য হুরশিস ও তার স্ত্রী তাদের মেয়েকে সব সময় বুঝিয়ে আসছে, এ ধরণের কথা বললে তাদের বংশের মুখে চুনকালি মাখা হবে। আমরা তখন সমাজে বাঁচবো কি করে! তাছাড়া তখন এ দুর্ণামও রটে যাবে যে, এ মেয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা পর্যন্ত বলতে পারলো!

মিসরে যেহেতু হেরাকলের শাসন চলতো, তাই হেরাকল সারা দেশে সরকারিভাবে ভিন্ন মতবাদের এক খ্রিস্টধর্ম চালু করেছিলেন। সে হিসেবে এ বলি প্রথাও চিরতরে নিষিদ্ধ

ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই কিবতী খ্রিস্টানরা সরকারি খ্রিষ্ট ধর্মের বিরোধী ছিলো। তাই দিনের পরিবর্তে রাতের বেলা এ বলিদান প্রথা পালন সম্পন্ন করতো।

সে বলি দেয়ার রাতের আর মাত্র দেড় দু'মাস বাকি। এদিকে হুরশিসের ব্যবসার প্রয়োজনে কয়েক জায়গায় সফরে বের হতে হয়। সে সূত্রেই সে এ অঞ্চলে এসেছিলো। ব্যবসার কাজ শেষ করে তাকে এখন মিসর যেতে হবে। মিসরগামী জাহাজ ছাড়ে ইন্তাকিয়া নৌবন্দর থেকে। এই ইন্তাকিয়ায় এসে প্রেতাত্মার রহস্যময় গল্প শুনতে পায় নানান জনের কাছে। তারপর প্রতারণা করে রোজীকে পাওয়ার ঘটনা ঘটে।

ইন্তাকিয়ার সালার যখন জিজ্ঞেস করেন, এ মেয়েকে কে দেখভাল করবে তখনই হুরশিসের মাথায় এ বুদ্ধির উদয় হয়। সে এ বিষয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। সঙ্গীরা জোর সমর্থন করে তাকে বলে, যেভাবেই হোক এ মেয়েকে নিয়ে নাও। এভাবে রোজী হুরশিসের দখলে চলে আসে।

জাহাজে রোজী হেরাকলের বিরুদ্ধে যাই বলতো হুরশিস ও তার সঙ্গীরা তাতেই তাল মেলাতো। একদিন জাহাজের ডেকে ওরা রোজীকেও নিয়ে আসে। কথায় কথায় হুরশিস রোজিকে জিজ্ঞেস করে, সে কুমারী কি না?'

'আরে বলে কি এ লোক'? –রোজী খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলে- 'আমাদের নবী ঈসা (আ) এর মা যেমন কুমারী ছিলেন আমিও তেমনি কুমারী... কেন জিঙ্গেস করছো একথা'।

'না কোন সন্দেহ থেকে জিঙ্গেস করিনি'– হুরশিস বললো– 'বুযুর্গরা বলেছেন, কোন মাজলুম কুমারী মেয়ে যদি কোন জালিমকে হত্যা করে তাহলে এতে কোন পাপ হয় না। হেরাকলের চেয়ে বড় জালিম বাদশাহ আমরা কখনো দেখিনি'।

জাহাজ এ সময় ইসকান্দারিয়ার নৌবন্দরে গিয়ে নোঙ্গর করে। যাত্রীরা জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে নেমে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে চলে যায়। হুরশিস ইসকান্দারিয়া থেকে বেশ দুরের এক গ্রামে থাকে। তাই তার গন্তব্যে পৌঁছতে রাত গভীর হয়ে যায়।

পর দিন সকালে হুরশিস তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অভিভাবক আসকাফে আজমের গ্রামে পৌঁছলো। তারা তাদের আসকাফের সঙ্গে তার গির্জায় গিয়ে সাক্ষাত করলো। সাক্ষাতে হুরশিস আসকাফকে কল্পিত এক কাহিনী শোনালো।

ইন্তাকিয়ায় তাদের সঙ্গে এক কিবতী খ্রিস্টানের দেখা হয়। সেই কিবতীর ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, দিন আনি দিন খাই এমন দুরাবস্থায় পৌঁছে গেছে। স্বপ্নযোগে হযরত ঈসা (আ) তাকে বলেছেন,

'তোমার যে যুবতী মেয়ে আছে ওকে নীল দরিয়ার নামে কুরবানী দাও। তোমার ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আর নীল দরিয়ার অধিবাসীদেরও কল্যাণ হবে এবং তাদের দুআয় তোমার আরো অনেক উন্নতি ঘটবে।

হুবশিসের সঙ্গীরাও গির্জায় গিয়েছিলো তার সঙ্গে। তারাও হুরশিসের কথায় সমর্থন করে বললো, ঐ কিবতী খ্রিস্টান তার মেয়েকে হুরশিসের কাছে হাওলা করে বলেছে, এ বছর যেন তার মেয়েকে আসফাকে আজম মেহেরবানী করে বলির জন্য গ্রহণ করেন।

হুরশিস বললো, 'এই মেয়েকেই বলির জন্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ, সে এক আমানত হিসেবে এসেছে। এর যেন কোন খেয়ানত না হয়'...

আসফাক আরো কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করে বললেন, ঐ মেয়েকে যেন তার সামনে উপস্থিত করা হয়।

পর দিন সকালে রোজীকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হলো। গির্জার আসকাফ তাকে এক নজর দেখে শুধু জিজ্ঞেস করলেন. সে তার সম্মতি দিয়েছে কি না। রোজীর তো এই প্রশ্নের মর্ম বোঝার কথা নয়। সেও জবাবে বললো, হ্যাঁ, সে এ ব্যপারে তার নিজ ইচ্ছাতেই এসেছে। রোজীর তো জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে অনেক আগেই। সে সাচ্ছন্দে কথা বলছিলো। যেন সে সব কিছুই জানে। আসকাফ তাকে বলির জন্য গ্রহণ করে নিলেন।

✪ ✪ ✪

হুরশিস ও তার স্ত্রী রোজীকে বেশ যত্ন করে তাদের ঘরে রেখেছে। রোজী যা চায় সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করে দেয়। যা বলে তাতেই সবাই সায় দেয়। দিনকে রাত বললেও স্বামী স্ত্রীর কেউ দ্বিমত করে না। দেখতে দেখতে রোজীর জীবনের শেষ দিনটি এসে গেলো।

যে রাতে তাকে নীল দরিয়ায় নিক্ষেপ করে কিবতী সম্প্রদায়ের কুমারী বলি প্রথা সম্পন্ন করার কথা ছিলো। সেদিন সন্ধ্যায় হুরশিস রোজীকে গির্জায় নিয়ে গেলো। তাকে হুরশিসের মেয়ের অতি মূল্যবান কাপড় পরানো হলো। তার পুরো শরীর হুরশিসের মেয়ের অলংকারে ভরে দেয়া হলো। রোজীর অঙ্গে অঙ্গে এখন সোনাদানার প্রাচুর্যে ভরপুর। কুমারী বলি দেয়ার সময় এভাবে বহু দামী পোষাক ও সোনা দানায় কুমারীকে সাজানো হয়ে থাকে।

আগে তো এ প্রথা চার দিক ঘোষণা করে পালন করা হতো। দলে দলে লোকজনও তা দেখার জন্য নীল দরিয়ার তীরে ভিড় করতো। কিন্তু সরকারিভাবে এ প্রথা বিলুপ্ত করার পর থেকে কিবতীরা তা গোপনে পালন করে। এখন শুধু গোপনীয়তাই অবলম্বন করা হয় না, চার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় সরকারি লোকজন দেখে ফেলে কিনা।

লোকালয় থেকে বেশ দূরে নীল দরিয়ার তীরে রোজীকে নিয়ে যাওয়া হলো। হুরশিস রোজীকে বলেছিলো, নদীতে বড় এক নৌকা আসবে। তাতে চড়ে তাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আসকাফ ও কবীলার দু' চারজন লোক ছাড়া অন্য কোন মানুষ ছিলো না।

আসকাফ রোজীকে এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত পানির ঝাপটা দিলেন। তারপর তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কি যেন পড়লেন। তারপর তার দু' কাঁধে পালা করে হাতের আঙ্গুলগুলো বুলিয়ে গেলেন। বুকের ওপরও আঙ্গুল ছোঁয়ালেন। তারপর তার বাহু ধরে নদীর তীরে নিয়ে গেলেন। নদীর এই তীরটি বেশ উঁচু। আসকাফ হঠাৎ রোজীকে পেছন থেকে ধাক্কা মারলেন। রোজী নদী গহ্বরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রোজী ছিলো স্বীয় গোত্রের কন্যা সরদার। অত্যন্ত সৌখিন ও চঞ্চলা মেয়ে ছিলো রোজী। ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহমান ফুরাত নদী। রোজী প্রতিদিনই তার কয়েকজন বান্ধবী নিয়ে নদীতে সাতার কাটতে যেতো। সাতারে ক্রমেই রোজী এত দক্ষ হয়ে উঠলো যে, সাতরাতে সাতরাতে সে মাঝ নদীতে চলে যেতো। নদী যেখানে তরঙ্গে উম্মত্ত, সেখানেও সে অনায়াসে চলে যেতো। এজন্য তার সরদার বাবা দু'জন লোক নিয়োগ করে দিয়েছিলো। রোজী নদীতে গেলে তারা নদীর তীরে হাজির থাকতো। যাতে কোন বিপদ হলে উদ্ধার করতে পারে।

সেই ফুরাত নদীর রোজীকে ফেলা হয়েছে নীল দরিয়ায়। নদীতে নিক্ষেপিত হওয়ার পরই তার অবোধ চিন্তা চেতনা যেন ক্রমেই পাল্টে যেতে লাগলো। তার ভেতরে বেঁচে থাকার পরম আকুতি জেগে উঠলো।

নদীতে পরে তাই আর ওপর দিকে সে ভেসে উঠলো না। আত্মরক্ষার তাগিদে মনের অজান্তেই তার স্বভাবজাত নিপুণতায় পানির নিচ দিয়েই সে সাতরাতে লাগলো। একটু পর পর মাথা ওপরে তুলে শ্বাস নিয়ে নিয়ে নদীর বিপরীত তীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। অন্ধকারে তাকে দেখার মতো কেউ ছিলো না। আর দেখবেই বা কে? যারা ওকে নদীতে ফেলেছে তারা তো সেই কখন সেখান থেকে চলে গেছে। কারণ, সরকারি বাহিনীর হাতে তাদের ধরা পড়ার আশংকা ছিলো।

অনেক দূর ঘুরে রোজী বিপরীত দিকের তীরে গিয়ে উঠলো। সর্বপ্রথম তার অনুভূতি হলো, সে যেন একটি স্বপ্ন দেখছিলো। আচমকা স্বপ্ন ভেঙ্গে সজাগ হয়ে গেছে। চিন্তা চেতনার প্রকৃত ধারা সে ধীরে ধীরে ফিরে পেতে লাগলো। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে হয়রান হয়ে গেলো সে। এমন মূল্যবান পোশাক ও ভূরি ভূরি সোনার অলংকার কে পড়ালো তাকে।

সে ভেবে পেলো না এখন কি হবে? এখানে কি করে এসেছে আর? এ জায়গাটাই বা কোথায়? কিছুই মনে করতে পারলো না। চরম ক্লান্তি তাকে চেপে ধরলো। সে ধপাস করে নদী তীরের বালিতে বসে পড়লো।

✪ ✪ ✪
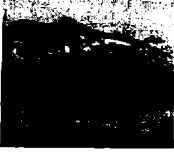
নদী তীরের রাত তো ছিলো গভীর অন্ধকার কিন্তু রোজীর মস্তিষ্ক তখন আলোকিত হয়ে উঠলো। তার যুদ্ধের কথা মনে পড়লো... রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ... আচমকা ভেসে উঠলো ইউকেলিসের মুখটা। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। রিলের সুতার মতো খণ্ড খণ্ড কতগুলো দৃশ্য তার স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠতে লাগলো। ইউকেলিস রক্তে ভেসে যাচ্ছে... চরম যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর রোজী তাকে খুজে ফিরছে... তারপর...

.. ইউকেলিসের লাশ... কোন এক বাড়িতে ইউকেলিসের মার লাশ ... রোজীর মনে পড়ে গেলো... এই লাশ দেখেই রোজীর কিছু একটা হয়ে গিয়েছিলো। সে স্বপ্ন ও অলীক এক জগতে চলে গিয়েছিলো। বাস্তবতার জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

আবেগ ও উত্তেজনার চরমতা ওর বুদ্ধি-চেতনা স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। সে পাগল না হলেও এই বাস্তবতা গ্রহণ করতে পারছিলো না। এখন বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এসে সে আরেকটি ধাক্কা খেলো। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়তে লাগলো।

মনে পড়লো তার হেরাকলের কথা। সে হেরাকলকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো। .. তারপর হারিয়ে গেলো জঙ্গলে... তাকে প্রেতাত্মা ভাবা হচ্ছিলো। কেউ তার সামনে এলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। আর রোজী তার খাবারের পুটলিগুলো ছিনিয়ে নিতো... এভাবে তাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণাও খুব একটা সইতে হয়নি।

তার মনে পড়লো। কয়েকজন লোক বড় আদর যত্ন দিয়ে তাকে সামুদ্রিক জাহাজে করে অন্য আরেক জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, তারা মিসরের নাম নিয়েছিলো। এখন রোজী নিশ্চিত হয়ে গেলো সে এখন মিসরে। মনে পড়লো। এক মহিলা খুব যত্ন করে তাকে বহু মূল্যের পোশাক ও অলংকারাদি পরিয়েছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো, সে এখন হেরাকলকে হত্যা করতে যাচ্ছে। ইউকেলিসের খুনের প্রতিশোধ নিতে পারবে বলে সে দারুণ আনন্দিত ছিলো।

রোজীর অতীত তার মস্তিস্কে ভেসে উঠতে লাগলো; কিন্তু অনেকটা ধাঁধার মতো। তবে যে বাস্তবতার সম্মুখীন সে এখন হয়েছে সেটা অনেক খোলামেলা। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর সে পাচ্ছিলো না যে, এই গভীর নদীতে কেন ওকে ফেলে দেয়া হলো?

ইউকেলিসের স্মৃতি ওকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে ঠিক। কিন্তু এখনকার এই শোক যন্ত্রণা এত তীব্র ছিলো না যে, এটা তার জ্ঞান বুদ্ধিকে লোপ করে দেবে। এখন তো তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ এক বাস্তবতা। একে তো ছিলো তার অলংকারাদি। এর

চেয়ে ভয়াবহ বিপদ ছিলো সে নিজে। তার রূপ যৌবন তো যে কোন রাজা বাদশাহকেও ভাবিয়ে তোলার মতো।

অলংকারগুলো তো যেকোন উপায়ে লুকানো যাবে। কিন্তু নিজেকে? সে দ্রুত অলংকারগুলো খুলে ফেললো। প্রথমে ভাবলো, এগুলো নদীতে ফেলে দেবে। তারপর সেটা নাকচ করে দিলো। এর বিনিময়ে তার সামনের পথ চলতে হবে।

অলংকারগুলো লুকানোর মতো তার কাছে কিছু ছিলো না। তাকে পরানো হয়েছিলো বহু পুরাতন ঘাগড়ার মতো একটা পোষাক। কাপড়ের নিচের দিক থেকে এক টুকরো কাপড় ছিড়ে নিলো। তাতে অলংকারগুলো রেখে পুটলার মতো বানিয়ে পুটলাটা কাপড়ের নিচে বেঁধে নিলো...

রাত অর্ধেকেরও অধিক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ক্লান্তজনিত ঘুমের ঘোর তার চিন্তা ভাবনার দুয়ারে শিকল পরিয়ে দিলো। কাছের একটি গাছের নিচে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর হারিয়ে গেলো স্বপ্নের দুনিয়ায়।

✪ ✪ ✪

চোখ যখন খুললো রোজী! সূর্যের রূপালী আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। তার আশেপাশে কিছু মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে হড়বড় করে উঠে বসলো। লোকজনের ছোটখাটো একটা সমাগম বিস্মিত হয়ে তাকে দেখছে।

'কে তুমি! এখানে কেন পড়ে আছো'? – ভিড় থেকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো। 'সব বলবো– রোজী স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– 'আমাকে এমন কোন ঘরে নিয়ে চলো যেখানে সমঝদার মেয়েরা আছে। এ নদী থেকে আমি নিজেকে উদ্ধার করে এনেছি। আর এক প্রতারকের প্রতারণার কারণে পৌঁছেছি এখানে।'

রোজী দেখলো, এখানে ভিড় করা লোকগুলো মজুর শ্রেণীর। এরা যদি বদ কিসিমের লোক হতো তাহলে চুপচাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে দেখতো না।

'আমাদের 'বাবা' আসছেন'– এক লোক বললো– 'তিনিই বলবেন তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন... তোমার ধর্ম কি?'

'আমি খ্রিস্টান।'

'তাহলে ভয় নেই, আমরাও খ্রিস্টান... কিবতী খ্রিস্টান!'

'আমিও কিবতী'– রোজী ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য বললো।

একটু পর একজন ঘোষণার মতো করে বললো– 'সরে যাও।' 'বাবা' আসছেন।'

সবাই এমনভাবে পিছু হটলো যে, একদিকে পথ হয়ে গেলো। বয়স্ক এক লোক রোজীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার পোশাক ও চলার ভঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছিলো সমাজের বেশ প্রভাবশালী লোক। রোজীকে দেখে যেন একটা ধাক্কা খেলো লোকটা। বিস্ময়ে তার পা সেখানেই আটকে গেলো। তার মুখায়বের পরিবর্তিত ছাপ লুকানো যাচ্ছিলো না।

'আমার বাড়িতে চলো'– বাবা বললেন– 'ওখানে আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক পুত্রবধু আছে।'

'যেখানে মহিলারা আছে তুমি সেখানেই যেতে পছন্দ করবে।'

বাবা ওকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দিলেন। নীল নদের পাশ ঘেষা পথ ধরে রোজীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। তীরে বিক্ষিপ্ত নৌকা ও জলযান দেখা যাচ্ছিলো। সামনে যাওয়ার পর বড় বড় পাল তোলা নৌকাও দেখলো রোজী। জলপথে যাতায়াতরত লোকদের জন্য বড় সড় একটা ঘাটলাও দেখা গেলো। লোকজন নৌকা থেকে নামছে। আবার অনেকে হাতে বড় জাল নিয়ে নৌকায় আরোহণ করছে।

নদী থেকে আড়াই তিন ফার্লং দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছিলো। ওখানে ছোট বড় ঝুপড়ির পাশাপাশি কিছু গাছ পালা এবং বাড়ি ঘরও দেখা যেতে লাগলো। মাঝিমাল্লা ও মাছ শিকারীদের ঠিকানা ওগুলো।

গোত্রের প্রভাবশালী সরদারদের মতো বাবার অবস্থান এখানে। রোজীকে বাবা একটি কামরায় নিয়ে বসালেন। তারপর ঘরের মেয়েদের ডাকলেন এবং রোজীর বক্তব্য শোনতে বললেন।

রোজী যথাসম্ভব বিস্তারিত শোনালো। কিভাবে ইস্তাকিয়া পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে কি করে মিসরের এ এলাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে।

রোজীর সব কথা বাবা নীরবে শুনে তার স্ত্রীকে বললেন, ওকে গোসল করিয়ে কাপড় পরিয়ে দাও এবং ভালো করে খাবার খাইয়ে দাও।...

বাবা রোজীর মাথায় স্নেহের পরশ দিয়ে বললেন, সে যেন এই বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে। তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হবে। একথা বলে বাবা বাইরে বের হলেন। এক লোককে কয়েকজনের নাম বলে তাদেরকে ডেকে আনতে বললেন।

✪ ✪ ✪

বাবার বাড়িটি প্রশস্ত হাবেলির মতো। তিনি তার হাবিলের এক কামড়ায় বসা। আর তার সামনে তিনজন লোক বসা। তাদেরকেই তিনি ডাকিয়ে এনেছেন। ওদের একজন জানালো, তারা শুনেছে বাবা নাকি একটি মেয়েকে পাকড়াও করেছেন।

'ও এ বাড়িতেই আছে'– বাবা বললেন– 'আমি তোমাদেরকে ডেকেছি এজন্য যে, তোমরা জানো, গতকাল রাতে নীল দরিয়ায় এক কুমারী মেয়েকে বলি দেয়া হয়েছিলো। আসলে এ মেয়েকেই বলি দেয়া হয়েছিলো। নদী থেকে সে জীবিত ফিরে এসেছে। নীল নদ তাহলে আমাদের বলিদান গ্রহণ করেনি। উগড়ে ফেলে দিয়েছে। নীল আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। নীলের প্রবাহ থেমে যাবে। চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এতো এক সৌভাগ্য যে, বলিদান উৎসবে আমাকেও দাওয়াত করা হয়েছিলো। এ মেয়েকে আমি সেখানেই দেখেছি। আজ সকালে সংবাদ পেয়েই আমি নদী তীরে দৌড়ে যাই।'

'আমাদের জন্য এখন কি হুকুম?' – একজন জিজ্ঞেস করলো।

'এটা বলবেন আসকাফ (খ্রিস্টান পাদ্রী বা পুরোহিত)' – বাবা বললেন– 'আমি উনার কাছে যাচ্ছি। তোমাদের কেউ একজন আমার সঙ্গে চলো। এ মেয়েকেই দরিয়ায় সোপর্দ করা হবে না অন্য কোন মেয়েকে বলি দেয়া হবে এর সিদ্ধান্ত দেবেন আসকাফ। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, কাল রাতে বলি উৎসবে ঐ মেয়ের গায়ে অনেক গহণা পরানো ছিলো। এখন ওর শরীরে এক সিকি গহণাও দেখা যাচ্ছে না। হাতের আঙ্গুলে আংটি পর্যন্ত নেই। ওকে এ ব্যপারে আমি জিজ্ঞেস করিনি। কারণ, যাতে সে জানতে না পেরে বলিদানের সময় আমিও সেখানে ছিলাম। ওকে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে কেন সেতো তাও জানে না। এখন যদি সে জানতে পারে, তাকে আবার নদীতে নিক্ষেপ করা হবে তাহলে হয়তো পালিয়ে যেতে পারে।'

বাবা যখন একথা বলছিলেন রোজী তখন তার লুকানো গহণাগুলো মহিলাদের দেখিয়ে বলছিলো, যে ওকে ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দেবে তাকে সে এই সবগুলো অলংকার দিয়ে দিবে।

বাবা এক লোককে সঙ্গে নিয়ে আসকাফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসকাফের গ্রাম এখান থেকে বেশ দূরে।

রাতের ক্লান্ত শ্রান্ত রোজী গোসল সেরে খানাদানা খেয়ে শুয়ে পড়লো।

সূর্যাস্তের একটু আগে বাবা ফিরে এলেন। রোজী তখনো ঘুমে। বাবা তার স্ত্রীকে জানালেন, 'এ মেয়েকে আবার গতকাল রাতের সেই জায়গায় নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। এখন তার হাত বেঁধে ফেলা হবে। যাতে সাতরে জীবিত ফিরতে না পারে।

বাবার স্ত্রী জানালো, মেয়ের কাছে অনেকগুলো অলংকার আছে।

বাবা বললেন, তাড়াতাড়ি মেয়েকে তৈরী করে অলংকারগুলো পরিয়ে দাও। যারা ওকে নিয়ে যাবে তারা এসে যাবে...

স্ত্রী রোজীর কামরার দিকে হাটা দিলো। পেছন থেকে বাবা চুপে চুপে বললেন, 'ওকে এখনই জাগিয়ে দাও।"

'ওকে এখনই জাগিয়ে তৈরী করছি। আহা! নীল দরিয়রা কোলে তো ওর চির নিদ্রা হবে'– স্ত্রী বললো।

বাবার স্ত্রী একথাটি রোজীর কামরায় প্রবেশ করতে করতে বললো। রোজী তখন জেগে উঠেছে এবং তার কানে কথাটিও পৌছে গেছে। মহিলা রোজীকে উঠিয়ে তৈরী করতে লাগলো। রোজী জিজ্ঞেস করলো, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। মহিলা মিথ্যা কথা বললো। আর বলতে গিয়ে এমন কথা বলে ফেললো যে, রোজী সন্দিহান হয়ে উঠলো। তারপর বিগড়ে গেলো।

বাবাকে বলা হলো। বাবা এসে রোজীকে মিষ্টি কথা বলে ফুসলাতে লাগলেন। বাবা এ আংশকাও করছিলেন, রোজীর বলিদানের ব্যাপারটি যদি বেশি ছড়িয়ে যায় তাহলে সরকারি অফিসার পর্যন্ত পৌছে যাবে। তখন সবাইকে গ্রেফতার করা হবে।

বাবা একজন অভিজ্ঞপুষ্ট মানুষ। তিনি এমন চালে রোজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন যে, রোজীর জেদ অনেকটাই কমে গেলো। বাবার সঙ্গে যেতে রোজী রাজী হয়ে গেলো। সূর্যাস্তের পর রোজীকে বাইরে বের করা হলো। লোকদের কাছে এ খবর পৌছে গিয়েছিলো যে, সকালে নদীর তীরে যে মেয়েটিকে পাওয়া গিয়ে ছিলো, গতকাল রাতে সে মেয়েটিকেই নীলনদে বলি দেয়া হয়েছিলো। আজ রাতে আবার তাকে নদীতে ফেলা হবে। নদীতে ডুবে তাকে মরতেই হবে। না হয় নীল অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং লোকালয়ের সব ধ্বংস করে দেবে।

কিবতীরাই শুধু নীল নদে নারী বলি দিতো। তাই এলাকার সব কিবতী রোজীকে দেখার জন্য উম্মুখ হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলো। রোজীকে তারা এখন মনে করছে অতি বরকতময় কোন সত্ত্বা। তাদের তো এটা জানার কথা নয় যে, এ মেয়েকে ধোকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিবতীরা ওর কাপড় বা হাতে একবারের জন্য হলেও চুমু খেতে চাচ্ছিলো।

'ঐ যে এসে গেছে। বলিদানের ঐ মেয়ে এসে গেছে'– কয়েকটি আওয়াজ উঠলো।

এসব আওয়াজ রোজীর কানে যেতেই সে নিশ্চিত হয়ে গেলো, তাকে ধোকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুই কিবতী রোজীর দুই বাহু পাকড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। রোজী ওদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু লোকেরা রোজীর অস্বীকৃতিমূলক প্রতিবাদকে কৌতুক ছাড়া অন্য কিছুই মনে করলো না।

'ওকে উঠিয়ে নাও। তারপর নৌকায় করে মাঝ নদীতে নিয়ে ফেলে দাও'– বাবার কর্কশ কন্ঠ শোনা গেলো।

রোজী পথে বসে গেলো। আর দুই কিবতী ওকে উঠানোর জন্য গলদঘর্ম হতে লাগলো। রোজীকে ওরা কাবু করতে পারছিলো না।

✪ ✪ ✪

ভিড়ের মধ্য থেকে তিনজন বলশালী লোক এগিয়ে এলো। আর দুই কিবতীকে পেছনে হটিয়ে দিলো। রোজী চিৎকার চেচামেচি করছিলো। তিনজনের একজন রোজীকে উঠতে বললো। রোজী যখন ঐ তিনজনের একজনকে দেখলো, আচমকা তার চিৎকার বন্ধ হয়ে গেলো। ওর চেহারার ফিকে রং উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখ দুটি হয়ে গেলো স্থির।

'তুমি? তুমি তো রাবণ, না?'– রোজী লোকটিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'রাবনই তো ছিলাম। কিন্তু কত বছর ধরে যে রাবন নয় তা ভুলে গেছি। এখন আমি উয়েস'। সে লোকটি বললো।

'প্রতিশোধ নেয়ার ভালো সুযোগ পেয়ে গেছো তুমি' তাই না?– রোজী বললো।

'অযথা কথা বাড়িয়ো না'– ঐ তিনজনের মধ্যে আরেকজন রোজীকে বললো– 'জীবিত থাকতে চাইলে নিশ্চিন্তে আমাদের সঙ্গ চলো।'

'আমার মনে তোমার ব্যাপারে কোন শত্রুতা বা রাগ নেই রোজী! তোমার ভালোবাসা আমি আমার হৃদয়ে আজে পুষে রেখেছি।'

'আরে এত কথার সময় নেই উয়েস! ওকে ওদের হাত থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করো'– তিনজনের একজন বললো।

এসব কথা হচ্ছিলো নিচু স্বরে।

'দাঁড়াও'– বাবা এগিয়ে এসে বললেন– 'তোমরা তিনজন আমার কাছে অপরিচিত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তোমরা এ শুভ কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিয়েছো। তবে আমাদের নিশ্চয়তার জন্য তোমাদের সঙ্গে আমাদের দু'জন লোকও যাবে।'

'দুজন নয়' আমাদের সঙ্গে আপনার ছয়জন লোক পাঠাতে পারেন।'– উয়েস বললো দৃঢ় কণ্ঠে– 'আমরা কিবতী। তাই কিবতীদের আমরা ধোকা দিতে পারবো না।'

বাবার যে দুই লোক প্রথমে রোজীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো তারাই বাবার নির্দেশে উয়েসদের সঙ্গী হলো। উয়েস যেন রোজীকে জাদু করেছে। এতক্ষণ জোর জবরদস্তি করে রোজীকে হেলানোও যাচ্ছিলো না। আর এখন নিজেই স্বাভাবিক পায়ে ওদের সঙ্গে হেটে যাচ্ছে। লোকেরা রোজীকে মুহূর্তের জন্য হলেও ছুঁতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু বাবার লাঠিয়াল বাহিনীর শক্ত বাঁধার কারণে তা তারা পারছিলো না।

তীরে মাঝারি ধরণের একটি নৌকা প্রস্তুত রয়েছে। নৌকায় একজন মাঝি আছে। কিন্তু বাবার পাঠানো লোক দু'জন অভিজাত শ্রেণীর হলেও যেহেতু মাঝিমাল্লার গোত্রের লোক, তাই নৌকা চালনাতেও দক্ষ ছিলো ওরা। ওরা মাঝিকে বললো, তুমি চলে যাও। আমরাই চালিয়ে নিতে পারবো।

রোজী, উয়েস ও তার সঙ্গীরাসহ সবাই নৌকায় সওয়ার হয়ে গেলো। তারপর নৌকার পাল তুলে দেয়া হলো। বাবা বলে দিলেন, রাতের বলিদান উৎসবে যথা সময়ে তিনি পৌছে যাবেন।

✪ ✪ ✪

প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে ওরা। পাল তোলা নৌকা নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে। নৌকা চালনাকারী লোক দু'জন নৌকার মাঝখানে বসে আছে। উয়েস ও তার সঙ্গীরা রোজীকে নিয়ে পেছনে বসেছে। উয়েস তার সঙ্গীদের ইশারা করলো। তিনজনে নিঃশব্দে খঞ্জর বের করলো। ওদের তিন চার কদম সামনে ওদের দিকে পিঠ ফিরে বসে আছে ওরা।

তিনজন অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালো। আর বিলম্ব না করে ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনজনের খঞ্জর দু'জনের বুকে গেঁথে দেলো পালা করে। তারপর দু'জনের রক্তাক্ত লাশ ফেলে দেয়া হলো নদীতে।

'এখন বলো রোজী! আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে, না এখনো কোন সন্দেহ আছে'? উয়েস জিজ্ঞেস করলো।

'না উয়েস আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়'? – রোজী বললো।

'সিরিয়া .... হলব'– উয়েস জবাব দিলো– 'তোমার মা বাবার কাছে....... আমরা মুসলমান হয়ে গেছি রোজী! সব সময় আমরা মানুষের কল্যাণ চাই এবং কল্যাণ পৌছানোর চেষ্টা করি।'

'তোমরা এখানে এসেছিলে কেন?'– রোজী জিজ্ঞেস করলো।

'ব্যবসায়িক সূত্রে। আমাদের মাল ইস্কান্দারিয়ায়। এখানে এক ব্যবসায়ির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে এসেছি'– উয়েস বললো।

উয়েস মিথ্যা বললো। ঐ তিনজনের সঙ্গে ব্যবসার কোন সম্পক ছিলো না। ওদের সম্পর্ক মুসলিম গোয়েন্দাবাহিনীর সঙ্গে। ওরা মুসলিম সেনাদলের মুজাহিদ।

উয়েস যৌবনদীপ্ত এক যুবক। খ্রিস্টান ছিলো। দুই আড়াই বছর আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক লড়াই যখমী হয়েছিলো। বেঁচে থাকার মতো অবস্থা ছিলো না তার। ওর সঙ্গীরা ওকে আহত অবস্থায় রেখে পালিয়ে গিয়েছিলো। ক্রমেই রক্ত ক্ষরণের কারণে সে হয়ে পড়ছিলো অচেতন।

মুজাহিদরা যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদের যখমীদের উঠাচ্ছিলো। উয়েস এক উদ্ধারকর্মী মুজাহিদদের কাছে হাত জোড় করে তাকে বাঁচানোর আবেদন করে। মুজাহিদ তাকে প্রথমে পানি পান করায়। তারপর তাকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য আরেক মুজাহিদকে ডেকে আনে। এভাবেই মুজাহিদরা তাকে শত্রুপক্ষের সৈনিক হওয়া সত্বেও রক্তাক্ত ময়দান থেকে পরম যত্নে উঠিয়ে নেয়।

যারা যখমী উঠিয়ে নেয়ার কাজ করছিলো তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও ছিলো।

সপ্তাহ দু'য়েক পর উয়েস চলা ফেরার মতো সুস্থ হয়ে উঠলো। মুসলমানদের আন্তরিক সেবায় সে দারুণ অভিভূত হলো। কৃতজ্ঞতায় তখন তার মন ভরে গিয়েছিলো। কেউ তাকে বিধর্মী বা শত্রু পক্ষের বলে এতটুকু অবহেলা করেনি। অথচ তার সঙ্গীরা যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও তাকে উদ্ধার করেনি।

উয়েস যখন পুরোপুরি সুস্থ হলো, সে যুদ্ধ বন্দীদের আওতায় এসে গেলো। কিন্তু সালার তাকে মুক্ত করে দেয়ার হুকুম করলেন। উয়েসকে মুক্ত করে দেয়া হলো। কিন্তু উয়েস মুক্তির পরম আনন্দ উপভোগ করলো না। সে মুসলিম শিবিরেই রয়ে গেলো এবং জীবনের সবচেয়ে বড় ফয়সালাটি করলো। সে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সালারকে জানানো হলো। একদিন ফজরের পর তাকে সালার ইসলামের আলোয় দীক্ষিত করলেন।

উয়েসের গোত্রের মেয়েই রোজী। উয়েসের সুদর্শন অবয়ব রোজীর কাছে এত ভালো লাগতো যে, ক্রমেই সে উয়েসের প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলো। দু'জনের মন যখন খুব কাছাকাছি চলে আসছিলো তখনই যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী আচড় এসে লাগে তাদের এলাকায়। এর মধ্যে রোজীর জীবনে ইউকেলিসের আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে উয়েসও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজের এলাকায় ফিরে আসে।

এসে জানতে পারে, রোজী হেরাকলের এক ছেলে ইউক্লোসের প্রেমে পড়েছে। উয়েস রোজীকে একজন প্রতারক বলে অভিযোগ করে। রোজী জবাব দেয়, যে নিজের

ধর্ম ত্যাগ করতে পারে সে তো তার প্রেমিকাকে আরো আগেই ছুড়ে ফেলতে পারবে।

উয়েস জানায়, সে যদি কোন রোমী জেনারেলের ছেলে হতো তাহলে তাকে এভাবে ভুলে যেতে পারতো না। তাছাড়া ইসলাম তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। মুসলমানরা তার সঙ্গে যে অভাবিত আচরণ করেছে সেটার মধ্যে কোন ধরনের লোক দেখানো ব্যপার ছিলো না। এটা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং মুসলমানদের সহজাত স্বভাব।

এরপর রোজীর জীবন থেকে উয়েস বিস্মৃত হয়ে যায়।
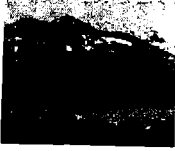
উয়েস মুসলিম সেনাদলে ছিলো। অল্প দিনের মধ্যেই তার সহজাত প্রতিভা সবার মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হলো। জিহাদের জোশ জযবায় দীপ্ত এক মুজাহিদই ছিলো না উয়েস, শাহ সওয়ারী, তীরাবন্দাযী, তলোয়ার চালনাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলো। এছাড়াও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার মতো আল্লাহপ্রদত্ত গুণও ছিলো ওর, যা শত্রু দেশে দারুণ তৎপর এক পরিপূর্ণ গোয়েন্দার মধ্যে থাকে।

এদিকে মুসলিম সেনাদলে হযরত আমর ইবনে আস (রা) এর মিসর অভিযানের প্রতি অতি উৎসাহের কথা বেশ চাওর হয়ে গিয়েছিলো। খলীফা উমর (রা) অভিযানের অনুমতি দিয়েও মুলতবী রাখেন এই বলে যে, আগে সিরিয়াসহ অন্যান্য বিজিত এলাকায় মুসলিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হোক। তারপর মিসর অভিযানের বিষয় চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়াও শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামও এ অভিযানের বিরোধিতা করছিলেন।

অথচ সিরিয়া ও ইরাকের নিরাপদ প্রতিরক্ষা শক্তি কায়েমের জন্য মিসর অভিযান জরুরী মনে করছিলেন আমর ইবনে আস (রা)। কারণ, কায়সারে রোম হেরাকলের সেনাদল শাম থেকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এ বিক্ষিপ্ত ফৌজ ধীরে ধীরে মিসর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা বিখ্যাত জেনারেল আতরাবুনের নেতৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে। যদি এদের ওপর এখনই হামলা করা না হয়

তাহলে খুব দ্রুতই হেরাকল ও আতরাবুন জবাবী হামলার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত হেরাকলের অর্ধেকের চেয়ে বেশি ফৌজ মারা গেছে।

হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর আমর ইবনে আস (রা) তার ব্যক্তিগত দু'জন গোয়েন্দা মিসর পাঠিয়ে মিসরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন।

এ প্রেক্ষিতে আমর ইবনে আস (রা) আমীরুল মুমিনীনকে জানান, খ্রিস্টানরা চারটি ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। কিবতী, ইয়াকুবী, মিশকানী এবং হেরাকলের সরকারিভাবে নির্দেশিত নয়া খ্রিস্টান ফেরকা। হেরাকল সরকারি ফরমান জারী করে দেন যে, একমাত্র সঠিক ঈসায়িয়াত বা খ্রিস্ট ধর্ম এই সরকারী ঈসায়ীয়াত। এর বিরোধিতা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

অন্যান্য ফেরকাধারীরা এ সরকারী ফেরকা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামে হেরাকল তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে সরকারি ফেরকা গ্রহণে বাধ্য করার হুকুম জারী করেন। এজন্য ভয়ংকর অত্যাচারী আসকাফ (প্রধান পাদ্রী) 'কিরাস' কে সার্বিক দায়িত্ব এবং সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়।

খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ফেরকা হলো কিবতী সম্প্রদায়। সরকারি ফেরকা প্রত্যখ্যানের অপরাধে গত ১১ বছর ধরে অকথ্য নির্যাতনের শিকার এই কিবতী সম্প্রদায়। আমর ইবনে আস (রা) আমীরুল মুমিনীনকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কিবতীদের সাহায্য করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তথা অনস্বীকার্য ফরয কর্ম।

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আস (রা) দেখলেন, আমীরুল মুমিনীন মিসর অভিযানে সম্মত হলেও তিনি জানেন না, কবে এ অভিযানের নির্দেশ দেয়া হবে। তাই তিনি নিজে একটি পরিকল্পনা খসড়া তৈরী করলেন। আল জাযীরার খ্রিস্টান গোত্রগুলো যেভাবে বিজয়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিলো সেভাবে মিসরের খ্রিস্টানদের মধ্যেও বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে দিতে হবে।

আমর ইবনে আস (রা) একদিন তার অধীনস্থ সালারদের নিয়ে এ ব্যাপারে পরামর্শ সভায় বসলেন।

'মিসরের কিবতী খ্রিস্টানদের হেরাকল ও আতরাবুনের বিরুদ্ধে যদি উস্কিয়ে দেয়া যায় তাহলে সেটা আমাদের অনুকূলে একটা সুযোগ সৃষ্টি করবে।'– এক পর্যায়ে আমর (রা) প্রস্তাব করলেন– 'ওখানে সবচেয়ে নির্যাতিত ও রোষানলের শিকার হচ্ছে এ কিবতীরা।'

'হতে পারে বিদ্রোহ করার মতো ওদের সেই মনোবল তৈরী হবে না'– এক সালার বললেন– 'ওদেরকে যদি মুসলমানদের প্রভাবাধীন করা যায় এবং সেভাবে তৈরীও করা যায় তাহলেই তা সম্ভব। আমরা যখন মিসর হামলা করবো কিবতীরা আমাদের সঙ্গে থাকবে। আর যেসব কিবতী রোমী ফৌজে আছে তারাও লড়াইয়ের সময় পিঠ দেখিয়ে ময়দান খালি করে দেবে।'

আমর (রা) বললেন, তিন চার জন এমন মুজাহিদ প্রয়োজন যারা মিসর গিয়ে কিবতীদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কৌশলে কিবতীদেরকে হেরাকলের বিরুদ্ধে উস্কে দেবে।

মুসলিম সেনাদলে দক্ষ এক গোয়েন্দাবাহিনী ছিলো। কিন্তু এ কাজের জন্য বিশেষ প্রতিভাধর গোয়েন্দার প্রয়োজন ছিলো। সালাররা উয়েসসহ আরো দুই মুজাহিদের কথা উল্লেখ করলেন। তাদেরকে আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে সোপর্দ করা হলো। আমর (রা) তাদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তৈরী করতে লাগলেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের দক্ষতা প্রমাণিত হলো। তারপর ওদেরকে মিসর রওয়ানা করিয়ে দেয়া হলো বণিকের বেশে। ওদের বণিক বেশ চমৎকার ছিলো। এক মাসের মধ্যেই ওরা মিসর পৌছে ওদের কার্যক্রম বেশ সফলভাবে শুরু করে দিলো।

✪ ✪ ✪

উয়েসরা বাবা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে ধোকা দেয়ার ব্যপারে ভালো করেই সফল হলো। বাবার পাঠানো দুই লোককে হত্যা করে নদীতে ফেলেও দিলো। এরপরই উয়েসরা বিপদে পড়লো। বাবার লোক দু'জন পাল তোলা নৌকা চালনায় বেশ দক্ষতার সঙ্গে নৌকা চালাচ্ছিলো। কিন্তু উয়েসরা পাল তোলা নৌকা চালাতে জানে না। ওরা বৈঠাধারী নৌক চালাতে পারে। ওরা নৌকা পেছন থেকে যেই বৈঠা মারতে শুরু করলো তখনই নৌকার রুখ বদলে গেলো এবং নৌকা এক দিকে কাত হয়ে গেলো। নদীতে তীব্র বাতাস বইছিলো। সেই সঙ্গে ঢেউ উঠছিলো। নৌকার একদিক পানিতে ভরে উঠলো। নৌকা যে কোন সময় এখন ডুবে যাবে।

'ঐ মেয়েকে সামলাও উয়েস'– এক মুজাহিদ ঘাবড়ে গিয়ে বললো।

'আমার চিন্তা করো না'– রোজী অভয় দিলো– 'সাঁতার আমি ভালোই জানি। একবার এ নদী থেকে উদ্ধারও পেয়েছি।'

ওরা আর কিছু বলার সুযোগ পেলো না। উড্ডীয়মান পাল বাতাসের প্রতিকূলে পড়ায় নৌকায় উল্টে গেলো। চারজনই নদীতে পড়ে গেলো। ওরা সাতরাতে জানতো। চারজন নদীর তীরের দিকে সাতরাতে লাগলো। ধীরে ধীরে ওরা নদীর তীরে পৌঁছে গেলো। রোজীকে নিয়ে উয়েসের ভয় ছিলো। এজন্য উয়েস রোজী রোজী বলে চিৎকার করছিলো। কিন্তু রোজীই সবার আগে তীরে পৌঁছলো।

নীল দরিয়া তার বলি দানের কন্যাকে আরেকবার ফিরিয়ে দিলো। কিন্তু এজন্য নীল দরিয়ার প্রবাহ থেমে গেলো না। অবিরাম বইতে লাগলো নীলের প্রবাহ– চলে বহিয়া নীল দরিয়া।

✪ ✪ ✪

এখন সমস্যা হলো, রোজীকে ওরা কোথায় লুকাবে এবং শাম পর্যন্ত ওকে কি করে পৌঁছে দেবে। এটা তো ওদের মিশনের জন্য জরুরী কোন দায়িত্ব নয়। কিন্তু উয়েস নিজেই এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এরা তাই আপাতত আরেক আসকাফ বিন ইয়ামিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো।

বিন ইয়ামীন কোন জনবসতিতে থাকতেন না। 'কূস' নামক এক এলাকা থেকে বেশ দূরের এক গিরি-কান্দর এলাকায় থাকতেন। ঘন টিলা ও এবড়ো খোড়ো পথ যেখানে যাওয়ার জন্য দুর্গম করে রেখেছিলো।

যারা সরকারি ঈসায়ি ফেরকাকে মানতো না তাদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন আসকাফ বিন ইয়ামিন। হেরাকল কিরাসকে বিন ইয়ামিনকে হত্যার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। সময়মত বিন ইয়ামিন তা জানতে পেরে গা ঢাকা দেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রা) এর এই তিন গোয়েন্দা বিন ইয়ামিনের ঠিকানা জোগাড় করতে সক্ষম হয়। বিন ইয়ামিন নিজেকে কট্টর কিবতী বলে দাবি করেন। উয়েসরা সংকটে পড়েই বিন ইয়ামিনের ঠিকানা বের করে। কারণ, নিজেদের মূল মিশন বাদ দিয়ে রোজীকে তার মা বাবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তো ওরা এখনই শাম সফর করবে না। আবার রোজীকেও সব সময় সঙ্গে রাখতে পারবে না। এখানে যেমন নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তারপর ইসলামও এমন বেগানা এক মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেয় না। এজন্য ওরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বসলো।

'ওকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হোক'– তিন গোয়েন্দার প্রধান বললো– 'প্রমাণ করা হবে সেও কিবতী। ওকে বিন ইয়ামিনের দায়িত্বে দিলে বেশ হবে, ওকে যেন হলব পৌঁছে দেয়া হয়।'

'যদি উনি জেনে ফেলেন, এ মেয়েকে নীল দরিয়ায় বলিদান কার্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তখন কি হবে?'

'এ আশংকা মন থেকে দূর করে দাও' – প্রধান বললো – 'আমার কানে একথা এসেছে যে, বিন ইয়ামিন এ বলি উৎসবকে পাপ মনে করেন। কিন্তু এখনো নীরব এজন্য যে, কিবতীদের অধিকাংশই এ বলিকে পূণ্য-কর্ম বলে মনে করে।'

নদীর তীরে আর বেশি সময় থাকা ঠিক হবে না। তাই ওরা বিন ইয়ামিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। সকাল পর্যন্ত ওদেরকে অনেক দূর চলে যেতে হবে।

✪ ✪ ✪

হেরাকলের সরকারি ঈসায়ির ফেরকা প্রধান কিরাসের অমানসিক নির্যাতনের বহু চিত্র তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক আলফ্রেড বাটলার।

কিরাস যখন ইসকান্দারিয়ায় এক ধর্মীয় সম্মেলন ডেকে তার সরকারি ফেরকার তাবলিগ শুরু করেন তখন ইস্কান্দারিয়ায় ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের আসকাফ সফর বানুস। যিনি বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে এমর্মে হযরত উমর (রা) এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন। তিনি কিরাসকে ভিন্ন বৈঠকে বসিয়ে অনেক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মিনতি করে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, খ্রিস্ট ধর্ম আসমানী কিতাব ইঞ্জিল শরীফের নির্দেশিত ধারাতেই সঠিক ও অবিকৃত থাকবে। কিন্তু কিরাসের মনে আল্লাহর ভয় ছিলো না। ছিলো হেরাকল ভীতি।

সফর বানুস তো অজানা কোন কারণে হারানো ইতিহাসের কোন পাতায় মিলিয়ে যান। কিন্তু জেগে উঠেন আসকাফ বিন ইয়ামিন। হেরাকল ও কিরাসের বিরুদ্ধে খোলা ময়দানে নেমে পড়েন। আলফ্রেড বাটলার লিখেছেন, মানুষের মনে বিন ইয়ামিনের ভালোবাসাও ছিলো এবং শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতিও ছিলো। ধর্মীয় জ্ঞান গরিমায় তিনি পরিপুষ্ট ছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য তিনি বরদাশত করতেন না। তবে তার কাছে কোন যুদ্ধ শক্তি ছিলো না। তবুও তিনি আত্মগোপন করে সংগোপনে জনসংগঠন তৈরি করতে থাকেন।

কিরাস বিন ইয়ামিনকে না পেলেও পেয়ে যান তার বড় ভাইকে। বিন ইয়ামিনের মিশনের অন্যতম পরিচালক ছিলেন তার বড় ভাই। ইতিহাসে তার কোন নামের উল্লেখ

নেই। তাকে বিন ইয়ামিনের ফেরকা ছেড়ে হেরাকলের ঈসায়িয়াত গ্রহণ করতে বলা হয়। বড় ভাই তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিরাসের হুকুমে বিন ইয়ামিনের বড় ভাইকে যে লোমহর্ষক শাস্তি দেয়া হলো, আলফ্রেড বাটলার তাও বর্ণনা করেছেন। তাকে উলঙ্গ করে শুইয়ে সারা দেহে খণ্ড খণ্ড মশাল রেখে দেয়া হয়।

'বলো, কায়সারে রোম শাহে হেরাকলের মাযহাব সত্য'– তাকে বলা হলো– 'আর সব মিথ্যা।'

'যে হেরাকলের মাযহাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তার ওপর খোদার অভিশাপ। সত্য মাযহাব একমাত্র ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে'– বিন ইয়ামিনের ভাই বলছিলেন।

তার দুই পা থেকে গলে গলে চর্বি পড়ছিলো। মশাল সরিয়ে তাকে বলা হলো, বিন ইয়ামিন কোথায় শুধু এতটুকু বলো।

'জানলেও বলবো না।'

তার একটি দাঁত উপড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করা হলো বিন ইয়ামিন কোথায়? তিনি একই উত্তর দিলেন। আবার আরেকটি দাঁত উপড়ে ফেলে একই প্রশ্ন করা হলো। একই উত্তর এলো তার মুখ থেকে। এভাবে তার সবগুলো দাঁত ফেলে দেয়া হলো।

সিমওয়েল নামক এক পাদ্রীর ঘটনাও আলফ্রেড বাটলার বর্ণনা করেছেন। এ পাদ্রীও বিন ইয়ামিনের অনুসারী ছিলেন। মরুর কোথাও তিনি গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। কিরাস সিমওয়েলের উদ্দেশ্যে এক পয়গাম পাঠান। তাতে লেখা ছিলো, তিনি যেন অতি সত্বর হেরাকলের সরকারি ফেরকায় যোগ দেন। এক শত সৈন্যসহ এক সেনা অফিসার এ পয়গাম নিয়ে যায়।

'আমাদের সরদার আসকাফ বিন ইয়ামিন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না'– সিমওয়েল পয়গাম ছিড়ে টুকরোগুলো নিক্ষেপ করে বলেন– তাদের ওপর খোদার লানত হোক যারা এ পয়গাম পাঠিয়েছে। লানত পড়ুক সেই রোমী সালতানাতের ওপর যারা আমাদের ওপর এ মিথ্যা ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছে।'

পয়গাম বাহক অফিসারকে কিরাস সব রকম ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন। পাদ্রী সিমওয়েল শুধু পয়গামের চিরকুটটাই ছিড়লেন না অপমানসূচক কিছু মন্তব্যও করলেন। অফিসার তাকে গ্রেফতার করলো। তার হাত দুটি পিছ মোড়া করে বেঁধে দেয়া হলো। অফিসার ছিলো ঘোড়ায় সওয়ার। আর সিমওয়েল পায়দল যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিলো তাকে পুরোপুরি লাঞ্ছিত করা। অসংখ্য মানুষ তাকে দেখার জন্য রাস্তায় ভিড় করতে লাগলো।

'বন্ধুরা আমার'– সিমওয়েল উচু ও প্রাণবন্ত আওয়াজে বললেন– 'আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজ হযরত ঈসা (আ) এর নামুস ও সত্যতার ওপর আমার রক্ত ঝরবে। হে

লোকসকল! নিজেদের ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাস করো। কোন শাসনককে ভয় পেয়ো না'- এরপর তিনি কিরাসের উদ্দেশ্যে গালি গালাজ শুরু করলেন।

সিপাহীরা তাকে মারতে মারতে কিরাসের কাছে এমন অবস্থায় নিয়ে গেলো যে, তার মাথা ও দেহের কয়েকটি স্থান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছিলো। কিরাসের হুকুমে তাকে আরো প্রহার করলো ওরা। তার কাপড় রক্তে চপচপে হয়ে গেলো।

'ঐ হতভাগা পাদ্রী!- কিরাস সিমওয়েলকে বললেন- 'তোকে গির্জার প্রধান কে বানিয়েছে? আর কে তোকে এ অধিকার দিলো যে, তোর অধীনস্ত পাদ্রী ও অনুসারীদেরকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ও আমার ফেরকার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাবি?'

'হে বিধর্মী দাজ্জাল!'- সিমওয়েল গর্জিত আওয়াজে বললেন- 'নেকী তো খোদার ইবাদত ও বিন ইয়ামিনের অনুসরণে নিহিত। তুই তো ইবলিসের সন্তান। তোর ও তোর ফেরকার অনুগত্য করা জঘন্য পাপ কর্ম।'

কিরাস হুকুম দিলেন- ওর মুখে এত চপেটাঘাত করো যাতে ওর মুখ অবশ হয়ে যায় ... তার হুকুম পালিত হলো।

'এখন জবাব দে- কিরাস জিজ্ঞেস করলেন- তুই মিসরের গভর্ণর ও ধর্মীয় নেতার হুকুম মান্য করাকে নেক কর্ম বলে মনে করিস না? জানিস না তোর জীবন মরণ আমার হাতে?'

'তুই কি ইবলিসকে চিনিস না ... হে কিরাস! যখমে জর্জরিত হয়েও তার দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেলো- 'ইবলিস ফেরেশতাদের সরদার ছিলো। কিন্তু অহংকার- দম্ভ তাকে আল্লাহর হুকুম থেকে বিমুখ করে দেয়। খোদা ওকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছেন। হে কিরাস! তুই ইবলিসের চেয়েও বড় অভিশপ্ত।'

কিরাস হুকুম দিলেন, বাইরে নিয়ে ওর মাথা উড়িয়ে দাও ... হুকুম যথারীতি পালিত হচ্ছিলো। এ সময় মিসরের উচ্চ পর্যায়ের এক হাকিম (প্রশাসক) তাকে উদ্ধার করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

✪ ✪ ✪

হেরাকল ও কিরাসের এ ধরণের অবর্ণনীয় নির্যাতনের কারণে মিসরবাসীর মনে দিন দিন ঘৃণা ঘনীভুত হচ্ছিলো হেরাকল ও কিরাসের বিরুদ্ধে। আমর ইবনে আস (রা) মিসরবাসীর এই ঘৃনাকেই কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন। মিসরবাসী মুসলমানদের সাহায্য করুক বা না করুক হেরাকলের পক্ষে যেন যুদ্ধ শক্তি হিসেবে অভির্ভূত না হয়।

ওদিকে মাঝিমল্লা ও মৎস শিকারীদের বস্তি সরদার 'বাবা' যথা সময়ে বলিদানের উৎসব স্থলে নৌকায় করে রওয়ানা দেন। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর বাবার নৌকার সামনে দিয়ে উল্টে যাওয়া নৌকাটিকে ভেসে যেতে দেখা গেলো। নৌকার পাল সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যাচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যে শুধু নৌকা ও নৌকার পালটিই চেনা গেলো। কার নৌকা সেটা তো বোঝার কথা নয়। তাকে তো একথা বলার কেউ ছিলো না যে, এই উল্টানো নৌকা তার লোকজনেরই।

উৎসব স্থলে পৌছে সেখানে একজন পাদ্রী ও কয়েকজন গোত্রস্থানীয় লোককে উপস্থিত পেলেন বাবা। বাবাকে তারা মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো– 'কোথায় ঐ মেয়ে'?

'পাঁচজন লোকের সঙ্গে তো ওদেরকে আরো অনেক আগে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

উৎসবস্থলে যেন শোকের ছায়া নেমে এলো।

'আমাদের দুই লোক নৌকা চালনায় বেশ দক্ষ'– বাবা বললেন– 'নৌকা উল্টে গেলেও ওরা সাতরে চলে আসতো। ঐ মেয়েও সাতারে অভিজ্ঞ। নৌকায় তিনজন অপরিচিত কিবতীও ছিলো। ওরা না থাকলে তো ঐ মেয়েকে বলি দেয়ার জন্য তৈরীই করা যেতো না।'

'নীল দরিয়া ঐ মেয়েকে কবুল করেনি'– পাদ্রী ঘোষণা করলেন– 'নীলের রোষানল থেকে বাঁচতে হলে ঐ মেয়েকে বলি দিতে হবে যাকে প্রথমেই নির্বাচন করা হয়েছিলো... সে ছিলো হুরশীসের মেয়ে ... ওকে এখনই এনে নদীতে নিক্ষেপ করা হোক।'

হুরশীস নিজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ইস্তেকিয়া থেকে রোজীকে ধোকা দিয়ে মিসর নিয়ে এসেছিলো। পাদ্রী হুকুম করলেন, এখন হুরশীসকে জাগিয়ে বলে দাও। সে যেন তার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে...

হুরশীস তার মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলো। হুরশীস নিজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য এক অজুহাত তুলে ধরলো। বললো, তার মেয়ের সব অলংকার ঐ হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে পরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এখন তার মেয়েকে সাজানোর মতো কোন অলংকার নেই। অলংকার ছাড়া তো কোন মেয়েকে বলি দেয়া হয়নি কখনো। পাদ্রী তার অজুহাত উড়িয়ে দিয়ে বললেন, অলংকার এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বলি দেয়া হবে তার দেহের। অলংকারের নয়। আর দেহ এক অকুমারী মেয়ের হলেই হলো।

পাদ্রীর হুকুম টলানো অসম্ভব ছিলো। ঐ মেয়েকে ঘর থেকে এনে সে রাতে নদীতে ফেলে দেয়া হলো।

✪ ✪ ✪
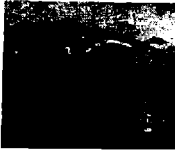
রোজী তখন নীল দরিয়া থেকে অনেক দূর চলে গেছে। উয়েসরা উট ভাড়া নিয়েছিলো। তাদের গন্তব্য ছিলো কূস নামক এলাকা। সাধারণ খ্রিস্টান বেশে ওরা পথ চলছিলো। রোজীকে ভালো করে চাদরে জড়িয়ে নেয়া হয়েছিলো। ওর চেহারার খুব সামান্য অংশই দেখা যাচ্ছিলো।

উট ওদেরকে দ্রুতই কূস পৌছে দিলো। অন্ধকার নেমে এসেছিলো। ওখানে সরাইখানা আছে। ওরা সরাইখানায় গিয়ে উঠলো। রোজীর জন্য আলাদা একটি নিরাপদ কামরা নিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা আলাপে মশগুল হয়ে পড়লো। এক মুজাহিদ গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করলো,

'আচ্ছা বলো তো রোজী! আমাদের সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?'

'না'– রোজী জবাব দিলো।

সন্দেহ থাকার কথাও ছিলো না। গত রাতে ওদের সঙ্গেই তো ও' ছিলো। ওরা তিনজন ছিলো ওর মুহাফিজের মতো। ভয় ছিলো বেশি উয়েসের পক্ষ থেকে। কারণ, ইউকেলিসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর রোজী উয়েসকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিশোধ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ সে পেয়েছিলো। কিন্তু সে রোজীর সঙ্গে যে আচরণ করছে তাতে মনে হচ্ছে রোজী কোন সুন্দরী তরুণীর নয়; বরং এক মুজাহিদা সঙ্গী।

'উয়েস!'– রোজী বললো নিরবতা ভেঙ্গে– 'তুমি বলেছিলে ইসলাম তোমাকে নয়া জীবন দান করেছে। তুমি দেখেছো, মুসলমানরা তাদের কৃত অনুগ্রহের কথা বলে তোমাকে খাটো করেনি। বরং ইসলামের আদর্শই এটা। তাই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো। এখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছো। তোমরা সময় মত না এলে এতক্ষণে নদীর হিংস্র প্রাণীরা আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতো।'

'আল্লাহ তাআলার হুকুম ছিলো এটা যে, তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন'– উয়েস বললো– 'এর কার্যকরণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন। যেখানে তোমার জীবন মরণের ফয়সালা হচ্ছিলো। মূলতঃ আল্লাহ তাআলাই আমাদের তিনজনকে ওখানে পাঠিয়েছেন। আসলে তোমাকে আমি বা আমরা নয়। ইসলামই নতুন জীবন দিয়েছে।'

'তাহলে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করে নাও উয়েস!'– রোজী বললো এবং তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো– 'আমি এতটুকু আশা করিনি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

সত্যিই আমি তোমার ও তোমার সঙ্গীদের আচরণে এতই মুগ্ধ-অভিভূত হয়েছি যে, বাকি জীবন তোমাদের সঙ্গে থাকার ফয়সালা করে ফেলেছি।'

'এখনই নয় রোজী!' – ওদের প্রধান বললো– 'তোমার মা বাবার কাছে গেলে হয়তো তোমার মতামত অন্যরকম হয়ে যাবে। এখানে তুমি ভয় ও অন্যান্য কারণে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকতে পারো এবং বয়সেও তুমি নবীন। আমরা তোমার মা বাবার কাছে তোমাকে পৌঁছে দেবো। সেখানে স্বাধীনভাবে ফয়সালা করার সুযোগ পাবে'।

রোজী ফয়সালা করে ফেলেছিলো। তিন মুজাহিদ তাকে বললো, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে ভেবে চিন্তে নিতে হয়। তাড়াহুড়া করো না। কিন্তু রোজী কেঁদে ফেললো। বলতে লাগলো, সে মা বাবার কাছে যাবেই না। উয়েস তাকে বললো, সেতো মিসর এসেছে ব্যাবসায়িক সূত্রে।

ওরা তো ওকে ওদের গোপন মিশনের কথা বলতে পারছিলো না। না ওকে ওদের সঙ্গে রাখতে পারছিলো। কিন্তু রোজীর জিদ ও অনবরত কান্না– আহাজারী ওদেরকে পেরেশান করে ফেললো। তিন মুজাহিদ এমন বিপাকে পড়লো যে,রোজীকে আর উপেক্ষা করতে পারছিলো না।

রোজী আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক মেয়ে। তাই দলের প্রধান আলোচনা করে রোজীকে মুসলমান বানিয়ে ফেললো। আর তার নাম রাখা হলো রাবিআ।

এখন সমস্যা দেখা দিলো, রাবিআকে তাদের আসল পরিচয় ও মিশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া যাবে কিনা। শরীয়ত মতে এখন এমন যুবতী একটি মেয়েকে এভাবে তারা রাখতে পারে না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তারা ফয়সালা করলো, রাবিআকে তাদের মিশন সম্পর্কে জানানো যায়।

ওরা রাবিয়াকে সব জানালো। কেন মিসর এসেছিলো? কী ওদের মিশন ? তিনজন কিবতী খ্রিস্টান সেজে ওকে যে পাদ্রী বিন ইয়ামিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে তাও জানালো।

'আমি সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গে থাকবো'– রাবিআ বললো– 'জানও দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবো সব সময়। কিন্তু এভাবে নয় যে, আমাকে নীল দরিয়ায় ফেলে দেয়া হবে...

আচ্ছা এটা কেউ ভেবে দেখেছো, যার কাছে আমরা যাচ্ছি সে কিবতী। তার কাছে অনেক কিবতীর আসা যাওয়া আছে। কেউ আমাকে চিনে ফেললে তো আর বাঁচতে পারবো না কোন দিন।'

হ্যাঁ, এ সমস্যার কথা ওদের মাথায়ও এসেছে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান তাদের কাছে ছিলো না। এটা ওরা আল্লাহর ভরসায় ছেড়ে দিলো।

✪ ✪ ✪
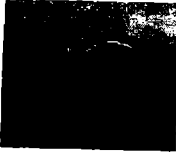
কূস থেকে বিন ইয়ামিনের ঠিকানা খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু পথ এতই দুর্গম যে, তাদের পৌছতে পৌছতে দুপুর গড়িয়ে গেলো। বিন ইয়ামিনের গোপন আস্তানাটি একটি মরুদ্যানে অবস্থিত। জাহান্নামে যেন জান্নাতের ছোট একটি টুকরো। সেখানে একটি গির্জা আছে। গির্জার আশে পাশে কয়েকটি ছোট বড় তাঁবু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিন ইয়ামিন গির্জার একটি কামরায় থাকেন। তাকে জানানো হলো একটি মেয়েসহ তিনজন লোক এসেছে। বিন ইয়ামিন তখনই তাদেরকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

তিন মুজাহিদের প্রধান ওদের পরিচয় দিলো। তারা হলবের লোক। তিনজন খ্রিস্টান। কিবতী ফেরকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর মেয়েটি উয়েসের স্ত্রী। মাত্র ওদের বিয়ে হয়েছে। রাবিআ মিসর দেখার জন্য ও বিন ইয়ামিনের সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল হয়েছিলো। ওরা ওদের মুসলমান নাম না বলে খ্রিস্টানদের নাম বললো। প্রত্যেকের গলায় ছোট একটি করে ক্রুশ ঝুলানো ছিলো।

'আপনারা কি শুধু আমার সাক্ষাতেই এসেছেন'? – বিন ইয়ামিন কৌতুহলী গলায় জিজ্ঞেস করলেন– 'না কি অন্য কোন ব্যাপার আছে? ... শামের খ্রিস্টানদের অবস্থা কি?'

'শাম থেকে আমরা কেবল আপনার সাক্ষাতেই এসেছি'– দল প্রধান বললো– 'তবে বিশেষ একটি কথাও আছে .. . শামে রোমীয়রা খ্রিস্টানদেরকে অনেক বড় ধোকা দিয়েছে। আমরা ত্রিশ হাজারের একটি লশকর হয়ে হেরাকলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হেরাকল ও তার ছেলে কস্তন্তীন আমাদের সঙ্গে অতি দুর্ব্যবহার করেন। আমাদের সরদাররা এটা বুঝতে পারেন যে, আমরা মুসলমানদের চির শত্রু বানিয়ে এসেছি। অথচ রোমীয়রা আমাদরেকে সামনে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে পালানোর ফিকিরে ছিলো . . .

'তারপরও রোমীয়দের উস্কানিতে মুসলমানদের বিজিত এলাকায় আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসি। তারপরও ওরা আমাদের সাহায্যে আসেনি। পরিণামে আমরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই। মুসলমানরা আমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারতো। আমাদের মেয়েদেরকে দাসী ও আমাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু তারা এসব অমানবিক কোন কিছুই করেনি। ওরা নিজেদের বিজয়ী

ও আমাদের পরাজিত বলে খাটো চোখে দেখেনি। আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি।'

'মুসলমানদের উদার আদর্শের কথা আমি জানি'- বিন ইয়ামীন বললেন- 'রোমীয়দের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো, এদের বদ চরিত্র ও মিসরে এদের বিকৃত ধর্ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া। তোমরা তো জানো আমি এখানে আত্মগোপন করে আছি। শামের খ্রিস্টানদের জন্য আমি এখান থেকে আর কি করতে পারবো ?'

'আমরা আপনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে আসিনি, আমরা মিসরের ঈসায়ীদের সাহায্য করতে এসেছি।'

'শাম থেকে আমাদেরকে কি করে আপনারা সাহায্য করবেন ?'

'আমাদের সরদার ও পাদ্রীরা মিসরের অবস্থা জানেন। মিসরের কিছু খ্রিস্টান গোত্র পালিয়ে শাম চলে গিয়েছে। তারা ওখানে গিয়ে জানিয়েছে, মিসরের খ্রিস্টানরা কতটা জুলুমের শিকার। আমাদের নেতাদের পক্ষে তো এটা সম্ভব নয় যে, সেনাদল গঠন করে মিসরে হামলা চালাবেন। এক মুসলমান সিপাহসালার আমর ইবনে আসের কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন . . .

'তাতে দু'জন বর্ষিয়ান পাদ্রীও ছিলো। প্রতিনিধি দল মুসলিম সিপাহসালারকে মিসরীয় ঈসায়ীদের করুণ নির্যাতিত জীবনের কথা জানায়। তারা এ প্রস্তাবও করে যে, মুসলিম সেনারা যদি মিসরীদের সাহায্য করে তাহলে শামীয় খ্রিস্টানরা ত্রিশ চল্লিশ হাজার সেনা দিয়ে সাহায্য করবে।'

উয়েসের দল প্রধান এভাবে বলে যেতে লাগলো। আর বিন ইয়ামিন গভীর মনোযোগে তা শুনে যেতে থাকেন। দলপ্রধান চাচ্ছিলেন, মিসরের খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করে বসবে, আর সে সুযোগে মুসলমানরা হামলা চালাবে। আর বিদ্রোহ না করলেও মুসলমানরা হামলা করলে তারা মুসলমানদের সাহায্য করবে।

'আমি আরেকটি কথা বলবো'- দলপ্রধান বললো- 'এটা দেখে আফসোস হয় যে, খ্রিস্টানরা দ্বিধা বিভক্ত। এটা খ্রিস্ট ধর্ম ও খ্রিস্টানদের ঐক্যের বিপক্ষে ভয়াবহ এক বাধা। এ কুপ্রথাও খ্রিস্টানদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে যে, প্রতি বছর একজন করে কুমারী মেয়েকে নীল নদে ফেলে দেয়া হয়। আপনি কি এ অমানবিক প্রথা রোধ করতে পারেন না ?'

'আমিও এ প্রথাকে সঠিক মনে করি না'- বিন ইয়ামিন বললেন- 'আমি ইয়াকুবী ফেরকার কিবতী, ইয়াকুবীরা এ প্রথাকে পাপ বলে মনে করে। কিন্তু এখন এ বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। যারা বলি দেয় তারাও আমাকে মান্য করে এবং হেরাকলের বিরুদ্ধে আমার সব দিক নির্দেশনা অনুযায়ি তারা কাজ করে। তাই এর বিরোধিতা করলে কট্টর কিবতীরা তা মানবে না। এর ফলে বিভক্তি আরো বাড়বে। যে

কথা বলতে এসেছো তাই বলো'— বিন ইয়ামিন সম্বোধনে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন।

'সে কথা বলা হয়ে গেছে'— দলপ্রধান বললো— 'এখন আপনার জবাব ও হুকুম শুনতে চাই। সেটাই আমাদের নেতাদের কাছে পৌছে দেবো।'

'তোমাদের নেতা বা সরদারদের কাছে নয়— বিন ইয়ামিন স্মিতহাস্যে বললেন — 'তোমাদের সিপাহসালার আমর ইবনে আসের কাছে আমার জবাব বা পয়গাম পৌছে দেবে। তুমি এত বেশি বলে ফেলেছো যে, তোমরা যে পর্দাবৃত হয়েছিলে তা তোমাদের ওপর থেকে সরে গেছে। তোমাদের আসল পরিচয় পৌছে গেছে আমার কাছে। এই মেয়েকে দেখে আমি ভাবছিলাম ও কে নিয়ে কেন তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছো! মুসলমানরা তো মেয়েদেরকে যুদ্ধে বা গোয়েন্দা বৃত্তিতে ব্যবহার করে না।'

'আমি নওমুসলিম' 'রাবিআ বললো'—কালই ইসলাম গ্রহণ করেছি। শামের হলব শহরে আমার বাড়ি।

রাবিআর সেই কাহিনীও বিন ইয়ামীনকে শোনানো হলো। কোন কথা গোপন করা হলো না, আবার বাড়িয়েও বলা হলো না।

'এরাই নিজেদেরকে চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে'— রাবিআ কৃতজ্ঞ গলায় বললো— 'অমি ওদের চরিত্র মাধুরীতে এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, তাদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছি। তারা আমাকে অতি পবিত্র জেনেই অত্যন্ত সম্মান দিয়ে ওদের সঙ্গে রেখেছে'।

'আমিও সবে মাত্র মুসলমান হয়েছি'— উয়েস বললো— 'আমার সর্বস্ব ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি'— উয়েস বিন ইয়ামিনকে শোনালো কেন সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

'তোমাদের সিপাহসালারকে বলবে'— বিন ইয়ামিন বললেন— 'হেরাকল আমাদের সম্মিলিত শত্রু। যদি মুসলমান মিসরে সৈন্যদল পাঠায় তাহলে কিবতী খ্রিস্টানরা কখনো হেরাকলকে সাহায্য করবে না। সে সময়ের কথা এখনো আমি ভুলিনি যখন কায়সারে রোম ছিলেন ফুকাস। তিনি তো খ্রিস্টানদের জাত শত্রু ছিলেন। হেরাকল বিদ্রোহ করলে আমরা তাকে সহযোগিতা করি এবং ফুকাসকে নামিয়ে হেরাকলকে সিংহাসনে বসাই . .

'হেরাকল নিজে খ্রিস্টান হয়েও খ্রিস্টানদের সেই ত্যাগ ও সহযোগিতার কথা ভুলে গিয়ে খ্রিস্টানদের স্বাভাবিক জীবনকে সংকটময় করে তুলেন। ঈসায়ীদের জন্য তিনি হয়ে উঠেন হিংস্র কসাই। তার হুকুমে ঈসায়ী কৃষকদের রক্ত পানি করা ফসল ও গৃহপালিত পশু ছিনিয়ে পাঠানো হতো বযনতিয়ায়। ঈসায়ীদের হত দরিদ্র বানিয়ে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অন্যায় করের বোঝা . . .

' ঈসায়ীদের ওপর বয়ে যাওয়া জুলুমের দাস্তান অনেক দীর্ঘ। শামের ঈসায়ী গোত্রগুলোকে হেরাকল ধোকা দিয়েছেন। মুসলমানদের সামনে ওদেরকে ঢাল বানাতে

চেয়েছেন। আমি জানি, মুসলমানরা বিজিত এলাকার লোকদের ধর্মীয় চেতনায় হস্তক্ষেপ করে না। জিযিয়া– করের বিনিময়ে সকল ধর্মীয় লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেয় .

'আমার দূর দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে অনাগত দিনগুলো। মুসলমানরা যদি স্বীয় আদর্শে অটল থাকতে পারে তাহলে ঈসায়িয়াত তার অনুসারীদের ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করাতে থাকবে এবং মিসর হয়ে যাবে ইসলামী সাম্রাজ্য। রোমীয়রা মিসরে থাকতে পারবে না। মুসলমানরা মিসরে অভিযান শুরু করলে এখানকার খ্রিস্টানরা নিরব দর্শক বনে থাকবে। আর এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, মিসরীরা ধর্মীয় দিক দিয়ে রোমীয়দের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও মিসরীরা মুসলমানদেরকে স্বাগত জানাবে . . .

'তোমরা ফিরে যাও। ঈসায়ীদেরকে রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কে দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা বিদ্রোহ করবো না। আমাদের কাছে রোমীয়দের মতো যুদ্ধশক্তি নেই। রোমীয়দেরকে আমরা এ ধোকার মধ্যে রাখতে চাই যে, আমরা তাদের অনুগত প্রজা।'

✪ ✪ ✪

তিন মুজাহিদ গোয়েন্দার মিসর সফর বলতে গেলে দারুণ সফল হলো। তাদের আর মিসরের কোথাও গিয়ে খ্রিস্টানদের বিদ্রোহে উস্কে দিতে হবে না। আসফকে আজম বিন ইয়ামিন তাদেরকে সেই নিশ্চয়তা দিয়ে দিয়েছেন। সফলতার ভাগ উয়েস একটু বেশিই পেলো। রাতে উয়েসরা সরাই খানায় থাকলো। পর দিন সকাল হওয়ার আগেই ওরা উট ভাড়া করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। রাবিআর ব্যাপারে উয়েস খুব শংকিত ছিলো। কারণ, ওকে কেউ চিনে ফেললে আবার নীল দরিয়ায় বলি দিতে তারা কাল বিলম্ব করবে না। ওদের ভাগ্য ভালো যে, মাত্র নোঙ্গর তোলা একটি জাহাজ ওরা পেয়ে গেলো।

পথেই উয়েসরা জানতে পারে তাদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস বায়তুল মুকাদ্দাসে রয়েছেন। জাহাজের সফর শেষ করে ওরা সময় নষ্ট না করে আমর ইবনে আস (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

'বলো, তোমরা কি করে এসেছো ? আমর ইবনে আস (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

দল প্রধান তাদের মিশনের ফলাফল সবিস্তারে বলে গেলো। বিন ইয়ামিন তাদেরকে কি বলেছেন এবং তার কথা যে বেশ আশাব্যঞ্জক তাও ব্যাখ্যা করে বললো।

'এতো কিবতীদের আসফকে আযমের কথা'– দল প্রধান বললো– কিন্তু আমরা ওখানে প্রত্যেক ঈসায়ীর মনে রোমীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরপুর দেখেছি। প্রতিটি

মাহফিলে, গির্জায়, সরাইখানায়, মুসাফিরদের কাফেলায় এ ঘৃণার প্রকাশ ঘটছে অকপটে।'

'বিন ইয়ামিন যা বলেছেন আমি সেটাই শেষ কথা বলে মনে করছি'– আমর ইবনে আস (রা) বললেন।

'আমি একটা কথা বলতে চাই'– এক মুজাহিদ বললো– 'মিসরে হামলা করতে হলে দ্রুত করুন। রোমী ফৌজ মানসিক ও দৈহিকভাবে এখনো সামলে উঠতে পারেনি। আর মিসরের খ্রিস্টানরা এ ফৌজের দুশমন বনে গেছে। হয়তো এ অবস্থা পাল্টে যেতেও সময় লাগবে না।'

আমর ইবনে আস (রা) রিপোর্ট শুনে বেশ স্বস্তি পেলেন। বলতে লাগলেন প্রথমে সুযোগেই তিনি মদীনা যাবেন এবং অমীরুল মুমিনীন থেকে হামলার অনুমতি আনবেন।

কাজের কথা হওয়ার পর সিপাহসালারকে রাবিআর কাহিনীও শোনানো হলো। রাবিআকে কেল্লার নারী মহলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

উয়েস সিপাহসালারের কাছে আবেদন করলো, রাবিআর সঙ্গে তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দিতে। আমর ইবনে আস (রা) এক মহিলার মাধ্যমে রাবিআর জবানবন্দি নিলেন। সে কি করে উয়েসের সাক্ষাত পেয়েছে ? কি কি ঘটেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাবিআ সে কাহিনীই শোনালো সিপাহসালার যা কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন।

উয়েসের প্রস্তাবের কথা রাবিআকে জানানো হলো। রাবিআ সে প্রস্তাবে হাসিমুখে রাজি হয়ে গেলো।

সিপাহসালার সেদিন রাতেই অনারম্বড় এক মজলিসে উয়েস ও রাবিআকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

আমার ইবনে আস (রা) মদীনায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি করছিলেন। আশা করছিলেন মিসর হামলার এজাযত এবার প্রথম দফাতেই পেয়ে যাবেন। তিন চার দিন পর মদীনা থেকে আমীরুল মুমিনীনের এক পয়গাম নিয়ে কাসেদ এলো। পয়গাম পড়ে আমর ইবনে আস (রা) কেঁপে উঠলেন। এত নির্ভীক-অকুতোভয়- আত্মবিশ্বাসী সিপাহসালারের হাতের কাঁপুনি চোখ এড়ালো না কাসেদের।

পয়গাম শুধু এতটুকু ছিলো– 'আমর ইবনে আস (রা) এর নামে আসসালামু আলাইকুম। পর সমাচার, তুমি কি আমাকে আমার সঙ্গীদেরকে এবং আমি যাদের

যিম্মাদার তাদের ধ্বংস হতে দেখতে পছন্দ করবে? আর তুমি ও তোমার সঙ্গীরা বেঁচে থাকতে চাইবে? মদদ-মদদ, সাহায্য, সাহায্য, সাহায্য।'

'কি এমন বিপদ দেখা দিয়েছে?' – আমর (রা) কাসেদকে জিজ্ঞেস করলেন।

'দুর্ভিক্ষ'-কাসেদ জবাব দিলো– 'আরবের দক্ষিণ থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ হাজার হাজার মানুষ ও গৃহপালিত পশুর প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। মদীনায় ফিরতে ফিরতে না জানি আরো কত প্রাণ অকাতরে ঝরে পড়ে। শস্য তরকারির একটি দানাও কোথাও চোখে পড়ছে না। এক ফোটা পানির জন্য মানুষ হাহাকার করে মরছে। দুধেলা গরু মহিষ উটগুলো হাড্ডিসার কংকাল হয়ে গেছে। ওরা নিজেরাই তো এক মুঠো ঘাস চোখে দেখতে পাচ্ছে না। দুধ দিবে কোত্থেকে?'

১৮ হিঃ মোতাবেক ৬৩৯ সনে এ ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ পুরো আরবকে গ্রাস করে।

কাসেদ দুর্ভিক্ষের করুণ বর্ণনা দিয়ে গেলো আর শ্রোতারা বার বার অনাগত বিপদ শংকায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। আমর ইবনে আস (রা) খুব সংক্ষেপে আমীরুল মুমিনীনের নামে এ মর্মে পয়গাম লিখলেন–

'আমীরুল মুমিনীনের নামে– আসসালামু আলাইকুম। আম্মাবাদ, আপনি নিশ্চিত থাকুন খাদ্য শস্যের এমন এক কাফেলা পাঠাচ্ছি, যার এক মাথা হবে আপনার কাছে আরেক মাথা থাকবে আমার কাছে।'

আমীরুল মুমিনীনকে একই পয়গাম পাঠালেন, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, আবু উবাইদা (রা) ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এর কাছে।

আমর ইবনে আস (রা) ফিলিস্তীন থেকে স্থল পথে খাবার ও ঘিয়ে বোঝাই এক হাজার উট পাঠালেন। আর নৌপথে ইলা (বর্তমানে আকাবা) বন্দর থেকে বিশটি সামুদ্রিক জাহাজ পাঠালেন। যেগুলোতে বিভিন্ন প্রকার খাদ শস্য ছাড়াও পাঁচ হাজার কম্বল ছিলো।

শামের এক অংশ থেকে হযরত মুআবিয়া (রা) তিন হাজার উট বোঝাই আটা ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পাঠালেন। এর মধ্যে তিন হাজার আলখেল্লা-জুব্বাও ছিলো।

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ইরাক থেকে খাদ্যশস্য ও তরিতরকারির এক হাজার উট পাঠালেন।

শামের আরেক অংশ থেকে চার হাজার উট বোঝাই খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা) নিজে কাফেলার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

খাদ্যসামগ্রীর এই কাফেলা মদীনায় পৌছার পর দুর্ভিক্ষ কবলিতদের মাঝে তা বন্টনের দায়িত্ব আমীরুল মুমিনীন দিলেন হযরত আবু উবাইদা (রা) এর কাছে।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আমীরুল মুমিন হুকুম দেন, আবু উবাইদা (রা) এর চার হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে।

'আমরুল মুমিনীন!' – আবু উবাইদা (রা) এই হুকুম শুনে বললেন– এ বিনিময়ের প্রয়োজন নেই আমার। কেবল আল্লাহকে খুশী করার জন্য আমি আল্লাহর রাস্তায় এ টাকা সাহায্য করেছি। পার্থিব লাভের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করবেন না।'

'এ বিনিময় তো তুমি নিজে চেয়ে নিচ্ছো না'– আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) বললেন– 'এজন্য এটা নেয়া কোন দোষের বিষয় হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গেও আমার এ ধরণেরই একটি ঘটনা ঘটেছিলো। তুমি এখন জবাবে যা বলেছো আমিও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর খেদমতে তাই আরজ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমাকে পয়সা নিতে বাধ্য করলেন।'

আবু উবাইদা (রা)ও বাধ্য হয়ে চার হাজার দিরহাম নিয়ে শামে ফিরে গেলেন। কারণ শামের মুসলিম প্রশাসন তখনো পুরোপুরি সংগঠিত রূপ নিতে পারেনি।

✪ ✪ ✪

ভয়ঙ্কর সেই দুর্ভিক্ষে আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর অধীনস্থরা যে অবিস্মরণীয় ত্যাগের মহিমা দেখিয়েছেন তার স্মৃতিচারণ না করলে বড় অন্যায় হবে ইতিহাসের সত্যতার প্রতি।

তখন আকাশ থেকে মুছে গিয়েছিলো মেঘের সিক্ত আবহ। মেঘহীন আকাশ দখল করে নিয়েছিলো সর্বগ্রাসী সূর্য। উন্মত্ত রাগী সূর্যের সেই আগুনের উত্তাপে ফসলের মাঠ পুড়ে উজার হয়ে গিয়েছিলো। কিষাণ হাল চালাবে কি; ফুটন্ত পানির মতো যে মাটিও ফুটছিলো। যে ফসলগুলো পেকে উঠতে যাচ্ছিলো সেগুলো পুরে ছাই হয়ে গেলো।

কুলকুল করে বয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঝর্না, পানির নালাগুলো শুকিয়ে গেলো। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। বিবর্ণ ধূসরতা সব গ্রাস করছিলো বিরামহীন। গৃহপালিত পশুগুলো এত দ্রুত মরছিলো যেন মৃত্যু সমানে ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছে। শুধু গরিব সহায়-সম্বলহীনরাই নয় সম্পদশালীরাও সমানে অভুক্ত থেকে থেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলো। টাকা পয়সা হয়ে গিয়েছিলো মূল্যহীন বস্তু।

ইতিহাসের পাতায় 'আমুররিমাদ'বা 'জ্বলন্ত দুর্ভিক্ষের বছর' বলা হয় এ দুর্ভিক্ষের বছরকে।

এ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দেশের কাণ্ডারীরা কি অবদান রেখেছিলেন। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা কি শুধু সভাসমাবেশ আর তারপর মিছিল করে নিজের ঘরে গিয়ে মুরগি চিবিয়ে খেয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়েছেন?

শাম, ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম প্রদেশ থেকে আগত খাদ্যশস্যের কাফেলাগুলোকে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার হুকুম দেয়া হলো। আরেকটি হুকুম দেয়া হলো, খাদ্যশস্য বোঝাই করে কাফেলার সঙ্গে যেসব উট এসেছে সেগুলো আর ফিরিয়ে নেয়া হবে না। উটগুলো যবাই করে লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে।

তা ছাড়া দুর্ভিক্ষে পড়ে গৃহপালিত কোন উটই জীবিত ছিলো না। জীবিত কোন উট পাওয়া গেলেও সেটা হতো হাড়সর্বস্ব কঙ্কাল। গোশতের কোন নাম নিশানা ছিলো না। তাই কাফেলার সঙ্গে আসা প্রায় দশ হাজার মোটা-তাজা উট জবাই করে দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হলো।

মদীনা ছিলো আরবের কেন্দ্রীয় শহর। দারুল খিলাফত। মদীনায় অস্বচ্ছল লোক খুব কমই ছিলো। ঘরে ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ থাকতো। সেই মদীনায় এখন হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। শরনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরা সবাই অন্ন বস্ত্রের অভাবে জর্জরিত। এমনকি মা তার শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে পারছিলো না। দুধের অভাবে শত শত শিশু ছটফট করতে করতে ঢলে পড়ছিলো মৃত্যুর কোলে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) মদীনার লোকদেরকে বলে দিলেন, প্রত্যেকে যেন পূর্বের তুলনায় দশগুণ খাবার পাক করে এবং তা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। মদীনাবাসী অক্ষরে অক্ষরে সে হুকুম পালন করে। হযরত উমর (রা) ঘুরে-ফিরে দেখভাল করছিলেন। মদীনার মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সবাই যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তবু অনাহারে থেকে যাচ্ছিলো কিছু লোক।

আমীরুল মুমিনীন এর সমাধানও বের করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, শহরের কারো ঘরে খাবার পাকানো হবে না। সবার খাদ্য-সরঞ্জাম এক জায়গায় জমা করা হবে এবং এক সঙ্গে পাকানো হবে। নিজের ঘর থেকে আমীরুল মুমিনীন এর সূচনা করলেন। খাবার এক জায়গায় পাক হতে লাগলো। আমীরুল মুমিনীন তার পরিবারসহ গণদস্তরখানায় খাবার খেতেন।

প্রতিদিন দু'বেলা প্রায় দশ হাজার লোক এক সঙ্গে খাবার খেতো। বৃদ্ধ, অক্ষম, অসুস্থ নারী ও শিশু যারা গণদস্তরখানায় আসতে পারতো না তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার। তাদের কাছে খাবার পৌঁছে যেতো।

একদিন দস্তরখানায় দস্তরখানায় ঘি দিয়ে তৈরী খাবার দেয়া হলো। আমীরুল মুমিনীন এক বেদুইনকে তার প্লেটে বসালেন। দু'জনে এক প্লেটেই খেতে লাগলেন।

বেদুইন প্লেটের যেখানেই ঘি-এর পরিমাণ বেশি দেখতো সেখানেই তার হাত চলে যেতো। খাবারের লোকমাও তুলছিলো বড় বড় আকারে। এক লোকমা শেষ হওয়ার

আগেই আরেক লোকমা তুলছিলো। আমীরুল মুমিনীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো ঘি-রুটি খাওনি?'

বেদুইন অভিযোগের সুরে বললো, 'আমীরুল মুমিনীন! যখন থেকে দুর্ভিক্ষ পড়েছে তখন থেকে কখনো না ঘি দেখেছি, না ঘিয়ে ভাজা রুটি দেখেছি। আর না কাউকে ঘি-রুটি খেতে দেখেছি।'

আমীরুল মুমিনীন শপথ করলেন, যে পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ থাকবে, তিনি ততদিন ঘি খাবেন না। সবাই দেখলো, তিনি ঘিয়ের সঙ্গে গোশত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি এত বেশি ছোটাছুটি করতেন যে, এই দেখা যেতো তিনি খাবারের ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করছেন। একটু পরেই দেখা যেতো বহুদূরের এলাকায় গিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে জিজ্ঞেস করছেন, তারা দু'বেলা খাবার পাচ্ছে কি না।

অবিরাম হাড়ভাঙা খাটুনি, ছোটাছুটি, লাগামহীন দুশ্চিন্তা– এগুলোর একটা ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব ছিলোই। এ ছাড়াও তিনি দৈনন্দিন খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিলেন। তার লালাভ উজ্জ্বল দেহ-বর্ণ ফিকে আর কালচে বর্ণ হয়ে উঠলো। দেহ শীর্ণকায় হয়ে উঠলো।

আমীরুল মুমিনীনের বন্ধু-স্বজন, যাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন, তারা বার বার তাকে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন তার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। দৈনন্দিন খাবারটা যেন ঠিকমত গ্রহণ করেন।

এর জবাবে তিনি যা বললেন, তা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বললেন,

'মানুষের কষ্ট দুর্ভোগ আর দুর্দশা আমি তখনই অনুভব করতে পারবো যখন আমি নিজে এ দুর্ভোগে আক্রান্ত হবো।'

আল্লাহর দরবারে তার অনবরত অশ্রু ঝরতো। ব্যকুল হয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'হে আল্লাহ! এ দুর্ভিক্ষ যদি আমার কোন গুণাহ বা কোন দায়িত্ব অবহেলার কারণে হয়ে থাকে তা হলে আমাকে মাফ করে দিন। আমার দেশবাসীকে আর শাস্তি দিবেন না।'

কোন দুআই যেন আল্লাহর রহমতের বরফ গলানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো না।

✪ ✪ ✪

আরবের মাটি যেন আরববাসীর ঘোরতর শত্রু বনে গেলো। তার দাবানলীয় উত্তাপে সব খরকুটায় পরিণত করেও নিস্তার দিচ্ছিলো না।

আমীরুল মুমিনীনের সর্বাত্মক ব্যবস্থাদি ও তার অমানুষিক পরিশ্রম হয়তো ক্ষুধা-কাতর মানুষগুলোর অন্ন যোগান দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ মরণ ছোবল থেকে তো কেউ বাঁচতে পারছিলো না।

এর মধ্যে আবার সাহাবায়ে কেরাম ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ আমীরুল মুমিনীনের অতি দ্রুত স্বাস্থ্যহানির বিষয়ে তাঁকে সতর্ক হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ক্রমেই অবনতিশীল ভঙ্গুর স্বাস্থ্য তাঁর দৌড়-ঝাপ থামাতে পারছিলো না। তাছাড়া তাঁর স্থানীয় বিষয়ে পেরেশানীর অন্ত ছিলো না। স্বাস্থ্য অটুট রাখার মতো পুষ্টিকর খাবার তিনি ছুঁয়েও দেখতেন না। বলতেন, এ খাবার তখনই আমি গ্রহণ করতে পারবো যখন আমার কওমের প্রতিটি সদস্য পেট ভরে খেতে পারবে দু'বেলা।

বর্ষীয়ান সাহাবাগণের পরামর্শে কয়েকজন যুবক খাওয়ার সময় হযরত উমর (রা) কে কোন এক অজুহাতে গণদস্তরখানা থেকে উঠিয়ে আনলেন। অন্য পৃথক দস্তরখানায় বসালেন। সামনে গোশত ও পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করে কোন আলোচনায় তাকে মগ্ন করে দিলেন। যাতে তিনি কথা বলতে বলতে অজান্তেই খাবার থেকে অবসর হয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু খাবারের দিকে হাত বাড়াতেই তার ঈগল চোখে ধরায় পড়ে গেলো তাদের আন্তরিক চালাকি।

আমীরুল মুমিনীন কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'দস্তরখানায় ঘুরে ফিরে দেখো। না খেতে খেতে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যাওয়া কাউকে এ খবার দিয়ে এসো। আমার জন্য সাধারণ খাবারই ভালো।'

সে রাতেই উমর (রা) সাধারণ দস্তরখানায় খাওয়ার পর পানি চাইলেন। তাকে মধু মেশানো পানি দেয়া হলো। তিনি এক ঢোক পান করেই গ্লাস এক দিকে সরিয়ে রাখলেন। অত্যন্ত অনুযোগের সুরে বললেন,

'কেন তোমরা এমন করো ? আল্লাহর কসম! আমি এমন কিছু করবো না কিয়ামতের দিন যে ব্যাপারে আমার কাছে তার জবাবদিহি তলব করা হবে।'

একদিন আমীরুল মুমিনীন তার ছোট ছেলেকে তরমুজের একটি টুকরো খেতে দেখলেন। তাকে বিদ্রুপ করে বললেন,

'বাহ বাহ আমীরুল মুমিনীনের বেটা! তুমি ফল চিবোচ্ছো আর রাসূলুল্লাহ (স) এর উম্মত ভুখা-নাঙ্গা হয়ে মরছে।'

বাবার কঠোর মেজাজ সর্ম্পকে তো ছেলে ভালোই জানতো। বাচ্চা ছেলে এত শখ করে একটা জিনিস খাচ্ছে। সে কেঁদে ফেললো। এতটুকু অবুঝ বাচ্চার কান্নাও তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারলো না। তখন এক লোক এসে আমীরুল মুমিনীনকে জানালো, আপনার এ বাচ্চা তার কয়েকটি খেজুরের বিনিময়ে তরমুজের এ টুকরোটি নিয়েছে। এটা শুনে তিনি নিশ্চিত হলেন তার ছেলে অন্যায় করছে না।

ছয় সাত মাস কেটে গেলো দুর্ভিক্ষের। ইরাক ও শাম থেকে অতি দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আনাজ তরকারি আসছে এবং সেগুলো দুর্ভিক্ষ কবলিত বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে যাচ্ছে।

একদিন উমর (রা) মদীনা থেকে সামান্য একটু দূরের এক বসতিতে গেলেন। সেখানে দুটি বাড়ি থেকে শোক-মাতমের শব্দ পেলেন। এক মহিলার যুবক ছেলে ও আরেক মেয়ের স্বামী মারা গেছে। উমর (রা) প্রথমে মৃতদের পরিবারের প্রতি যথাসাধ্য সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, এরা না খেয়ে মরেনি তো ?'

তিনি জবাব পেলেন, না! এক বেলাও এরা অভুক্ত থাকেনি। এক অজানা রোগে এরা মারা গেছে।

উমর (রা) হুকুম দিলেন বায়তুল মাল থেকে এদের কাফন দেয়া হবে। কাফনের পর নামাযে জানাযার ইমামতি করলেন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন উমর (রা)।

এ অজানা রোগটি ভয়াবহ এক সংক্রমক ব্যধি হয়ে দেখা দিলো। ক্রমেই তা রূপ নিলো ধ্বংসাত্মক মহামারির। যেই এতে আক্রান্ত হতো চিকিৎসার কোন সুযোগ না দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো।

আমীরুল মুমিনীন যৎসামান্য যাই বিশ্রাম করতেন তাও এবার ছেড়ে দিলেন। এ ভয়ঙ্কর মহামারির প্রতিকারের জন্য গ্রামের পর গ্রাম ছুটোছুটি করতেন দিনরাত-অবিরাম। বড় বড় ডাক্তার বদ্যিদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। তাদের কোন চিকিৎসাই মৃতের সংখ্যা কমাতে পারছিলো না। চিকিৎসা করলে বেশির থেকে বেশি এতটুক হতো যে, দুএকদিন রোগ যন্ত্রণা বেশি ভোগ করে মারা যেতো।

হযরত উমর (রা) হুকুম জারি করলেন, এ রোগে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং দুর্ভিক্ষ চলাকালীন যারাই মারা যাবে তাদের দাফন-কাফন বায়তুল মালের পক্ষ থেকে হবে। উমর (রা) যেখানেই পৌছতে সক্ষম হতেন জানাযার নামায পড়াতেন।

প্রত্যেক নামাযের পর তিনি এ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি থেকে মুক্তি জন্য দুআ করতেন। দিনরাত দৌড়-ঝাপ করে রাতভর নামায পড়তেন আর ব্যকুল হয়ে কাঁদতেন।

দুআর মধ্যে উমর (রা) এ ফরিয়াদ অবশ্যই করতেন, 'হে আল্লাহ! হে গাফুরু রহীম! আমার গুণাহের সাজা আপনার প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে দিবেন না। অপনার বান্দাদেরকে আমার হাতে ধ্বংস করবেন না হে পরওয়ারদিগার!'

✪ ✪ ✪

অবশেষে আমীরুল মুমিনীনের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়লো। ভেঙে পড়লো তার স্বাস্থ্যও। তবু তিনি দমবার পাত্র নন। সবদিকে সংবাদ দিয়ে কাসেদ পাঠিয়ে দিলেন, সব মুসলমানকে জমায়েত করে ইস্তিস্কার নামায পড়া হোক। তারপর আল্লাহর দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ুক, যাতে তিনি এ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি থেকে আশু মুক্তি দান করেন। যারা আজ রাতের মধ্যেই মদীনায় পৌছুতে পারবে তারা যেন রাতের মধ্যেই মদীনায় পৌছে যায়।

দূরবর্তী এলাকায় যে কাসেদরা গেলো তারা রাতেও সফর অব্যহত রাখলো। পরদিন মদীনায় দুপুরে নামাযে ইস্তিস্কার সময় নির্ধারণ করা হলো।

পরদিন দুপুরে লক্ষাধিক মানুষ মদীনার ময়দানে সমবেত হলো। সূর্য-বর্ষিত আগুনের হলকায় জ্বলতে থাকা মাটি অঙ্গারের চেয়ে গরম ছিলো। খালি পায়ে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। কিন্তু লোকেরা আল্লাহর পবিত্র সত্বায় নিবিষ্ট হয়ে এমনভাবে একাকার হয়ে গেলো যে, তাদের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। নামাযের ইমামতি করলেন উমর (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাদর মোবারক জড়িয়ে রেখেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকরা তখনকার যে দৃশ্য চিত্রায়ন করেছেন তা পাঠ করলেও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। যখন সবাই ইস্তিস্কার নামায পড়ছিলো হেচকি তোলা তাদের কান্নার আওয়াজে ময়দান ভারি হয়ে উঠেছিলো। ব্যতিত্রক্রম ছিলো না আমীরুল মুমিনীনের অবস্থাও।

নামায শেষ করলেন আমীরুল মুমিনীন। কিন্তু তার কান্না শেষ হলো না। সবে শুরু হলো যেন। তিনি দুআর জন্য হাত তুললেন। দুআয় তিনি কি বলছিলেন তার এক শব্দও বুঝা যাচ্ছিলো না। বাচ্চাদের মতো তিনি হাউ মাউ করে কাঁদছিলেন। তার সাদা কালো

দাঁড়ি থেকে এমনভাবে অশ্রু গড়িয়ে আসছিলো যেন কেউ তার মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) উমর (রা) এর সামনে বসে দুআ করছিলেন। উমর (রা) দুআর মধ্যেই তার হাত ধরে তার পাশে দাঁড় করালেন এবং তার দু হাত ধরে প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন,

'হে মেহেরবান আল্লাহ! আমরা আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাজানকে শাফাআতের জন্য আপনার দরবারে পেশ করছি। আমাদেরটা না শুনলেও তাঁরটা তো ফেলে দিতে পারবেন না আপনি।'

হযরত আব্বাস (রা)-ও উমর (রা) থেকে আরো উঁচু আওয়াজে ফরিয়াদ তুললেন, 'হে আল্লাহ্! আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় রহমতের কয়েক ফোঁটা...

... অপ্রতিরোধ্য কান্নার দমকে তার কথা চাপা পড়ে গেলো। কান্নার চোটে তার শরীরটা যেন মোচড়ে মোচড়ে উঠছিলো।

যেসব জায়গায় আমীরুল মুমিনীনের কাসেদ গিয়েছিলো সেসব জায়গাতেও ইস্তিস্কার নামায আদায় করা হয়েছিলো। সেসব জায়গাতেও চোখের অশ্রুতে মানুষের মুখ বুক একাকার হয়েছে। নামায ও দুআর পর উমর (রা)-এর মুখে এ জপ চলতে লাগলো, 'আল্লাহ্ রহমান রহীম।'

তারপর আগুনের হলকা উৎক্ষিপ্ত আরো একটি দিন শেষ হলো। রাতও কাটলো দুর্দশাময় আরেকটি দিনের অপেক্ষায় গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে। কিন্তু সে রাতের কোলে এমন এক প্রভাতের উদয় ঘটলো যা দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

সূর্য যেন কোথাও মুখ লুকিয়ে আছে। আকাশ জুড়ে মেঘের কালো– কৃষ্ণ-পর্বত বিচরণ করছে। তারপর যখন সেই মেঘের পাহাড় ভেঙে পড়লো, দেখতে দেখতে চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে জলমগ্ন হয়ে গেলো।

সামান্য দূরের জিনিসও বৃষ্টির তোড়ে দেখা যাচ্ছিলো না।

নয় মাসের তৃষ্ণার্ত জমিন আল্লাহর অমূল্য রহমত তৃপ্তিভরে শুষে নিচ্ছিলো।

দু' তিন দিন পর বৃষ্টির তোড় কমলে উমর (রা) বেরিয়ে পড়লেন। এবার ছুটোছুটি শুরু করলেন পঞ্চাশ ষাট হাজারের শরণার্থী শিবিরে। শরণার্থীদেরকে অনতি বিলম্বে তাদের এলাকায় ফেরত পাঠাচ্ছিলেন। তারা যেন গিয়ে সদ্য সতেজ সিক্ত হওয়া জমির ফায়দা উঠিয়ে ফসলের বীজ বোনায় লেগে যায়।

✪ ✪ ✪
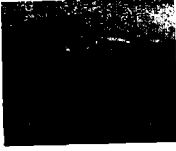
রোজি তো রাবেয়া হয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু যে ঘটনাকে ঘিরে রাবেয়া হয়েছে সে ঘটনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটেনি।

মাঝিমল্লার সরদারের কাছ থেকে উয়েস ও তার দু'সঙ্গী খ্রিস্টান ছদ্মবেশে রোজিকে উদ্ধার করেছিলো। সেই সরদারও তাদের তিনজনকে বিশ্বাস করে রোজিকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দেয়। সরদার নিশ্চিত ছিলো, ওরা রোজিকে বলিদানের স্থানে নিয়ে যাবে। কিন্তু ওরা তো নৌকার মাঝিকে মাঝ নদীতে হত্যা করে রোজিকে নিয়ে উড়াল দেয়।

সেই সরদার বলিদানের স্থানে খুব দ্রুত পৌছে গেলো। সরদারও বলিদানের দৃশ্য দেখে উপভোগ করবে এই ছিলো ইচ্ছে। কিন্তু সেখানে পৌছে দেখে বলিদানের পাদ্রী ও ধর্মীয় নেতারা রোজির জন্য অপেক্ষা করছে। তাদেরকে সরদার জানালো, তিন খ্রিস্টান যুবকের সঙ্গে সেই মেয়েকে তো অনেক আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শুনে সবাই হয়রান হয়ে গেলো। কোথায় গেলো মেয়েটি... বড় পাদ্রী ফতোয়া দিয়ে দিলেন, এ মেয়েকে নীল দরিয়া বলির জন্য গ্রহণ করেনি। নীল সেই মেয়েকেই চায় যাকে প্রথমে বলির জন্য গির্জার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিলো।

সে মেয়ে তো ছিলো হুরশীসের একমাত্র সন্তান। যে হুরশীস মেয়েকে বলিদান থেকে বাঁচানোর জন্য রোজিকে ইস্তাকিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলো। এ মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে রোজি তো গেলোই। তার সঙ্গে তার মেয়ের অলংকারগুলোও চলে গেলো। পাদ্রী কাল বিলম্ব না করে হুকুম দিলো, অলংকার ছাড়াই হুরশীসের কন্যাকে বলি দেয়া হবে। তখনই এক দল লোক হুরশীসের মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে বলি দানের সাজানো মণ্ডপে হাজির করলো এবং পাদ্রী তাকে নদীতে ফেলে দিলো।

হুরশীস কল্পনাও করেনি এভাবে তার মেয়ে চলে যাবে। আগে হারিয়েছে তার বহু মূল্যের অলংকার। আর এখন হারিয়েছে তার একমাত্র মেয়েকে। উভয় শোক তাকে উন্মাদ করে তুললো। সে তার ধর্ম সমাজ সব ভুলে গেলো। ভেতরে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধ স্পৃহা।

ওখান থেকে মাইল তিনেক দূরে রোমক ফৌজের চৌকি রয়েছে। হেরাক্লিয়াস পুরো মিশর জুড়ে হাজার হাজার ছোট বড় ফৌজি চৌকি স্থাপন করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য হলো,

সবখানে যাতে সরকারি খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খ্রিস্টানদের মধ্যে যে গোত্রভিত্তিক বিভক্তি আছে ও নানা কুসংস্কারপূর্ণ কর্মকাণ্ড আছে সেগুলোরও সুরাহা করা যায়।

হুরশীস সেই চৌকিতে পৌঁছে গেলো। সেখানকার প্রধান কমান্ডারকে জানালো ওদের গির্জার পাদ্রী তার মেয়েকে জোর করে তার ঘর থেকে উঠিয়ে নীল দরিয়ায় নিক্ষেপ করেছে। রোমী অফিসার তো চটে উঠলো। অফিসার তখনই পাদ্রী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তোড় জোড় শুরু কলো। কিন্তু হুরশীসই তাকে বাঁধা দিয়ে বললো।

'আপনি যে ব্যবস্থাই নিবেন এমনভাবে নিবেন যেন এটা প্রকাশ না পায় যে, আমি এসে আপনাদেরকে সব ফাস করে দিয়েছি। আমার বসতির লোকেরা যদি জানতে পারে আমিই সব ফাঁস করে দিয়েছি তা হলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না।'

রোমী অফিসার ব্যাপার বুঝে গেলো হুরশীস কি বলতে চাচ্ছে। অফিসার হুরশীসকে ফেরত পাঠালো। ফিরে এসে হুরশীস এ ঘটনা তার স্ত্রীকেও জানালো না।

পরদিন দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর ঘটনা ঘটলো। হুরশীসের বসতির লোকেরা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পেলো। বসতিটি অতি ছোট। পঁচিশটির বেশি ঘরবাড়ি হবে না। লোকেরা ঘরের বাইরে বের হয়ে এলো। দেখতে পেলো, রোমী ফৌজী অফিসার। এদেরকে এরা চিনে। এরা প্রায়ই টহল দিতে আসে এদিকে।

অফিসারের সঙ্গে একজন সেনা কর্মকর্তা ও প্রায় বিশজন সৈনিক রয়েছে। এরা এসে পুরো বসতি ঘিরে নিলো। অফিসার ঘোষণা করলো, কেউ যেন পালাতে চেষ্টা না করে। সবাই যেন ঘরের বাইরে চলে আসে।

লোকেরা দারুণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এরা সবাই কিবতী খ্রিস্টান। হেরাকলের সরকারি ধর্মের ঘোর বিরোধী। এরা নীল নদে কুমারী বলিদানের ব্যাপারেও

অন্ধবিশ্বাসী। ভয় তো এরা পাবেই।

'হুরশীস কে?' অফিসার জিজ্ঞেস করলো, 'যেই হও সামনে এসে দাঁড়াও।'

হুরশীস এগিয়ে এলো। অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং তার সওয়ার সৈনিককেও ঘোড়া থেকে নামতে বললো। তাদের ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় জমা করে ছেড়ে দেয়া হলো।

'গতকাল রাতে কি তুমি তোমার মেয়েকে বলি দানের জন্য নদীতে ফেলে ছিলে?' অফিসার হুরশীসকে জিজ্ঞেস করলো।

'না, করিনি।' হুরশীস বললো দৃঢ় গলায়।

কিভাবে কি জিজ্ঞেস করবে তা তো আগেই ঠিক করা ছিলো।

'তা হলে তোমার মেয়েকে নিয়ে এসো।'রোমী অফিসার বললো। 'তুমি যে মিথ্যা বলছো এটা আমি এখনই প্রমাণ করে দেবো। তোমার যে একটি মাত্র মেয়েই ছিলো। সন্দেহের বশে আসিনি আমি। একশ ভাগ নিশ্চিত হয়েই এসেছি আমি। তুমি সত্যবাদী হলে উপস্থিত করো তোমার মেয়েকে।'

দু' তিন মিনিট পর ষোল সতের বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে দৌড়ে এসে রোমী অফিসারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

'আমি ঘরে ছিলাম না। আমার বান্ধবীদের সঙ্গে অন্য এক বাড়ির ছাদে চড়ে আপনাদের দেখছিলাম। এখনই এক লোক দৌড়ে এসে জানালো, আপনারা না কি আমার বাবার উপর অপবাদ দিচ্ছেন, তিনি আমাকে নীলে ফেলে দিয়েছেন বলি করে। আমি ঘরে ছিলাম না বলে আমার বাবা পেরেশান ছিলেন।'

অফিসার বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হেসে উঠলো। সবাই যে তাকে বেকুব বানাচ্ছে অফিসার সেটা বুঝে গেলো। জটলা থেকে এক লোককে কাছে ডেকে আনলো অফিসার। জিজ্ঞেস করলো, এ মেয়ে কার সন্তান।

'হুরশীসের।' নির্ভয়ে জবাব দিলো লোকটি।

অফিসার আরেক লোককে একই প্রশ্ন করলো।

'আপনার প্রশ্ন শুনে তো আমি হয়রান হচ্ছি। আপনি কি মনে করছেন এ মেয়ে কার? অমুক বাচ্চা কার আমরা কি এটাও জানবো না? সবাই জানে এ হুরশীসের মেয়ে! এর নামই ঈনী।' লোকটি বললো।

রোমী অফিসার বসতির সবাইকে উদ্দেশ্য করে একই প্রশ্ন করলো। সবাই এক বাক্যে উত্তর দিলো, এ হুরশীসের মেয়ে। রোমী অফিসারের তো জানার কথা নয় যে, এরা চোখে চোখেই ঐক্যের কেতন উড়িয়ে দেয়। আর বসতির লোকেরাও বুঝে গেছে, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বলিদানের খবর রোমী চৌকিতে পৌছে দিয়েছে। যদি এটা প্রমাণ করা যায় যে, এ সংবাদ সঠিক, তাহলে তো এরা পুরো বসতিতে আগুন লাগিয়ে দিবে।

এদিকে রোমী অফিসারও চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লো। তার সন্দেহ হলো, হুরশীস মনে হয় ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষের কারণে বসতিবাসীকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। অফিসার দারুণ চটে উঠে হুরশীসের একটি হাত শক্ত করে ধরে হুরশীসকে এক দিকে নিয়ে গেলো।

'এই বেটা! তোমার মনে যে বদমায়েশি আছে সেটা খুলে না বললে এখনই সবার সামনে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো।' অফিসার হুমকি দিলো।

'সত্য বললে এরা আমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিবে।' হুরশীস ফিসফিস করে বললো, 'তারপরও আমি সত্য বলবো। তবে এখানে এবং এরপর আমাকে বাঁচানো আপনার দায়িত্ব।'

'ঠিক আছে তুমি সত্য বলো।'

হুরশীস জানালো সে আসলেই তার মেয়ে নয়। হুরশীস মেয়ের বাবা ও মায়ের নামও জানিয়ে দিলো।

বসতিটি নদীর খুব কাছে। লোকজন যেখানে জটলা করেছে সেটা প্রায় নদীর তীরে অবস্থিত। নদী থেকে তীর বেশ উঁচুতে। শ' দুয়েক ফিট হবে। এখান থেকেই বলিদানের কন্যাকে নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়।

রোমী অফিসার দূর থেকে ঈনীর মা বাবাকে চিনে নিলো। তারপর ঈশারায় কাছে গিয়ে ঈনীর মা বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, এ মেয়ে কার? দু'জনেই জবাব দিলো, হুরশীসের মেয়ে।

রোমী অফিসার সত্য জানার জন্য এবার ভিন্ন পথ ধরলো। মেয়ের হাতে ধরে তাকে নদীর উঁচু তীরে নিয়ে দাঁড় করালো। বহু নিচ থেকে স্রোতস্বিনী নদীর কুল কুল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দুই সিপাহীকে হুকুম দিলো অফিসার, ওকে তীর থেকে যেন একটু দূরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে বললো,

'আমি এ মেয়েকে নদীতে ফেলতে যাচ্ছি। ওর মা যদি ওকে বাঁচাতে চায় তা হলে এসে ওকে বাঁচাতে পারে। আমি ওয়াদা করছি, ওর মা বাবার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিচ্ছি। তাড়াহুড়া করো না। ভালো করে ভেবে দেখো।'

ঈনী নামক মেয়েটি নদী তীরের সামান্য ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দু'পাশে দুই সিপাহী। অফিসার লোকদের জটলার ভেতরের ফাঁকা জায়গার মধ্যে পায়চারী করছে। সন্দেহ নেই, রোমী অফিসারের এ কৌশল বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ছিলো। কোন মা-ই তো এটা সহ্য করতে পারবে না যে, তার মেয়েকে এমন নির্দয়ভাবে নদীতে ফেলে দেয়া হবে। আর সে নির্বিকার চেয়ে চেয়ে দেখবে। সবাই তা আশাও করছিলো, এখনই ঈনীর প্রকৃত মা-বাবা ওখানে দৌড়ে আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে যা ঘটলো তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলো না।

বসতির এক দিক থেকে ঝড়ের বেগে এক ঘোড়া সেখানে ছুটে এলো। সওয়ার রোমী ফৌজেরই এক সেনা কর্মকর্তা। তার ঘোড়া ছুটে গেলো মেয়েটির দিকে।

'ঈনী হুশিয়ার!' ঘোর সওয়ার জোশেলা কণ্ঠে বললো।

সওয়ার মেয়েটির কাছে এসে ঘোড়ার গতি একটু কমিয়ে দিলো এবং মেয়েটির দিকে ঝুকে তার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলো। মেয়েটিও তার দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিলো। কেউ কোন কিছু ভাবারও ফুরসত পেলো না। তবে যে দুই সিপাহী তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলো ওরা কিছুটা আঁচ করতে পারলো কি ঘটতে যাচ্ছে। দু'জনে আগন্তুক ঘোড়াটিকে থামানোর জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়া ওদের এত কাছে পৌছে গেলো যে, ওদের আর কিছুই করার রইলো না। সওয়ার ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে ঘোড়া সংঘর্ষ বাঁধালো। একজন গড়িয়ে পড়তে পড়তে একেবারে নদীতে গিয়ে পড়লো। আরেকজন নদীতে না পড়লেও এমনভাবে আহত হলো যে, আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

পর মুহূর্তেই ঘোড়াটি মুখ ঘুরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। সবাই দেখলো সওয়ারের পিছনে বসে আছে ঈনী। উৎফুল্ল মুখে সওয়ারের কোমর আকড়ে ধরে আছে।

রোমী অফিসার তার সিপাহীদের পিছু ধাওয়া করার হুকুম দিলো। সিপাহীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়তে লাগলো। তারপর সবাই এক-যোগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু এই পিছু ধাওয়াকারীরা ঈনী ও উদ্ধারকারী রোমী সেনা কর্মকর্তার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারলো না। কারণ, তারা ততক্ষণে তার দৃষ্টিসীমার বাইরে ঘন জঙ্গলের পথে চলে গিয়েছে। এমনকি তাদের ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনিও খুব দ্রুত কমতে কমতে এক সময় আর শোনা গেলো না।

✪ ✪ ✪

ঈনীকে রোমী ফৌজের যে কর্মকর্তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো তার নাম বিন সামির। দারুণ সুদর্শন যুবক। ঈনী ও হুরশীসদের বসতি এলাকায় প্রায়ই ডিউটিতে আসতো। একদিন পথে ঈনীর সঙ্গে বিন সামিরের দেখা হয়ে যায়। ঈনীকে তার বেশ ভালো লেগে যায় এবং সে অকপটে তা ঈনীকে বলে। সৈনিকদেরকে সবাই এড়িয়ে থাকতে চাইলেও বিন সামিরের সরল স্বীকারোক্তি ও তার সুদর্শন অভিব্যক্তি ঈনীকে বেশ প্রভাবান্বিত করে।

এরপর তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। দু'জনের মন দু'জনকে সপে দেয়। একদিন বিন সামির ঈনীকে এক নতুন কথা শোনায়।

'আমি আজ আমার একটি গোপন বিষয় তোমার কাছে প্রকাশ করছি ঈনী!' বিন সামির নিচু কণ্ঠে চার দিকে সাবধানী চোখ রেখে বললো, 'আমার প্রতি তোমার পূর্ণ বিশ্বাস

আছে বলেই বলছি তোমাকে। আমার এ বিষয়টা যে কতটুকু গোপনীয় ও স্পর্শকাতর আশা করি তুমি সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। ... আমি কিবতী ঈসায়ী খ্রিস্টান। কিন্তু আমার ফৌজি সঙ্গীরা জানে, অমি হেরাকলের সরকারি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। আসল ঘটনা হলো, আমি কিবতী হলেও নীল দরিয়ায় কোন মেয়েকে বলিদানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করাকে কঠিন পাপ বলে বিশ্বাস করি। আমি কিরাসকে 'আসকাফে আজীম (দেশের সর্বপ্রধান পাদ্রী) মানি না। আমাদের 'আসকাফে আজীম' বিন ইয়ামীন। তিনি এসব বলিদানের ঘোর বিরোধী।'

বিন সামির ও ঈনী দু'জনেই খ্রিস্টান। আর বিন সামির তো ফৌজী সদস্য। তাই সে যখন ইচ্ছে তখনই ঈনীকে বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু বিন সামির নৈতিক সিদ্ধান্ত নিলো, ঈনীর মা-বাবার অনুমতি নেবে আগে। এ উদ্দেশ্যে একদিন সে ঈনীর মা-বাবার সঙ্গে আলাপও করলো। ঈনীর মা-বাবা সরাসরি তাকে কিছু বললো না। শুধু বললো, যা বলার আমরা ঈনীকে বলবো। ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ো।

পরদিন ঈনী এক জায়গায় বিন সামিরের সঙ্গে দেখা করলো।

'না বিন সামির!' ঈনী বিন সামিরকে তার বাবার মতামত জানালো, 'না, আমার বাবা রাজি না, আমার মা রাজি। তাদের বক্তব্য হলো, ফৌজের লোকেরা বিশ্বস্ত হয় না। তা ছাড়া রোমী ফৌজ সরকারি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে।'

'তুমি কি ওদেরকে আসল সত্য জানাও নি?' বিন সামির জিজ্ঞেস করলো।

'আমি বলেছি সবই। বলেছি, বিন সামির কিবতী ঈসায়ী। আর বিন ইয়ামিনকে তাদের 'আসকাফে আজীম' বলে মান্য করে। আমার বাবা বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কোন ফৌজ সরকারি ঈসায়ী ছাড়া অন্য কোন ঈসায়িয়াত এর অনুসারী হতে পারে না। তিনি বলেছেন, এখন থেকে তুমি আর বিন সামিরের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে না।'

'তোমার ফায়সালা কি?' বিন সামির থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার আর কি ফায়সালা হবে? আমার মনকে আমি কখনো ধর্ম ও তার ফেরকাবাজির এ দলাদলিতে জড়াইনি। আমি আমার মা-বাবার ফায়সালা বদলাতে চেষ্টা করবো। উনারা যদি তারপরও রাজি না হোন তাহলে সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসবো।'

ঈনী তার মা-বাবাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ঈনীর মা বাবা রাজি হচ্ছিলো না। আর এর মধ্যেই এ ঘটনা ঘটলো।

রোমী অফিসার যখন এ বসতি ঘেরাও করে তখন বিন সামির বসতির আশে-পাশেই ছিলো। দূর থেকে সব দেখছিলো। যখন দেখলো, ঈনীকে হুরশীসের মেয়ে বানিয়ে অফিসারের সামনে দাঁড় করালো তখনও নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর যখন

অফিসারের ঘোষণা শুনলো যে, ঈনীর আসল মা-বাবা না এলে ওকে নদীতে ফেলে দেয়া হবে তখনই সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো তাকে এখন কি করতে হবে।

তারপরের ঘটনা ঘটতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছে। রোমী অফিসার তো রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে হুরশীস ও তার স্ত্রীর দিকে তাকালো। কারো চেহারাতেই কোন ভাবান্তর নেই। তবে ঈনীর বাবা রোমী অফিসারের কাছে দৌড়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো, তার মেয়েকে যে সওয়ার এভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো কে এই পাষণ্ড? আর তার সিপাহীরা কেন ওকে উদ্ধার করতে পারলো না?

অফিসারের সামনে ঈনীর বাবা হওয়ার সরল স্বীকারোক্তি পেশ করলো এবার স্বয়ং ঈনীর বাবা।

অফিসার তো চরম আক্রোশে ফেটে পড়লো। এতক্ষণ কেন তাকে মিথ্যা বলে নাজেহাল করা হলো। এর শাস্তি স্বরূপ পুরো বসতিতে আগুন লাগনোর হুকুম জারি করলো অফিসার। এরপর তো বসতিবাসী হাহাকার করে উঠলো। যেন তাদের গায়ে সত্যিই আগুন লেগে গিয়েছে। অফিসার সবাইকে চুপ করিয়ে বললো, সবাই নয়, কথা বলো যে কোন একজন। এক লোক এগিয়ে এসে বললো,

'হুজুর! এখানে কারো শিক্ষা-দীক্ষা নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। পাদ্রীরা যা বলেন তাই সবাই মেনে নেয়। কোন মা-বাবাই তার যুবতী কুমারী মেয়েকে নদীতে ফেলে দেয়াটাই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় নেতারা বলেন, নীলদরিয়ায় কিছুদিন পর পর কোন নিষ্পাপ কুমারী মেয়েকে ভোগ হিসেবে না দিলে নীল সবাইকে ধ্বংস করে দিবে।'

'দেখো ভাইয়েরা!' অফিসারের সুর নমনীয় হয়ে উঠলো, 'আমিও তোমাদের মতোই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। আর বলতে দ্বিধা নেই, আমি কিবতীও। কিন্তু বলিদানের নামে অযথা একটি মেয়ের মূল্যবান প্রাণ নষ্ট করাকে কঠিন পাপ বলে গণ্য করি আমি। হযরত ঈসা (আ) তো মৃত্যুকে জীবিত করেছিলেন। আর তারই ধর্মে একটি মেয়েকে কোন কারণ ছাড়া হত্যা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? হযরত ঈসা (আ) তো কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান করেছিলেন। প্রেম-ভালবাসার পথ দেখিয়েছিলেন... তোমরা কি জানো না আমাদের খোদা কে? আমাদের খোদা তো তিনি হযরত ঈসা (আ) যার দিকে আমাদেরকে আহ্বান করেছিলেন। এ নদী আমাদের খোদা হবে কি করে? আর এটা তো কোন খোদার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না যে, তিনি এক নিষ্পাপ মেয়ের রক্ত পান করবেন।'

'তা হলে অফিসার আপনিই বলুন, আমারা কি সেই ধর্ম গ্রহণ করবো যা আমাদের বাদশাহ প্রচলন করেছেন?' এক লোক জিজ্ঞেস করে বসলো।

রোমী অফিসার চরম এক ধাক্কা খেলো। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। কারণ, এ ব্যাপারে মুখ খুললেই তার ওপর মৃত্যুর পরোওয়ানা জারি হয়ে যাবে।

তাই কৌশলে এটি এড়িয়ে গিয়ে বললো, কন্যা বলিদান এমন এক অপরাধ যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

রোমী অফিসার হুরশীসকে জিজ্ঞেস করলো, সে কেন মিথ্যা বলেছে। হুরশীস বললো,

'আপনি তো জানেন আমার এই একটাই মেয়ে ছিলো। ওরা বড় পাদ্রীর হুকুমে ওকে নদীতে ফেলে দিলো।... আপনি তো এও জানেন, আমি খুব গোপনে আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যখন দেখছি আপনি বসতি পুড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন তখন আর কি করে মিথ্যা বলি। আমি এ বসতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। তারপরও যদি বসতিবাসী গাদ্দারীর অভিযোগে আমাকে হত্যা করে আমি তা মাথা পেতে নেবো।'

'মন থেকে তুমি এ ভয় দূর করে দাও।' রোমী অফিসার বললো, 'আমি থাকতে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।... তবে একটা ব্যাপারে আমি তোমাদের সকলের প্রশংসা করছি যে, তোমাদের মধ্যে দারুণ ঐক্য রয়েছে। তোমাদের এ ঐক্য যেন অটুট থাকে। এখন আর তোমাদের বসতির কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এরপর যদি আর এ ধরনের বলিদানের ঘটনা ঘটে তাহলে আমি শাহে হেরাকলের চেয়ে কঠোর হয়ে উঠবো।'

'আমরা যে বড় পাদ্রীর হুকুমের গোলাম।' এক লোক অভিযোগের গলায় বললো।

বড় পাদ্রী ও যারা এ বলিদানের নেতৃত্ব দেয় তাদের ঠিকানা জোগাড় করে নিলো রোমী অফিসার। আর হুরশীসের কাছ থেকে সেই মাঝি-মাল্লাদের সরদারের ঠিকানাও সংগ্রহ করলো, যাকে লোকেরা 'বাবা' বলে ডেকে থাকে।

রোমী অফিসার তখনই তার সিপাহীদের নিয়ে পাদ্রীর গ্রামে হানা দিলো। সেখান থেকে পাদ্রী ও তার দুই তিনজন চেলাকে গ্রেফতার করলো। সে রাতেই গ্রেফতার হলো মাঝি-মাল্লাদের সরদারও।

✪ ✪ ✪

পরদিন পাদ্রীসহ অন্য বন্দিদেরকে নিয়ে রোমী অফিসার হুরশীসদের বসতিতে গিয়ে পৌঁছলো। সবার পায়ে শিকল লাগানো। বসতির সবাইকে গতকালের মতো বাইরে বের করে আনা হলো। আর আসামীদেরকে নদীর তীরের উঁচু তটে নিয়ে দাঁড় করানো হলো। তারপর রোমী অফিসার সবাইকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো,

'সবাই এদেরকে ভালো করে দেখে নাও। এরাই কি তারা নয় যারা এর আগে আরো কয়েকটি মেয়েকে নদীতে ফেলে হত্যা করেছে? তারপর হত্যা করেছে হুরশীসের মেয়েকেও ?'

'হ্যাঁ এরাই।' এটা ছিলো হুরশীসের আওয়াজ।

'অবশ্যই এরা।' আরো কয়েকজন বলে উঠলো।

'সবাই বলো।' অফিসার আদেশ দিলো।

'হ্যাঁ, এ বেটারা কুমারী হত্যার মূল নায়ক।' পুরো আবদী বলে উঠলো।

রোমী অফিসার মাথা দ্বারা ইংগিত করলো। কয়েকজন সিপাহী আসামীদের দিকে দৌড়ে গেলো। ওদেরকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিলো। তারপর তীরের শেষ মাথায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। কয়েকজন সিপাহী তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। অফিসার ওদেরকে মাথা হেলিয়ে ইংগিত করলো। ওরা ধনুকে তীর ভরে পর মুহূর্তেই আসামীদের দিকে তীর ছুড়ে মারলো। আসামীদের একজন ছাড়া সবগুলো বুকে তীর নিয়ে নদীতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর এক আসামী নদীতে না পড়ে তীরের ওপর পড়লো। কাছে এক সিপাহী দাঁড়িয়েছিলো। সিপাহী তার কোমরে লাথি মারলো। সে আসামীও নদীতে হারিয়ে গেলো।

ওদিকে বিন সামির ও ঈনী সেখান থেকে বহু দূরের এক মরুপথ পাড়ি দিচ্ছিলো। ঈনী বিন সামিরের পেছনে ঘোড়ায় বসেছিলো।

'আমার তো এখন শুধু আম্মু আব্বুর কথা থেকে থেকে মনে পড়ছে। রোমী ফৌজ তো ওদেরকে মেরে ফেলবে।' বলতে গিয়ে ঈনীর গলা ধরে এলো।

'প্রেম-ভালোবাসার পথে তো কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।' বিন সামির বললো, 'আমারও তো মা-বাবা আছে। তাদের থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তো আছেই। এর পর আমার ওপর ঝুলছে মৃত্যুর পারয়ানা। আমি ধরা পড়লেই জল্লাদের কাছে আমাকে সোপর্দ করা হবে। একে তো ফৌজি শৃঙ্খলা ভেঙেছি। তারপর আবার দুই সিপাহীকে মেরে এসেছি। দু'জনেই হয়তো মারা পড়েছে। একজনের মৃত্যু তো অবধারিত ছিলো। তাই আমি আর পেছনে তাকাতে চাই না। তুমিও তাই করো। সামনের দিকে তাকাও। আমি তোমাকে কিবতীদের সবচেয়ে বড় পাদ্রী আসকাফে আজম বিনিয়ামীনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমাদেরকে নিশ্চয় কোন পথ দেখাবেন।'

বিনিয়ামীনের ঠিকানা জানতো বিন সামির। জনবসতি থেকে বহু দূরে দুর্গম এক মরু জঙ্গলে থাকেন বিনিয়ামীন। হেরাকলের নিয়োগকৃত সবচেয়ে বড় পাদ্রী ও 'আসকাফে আযম' ছিলো কিরাস। কিরাসের কাজ ছিলো সরকারি খ্রিস্টধর্ম যে করেই হোক লোকদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করা। আর বিদ্রোহীদেরকে অমানবিক নির্যাতন করে মেরে

ফেলা বা জীবন্মৃত বানিয়ে ছেড়ে দেয়া। এতে তার মৃত্যুও হয় না। আর বেঁচে থাকাও দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

'আসকাফে আজম' বিনিয়ামীনও ছিলেন কিরাসের অন্যতম শিকার। তাই বিনিয়ামীন এ নিরাপদ আস্তানা গড়ে তুলতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপন এক সংগঠন গড়ে তুলেন।

✪ ✪ ✪

বিন সামির ও ঈনী আরো এক রাত পথে কাটানোর পর বিনিয়ামীনের ঠিকানায় পৌছে গেলো। বিনিয়ামীন বিন সামিরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন,

'কি করে এসেছো বিন সামির? মেয়েটি কে?'

'আমাদের পবিত্র ঈসায়িয়াতের জন্য তো কিছুই করতে পারিনি।' বিন সামির জবাব দিলো, 'তবে আমার নিজের জন্য এবং নিজের ধর্মীয় চেতনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাকে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে হয়েছে।'

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনা শোনালো বিনিয়ামীনকে বিন সামির।

'কোন অন্যায় করোনি।' বিনিয়ামীন ফয়সালা শোনালেন, 'তুমি তোমার প্রেম-ভালোবাসা আর এ মেয়ের জন্য অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করছো। তবে এখন তোমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

'আত্মগোপন করেই থাকবো আমি। তবে বেকার বসে থাকবো না। শাহী ইসায়িয়াতের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু করেই সময় কাটাবো। আমাকে বলুন আমাকে কি করতে হবে।' বললো বিন সামির।

বিনিয়ামীন ধর্মদর্শন নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

'মহামান্য আসকাফ! বিন সামির বললো, 'আপনার সব কথা বোঝার মতো তো এত জ্ঞান নেই আমার। শুধু বলুন, আমাদের সঠিক খ্রিস্টধর্ম লোকদের মধ্যে বিস্তার করতে হলে কাকে হত্যা করতে হবে। অথবা এমন কোন শত্রুর কথা বলুন যার কাছ থেকে আপনি ভয়াবহ বিপদের আশংকা করছেন। আমি গিয়ে ওকে কতল করবো।'

'আমি একটা বিষয় নিয়ে ভাবি। সেটা হলো, হেরাকল খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে যে অপদস্থতামূলক কর্মকাণ্ড করেছেন তিনি তো এর শাস্তিও পেয়েছেন। কিন্তু এ থেকে তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শামের মতো এত বিশাল সাম্রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে

গেছে। তার অর্ধেকেরও অধিক ফৌজ মারা পড়েছে। আর এখন যে ফৌজ তার হাতে আছে তাদের ওপর আরবের মুসলমানদের এমন ভীতি বিস্তার করে আছে যে, কেউ যদি ঠাট্টা করেও বলে মুসলমানেরা মিসরে হামলা করবে তা হলে আমাদের ফৌজের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে উঠবে... ।'

'ধর্ম নিয়ে যেই এ ধরনের হঠকারিতা করেছে এর শাস্তিও সে পেয়েছে।' বিনিয়ামীন বললেন, ইসলামের মতো ঈসায়িয়াতের জন্য খোদা কিতাব নাযিল করেছেন। হেরাকল ক্ষমতার নেশায় পড়ে সেই পবিত্র কিতাবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, মিসরও হেরাকলের হাত থেকে ছুটে যাবে। যে কোন ধর্মকে ফেরকার বিভক্তিতে ধ্বংস করা অমার্জনীয় পাপ।'

'মহামান্য আসকফ! আপনি যে বললেন মিসরও হেরাকলের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তা হলে কি মুসলমানরা মিসর হামলা করবে?'

'এত দিনে তা করার কথা ছিলো। কিন্তু মুসলানদের ওপর দুর্ভিক্ষের এমন আযাব নাযিল হয়েছে যে, পুরো আরব না খেয়ে মরছে। সেখানকার খবর আমার কাছে প্রতিদিনই আসছে। দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তো ফৌজি অভিযানের চিন্তাও করতে পারবে না মুসলমানরা।'

'আসকাফে আযম! আমার একটা ঘটনা মনে আছে। মুসলমানরা যদি কখনো মিসরে হামলা করে তা হলে তো আমাদেরকে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু আমি ভাবছি, মুসলমানরা হেরাকলকে যেমন তাদের চরম শত্রু মনে করে আমরাও তাই মনে করি। তা হলে কি আমাদেরকে হেরাকলের প্রতি আবার আনুগত্যের হাত বাড়াতে হবে?'

'এটা নিয়ে আমিও দু'একবার ভেবেছি। শাম থেকে তিন জন্য মুসলমান গোয়েন্দা আমার কাছে এসেছিলো। ওরা নিজেদেরকে ঈসায়ি বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমি ওদের আসল পরিচয় ধরে ফেলি এবং তাদেরকে বলেও দিই। ওরা বলছিলো, মুসলমানরা মিসরে সেনা অভিযান পাঠালে হেরাকল দ্বারা যেসব ঈসায়ি গোত্র নির্যাতিত হয়েছে বা হচ্ছে তারা যেন হামলার আগে-পরে বা মাঝখানে বিদ্রোহ করে বসে। ওদের খলীফা ও সালারদের উদ্দেশ্যও এরকম। প্রথমে হেরাকলকে মিসর থেকে বের করে দেয়া হবে। তারা মুসলমান ও ইসায়িরা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু একটা করে নেবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর আপাতত এটাই যে, মুসলমানদের সঙ্গে রোমীদের যুদ্ধের সময় কিবতী ইসায়িরা দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে। তবে মনে রেখো, এটা আমার শেষ ফয়সালা নয়। তবে এ ফায়সালা অটুট থাকবে যে, কিবতী ঈসায়ি কখনো হেরাকলের অনুগত হবে না।'

✪ ✪ ✪

সালার আমর ইবনে আস (রা) তো উয়েস ও রাবেয়া ওরফে রোজিনার বিয়ে করিয়ে দিলেন। এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা।

আমর ইবনে আস (রা) তখন আমীরুল মুমিমীন হযরত উমর (রা) এর কাছে যেতে চাচ্ছিলেন। মিসর অভিযানের অনুমতি নেয়ার জন্য তিনি আকুল ছিলেন। কিন্তু তার রওয়ানার আগেই মদীনা থেকে চরম দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সংবাদ এসে পৌছলো।

তারপর তো আর কারো হুশই ছিলো না। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের জন্য রুটি জোগাড় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিলো না কেউ। দুর্ভিক্ষের এ ধ্বংসযজ্ঞ চলে একাধারে নয় মাস। আমর ইবনে আস (রা) এর মাথা থেকে তো মিসর অভিযানের কথাই উড়ে যায়।

দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে আরব। কিন্তু শাম ইরাকসহ ইসলামী বিশ্বের অন্য দেশগুলো কি এর সুদূরপ্রসারী ছোবল থেকে বাঁচতে পেরেছিলো? সেসব এলাকা থেকে অবিরত খাদ্যশস্য পাঠাতে হয়েছে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে। অবশেষে সবার কাছে এ স্বস্তির সংবাদ পৌছে যায় যে, দুর্ভিক্ষের কালো রাত শেষ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রহমতের অমীয় ধারায় সিক্ত করেছেন আরব জাহান।

এত দিন পর আবার আমর ইবনে আস (রা)-এর মাথায় এলো মিসর অভিযানের কথা।

উয়েস রাবেয়াকে নিয়ে এখনও বায়তুল মুকাদ্দাসেই অবস্থান করছে। তার সঙ্গী দুই গোয়েন্দাও তার সঙ্গে আছে। এরা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে। এত দিনে ওদের নিজ নিজ সেনা ব্যাটালিয়নে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আরবের দুর্ভিক্ষ প্রশাসনিক সব ধরনের ব্যবস্থাপনা স্থবির করে দিয়ে ছিলো। এ তিন গোয়েন্দাকে তাই বায়তুল মুকাদ্দাসেই থেকে যেতে হয়।

দুর্ভিক্ষের পর সার্বিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে এলো। সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) আমর ইবনে আস (রা)-কে পয়গাম পাঠালেন, এ তিন গোয়েন্দা মুজাহিদকে তাদের স্ব স্ব স্থলে পাঠিয়ে দিন।

উয়েস এসেছিলো হলব থেকে। আর উয়েসের বাড়িও হলব। একদিন সে হলবে ফেরার হুকুম পেলো। ওদিকে রোজিনা অর্থাৎ রাবেয়াও বেশ কয়েক দিন উয়েসকে বলেছে, ওকে হলবে ওর মা-বাবার কাছে নিয়ে যেতে।

উয়েস ওকে বলেছে, নিজের মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এত ব্যাকুলতা দেখানো ঠিক হবে না। কারণ, ওকে দেখে তারা এখন খুব খুশি হবে না। বিশেষ করে মুসলমান হওয়াটাকে তো কেউ মন থেকে মেনে নিবে না।

উয়েসও তো অনেকটা নও মুসলিম। ওর মুসলমান হওয়ার খবর পেয়ে ওর ভাই-বাপ সব চরম শত্রু হয়ে যায়। তাই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে উয়েস এখন বেশ অভিজ্ঞ। সেসব দিনের কথা উয়েস রাবেয়াকে স্মরণ করালো। তবুও রাবেয়া একবারের জন্য হলেও মা-বাবাকে দেখতে চায়। সে প্রায়ই বলতো,

'আমার আম্মু-আব্বুর সঙ্গে তো অবশ্যই দেখা করবো। আমার ইচ্ছে হলো উনাদেরকে ইসলামের প্রতি আকর্ষিত করা।'

উয়েসের হলবের সেনা ছাউনিতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি ছিলো না। নিজের এলাকা ও জন্মস্থানের কথা সে মন থেকে অনেক আগেই বের করে দিয়েছে। কিন্তু রাবেয়া এমন এক পরিস্থিতি দাঁড় করালো যে, হলবে যাওয়ার ব্যাপারে এক প্রকার সে বাধ্য হলো।

রাবেয়া তো দারুণ খুশি ছিলো, বহুদিন পর সে তার মা-বাবা ও আপন-জনদের দেখতে যাচ্ছে।

হলব পৌঁছে উয়েস রাবেয়াকে তার ঠিকানায় নিয়ে গেলো। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে উয়েসকে ছোট একটি বাসা দেয়া হয়েছে। সেটাই এখন তার ঠিকানা। নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের তেমন আগ্রহ নেই উয়েসের। এমনকি রাবেয়ার মা-বাবার সঙ্গেও তার সাক্ষাতের ইচ্ছে নেই।

কিন্তু রাবেয়ার জিদ ওকে রাবেয়ার মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বাধ্য করলো। তবে একটা শর্ত জুড়ে দিলো। উয়েস রাবেয়াদের বাড়ির ভেতর ঢুকবে না। তবে ওর মা-বাবা যদি চায় তবে সে ভেতরে প্রবেশ করবে।

তাই হলো। উয়েসকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাবেয়া ভেতরে গেলো বাচ্চাদের মতো আনন্দ করতে করতে। ঘরের যে কেউ ওকে দেখলো হয়রান তো হলো পরে, এর আগে হলো আতঙ্কিত। ওদের ভয় হলো, এতো রোজি নয়, রোজির প্রেতাত্মা।

ওরা তো নিশ্চিত ছিলো রোজি মারা গেছে সেই কবে। উন্মাদিনী হয়ে প্রায় সোয়া বছর আগে সে এ শহর থেকে নিখোঁজ হয়েছিলো। ও' ফিরে আসবে এ ধরনের প্রত্যাশা ছিলো না কারো।

'কি হলো তোমাদের?' রাবেয়া ওর হতভম্ব মা-বাবা ও অন্যদের বললো, 'তোমরা কি ভেবেছো আমি মরে গেছি। আমি আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি প্রাণবন্ত।'

'সত্যিই তুমি বেঁচে আছো রোজি! এসো গো আমার মা।'

'না মা! আমি রোজি নই। রোজি মরে গেছে। তার নাম হয়েছে রাবেয়া। রোজি এখন মুসলমান হয়ে গেছে মা! আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি ভেতরে নিয়ে আসছি।'

রোজির মায়ের তার মেয়েকে আলিঙ্গনে উদ্যত প্রসারিত হাত দুটো ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো। রোজি ইসলাম গ্রহণ করে যে রাবেয়া হয়েছে এ সংবাদ যেন তার মাকে অসাড় করে দিলো। কিন্তু মার এ প্রতিক্রিয়া রাবেয়ার চোখেই পড়লো না। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ-আবেগে রাবেয়া এখন অন্ধ হয়ে গেছে। তার মা ও অন্যদের প্রত্যাখ্যানের মনোভাব সে বুঝতে পারলো না। সে দৌড়ে বাইরে চলে গেলো এবং উয়েসকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলো।

উয়েসের নিশ্চিত ধারণা হলো, রাবেয়ার মা-বাবা ওকে খুশি মনেই ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছে। উয়েস ভেতরে গিয়েই রাবেয়ার বাবার সামনে পড়লো। উয়েস তো এ এলাকারই ছেলে। রাবেয়ার সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। সে হিসেবে তার মা-বাবার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। আর এখন তো সে এ' বাড়ির জামাই। উয়েস তাই সসম্ভ্রমে মুসাফাহা-করমর্দনের জন্য রাবেয়ার বাবার দিকে হাত বাড়ালো।

রাবেয়ার বাবা তার হাত পিছিয়ে নিলো। ওর মা ও বড় ভাই ওর দিকে তাকালো আগুন আর ঘৃণা ভরা চোখে।

'দেখেছো রাবেয়া!' উয়েস তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, 'আমি যা বলেছিলাম তাই কি হচ্ছে না? ওদেরকে বলো, আমি তোমাকে কোথায় পেয়েছি এবং কি করে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। ওদের মধ্যে এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞানও নেই যে, নিজের মেয়ে-জামাইকে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিবে।'

'তোমাকে তো আর আমরা জামাই বানাইনি।' রাবেয়ার বাপ বললো, 'প্রথমে নিজে পথভ্রষ্ট হয়েছো তারপর আমার মেয়েকে পথভ্রষ্ট করেছো। এ ঘরে তোমার ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার নেই।'

রাবেয়ার মুখ রাগে-ক্ষোভে ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। রাবেয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওর মা-বাবাকে কোনক্রমে বললো, ঠিক আছে, আমরা চলে যাবো, তবে এর আগে আমার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার কাহিনীটুকু অন্তত তোমরা শুনে নাও।

সবাই এবার কিছুটা শান্ত হয়ে বসে পড়লো। রাবেয়া তার উন্মাদিনী অবস্থা থেকে কি করে উদ্ধার পেলো, তারপর তাকে নিয়ে কি কি ঘটলো, তাকে নীল দরিয়ার বলিদান-কন্যা

কে বানালো এবং কি করে বানানো হলো এবং তিন ফেরেশতার মতো উয়েস ও তার দুই সঙ্গী তাকে কিভাবে বাঁচালো সব শোনালো ওদেরকে রাবেয়া।

শেষে এটাও বললো, সে তখন এতই অপারগ ও অসহায় ছিলো যে, উয়েস ও তার দুই সঙ্গী ওকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতো। সে টু শব্দটিও করতে পারতো না। কিন্তু তারা ছিলো সাক্ষাৎ ফেরেশতার প্রতিরূপ।

'আমি ওদের আচার-ব্যবহারে এতই প্রীত-মুগ্ধ হয়েছি যে, মুসলমান না হয়ে পারলাম না।' রাবেয়া বললো ওর মাকে উদ্দেশ্য করে, 'তোমার তো মা মনে থাকার কথা। উয়েস যখন রাবন ছিলো তখন ওর সঙ্গে আমার কত গভীর সম্পর্ক ছিলো। অথচ সে মুসলমান হওয়ার পর ওর সঙ্গে আমিও অন্যদের মতো সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি। কিন্তু এরপর যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ দেন আমাকে তখন আমি হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করতে পারি, মুসলমানদের আদর্শ ও চরিত্র-মাধুরীর তুলনা আর কোন জাতির সঙ্গে চলে না।...'

'মিসরে গিয়ে দেখো, শাহে হেরাকল কিভাবে খ্রিস্টানদের রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। সেখানে তো প্রতিদিন এ নিয়েও রক্ত ঝরে যে, সঠিক খ্রিস্টধর্ম কোনটি? সরকারি 'ঈসায়িয়াত' না জনসাধারণের পালিত 'ঈসায়িয়াত?' আরে আমি তো এসেছিলাম মহৎ এক উদ্দেশ্যে। চেয়েছিলাম, নিজের মা-বাবা-ভাইক দেখে তৃষ্ণার্ত দুটি চোখকে শান্ত করবো আর সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে।'

'আরে কোন ইসলাম আর মুসলমানের কথা বলছো?' রাবেয়ার বাপ বললো তীর্যক সুরে, 'সে তো ছিলো অন্য আরেক মুসলমান। যাদের চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করতো। এখন সেই মুসলমান কোথায়? ইসলাম মদকে তেমনি হারাম করেছে যেমন হারাম করেছে শুকরকে। আমি তো জানি, মুসলমানরা মদের গন্ধ পেলেও পালায়। অথচ এখানে কত মুসলমান আছে, নিয়মিত মদ পান করে এবং মদ পানকে বৈধও মনে করে।'

'না, এটা আমি মানতে পারলাম না।' উয়েস বললো, 'আপনি এতটুকু বলতে পারেন আমি ও আপনার মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আপনার চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়েছি। কোন মুসলমানের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবেন না।'

'এটা অপবাদ নয়। আমি তোমাকে এমন মুসলমান দেখাতে পারবো।' রাবেয়ার বাবা বললো।

'কেউ যদি তা করে থাকে তা হলে সেটা হবে তার ব্যক্তিগত অপরাধ। মুসলমানদের মধ্যে অপরাধী থাকতেই পারে। এজন্য ঢালাওভাবে সমস্ত মুসলমানকে আপনি দোষারূপ করতে পারেন না। ইসলাম কাউকে মদের অনুমতি দেয়নি। আর যেই তা পান করবে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে।' উয়েস বললো দৃঢ় গলায়।

'কিছু দিন যাওয়ার পর তুমি নিজেও এটা দেখতে পাবে।' রাবেয়ার বাপ বললো, 'এসব মদ্যপায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ কোন ব্যবস্থাও তো নিচ্ছে না। ওদেরকে দেখে অন্যান্য মুসলমান মদ পানের সাহাস পাচ্ছে। মদের নেশা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখনই সে পাপের পথে যেতে কুণ্ঠাবোধ করে না। টের পায় না বিবেকের দংশন। যদি এভাবে মুসলিম জাতির মধ্যে মদের প্রচলন ঘটে তা হলে তাদের সেই আদর্শও লোপ পেয়ে যাবে যা দেখে বিধর্মীরা মুসলমান হয়ে যেতো।'

উয়েসের মতো রাবেয়াও বেশ বিরক্ত হচ্ছিলো যে, ওর বাবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অযথাই প্রলাপ বকছে। রাবেয়া তো জানে, ওর বাবা কট্টর খ্রিস্টান। নিজের ধর্মের ব্যাপারে প্রায় অন্ধ-উন্মাদ। তাই রাবেয়া তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো। বললো,

'আমরা চলে যাচ্ছি। তবে মাঝে মধ্যে কি তোমাদের দেখতে আসতে পারবো আমরা?'

'না। ওর বাবার গলা রূঢ় হয়ে উঠলো, 'তোমাদের দু'জনের জন্য আমার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে তোমরা যদি আবার ঈসায়িয়াতে ফিরে আসো তা হলে তোমাদের জন্য আমার মন এবং আত্মার দরজাও খুলে দেবো।'

'এখন আর আমরা কোন ভুল দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারি না।' উয়েস বললো এবং দাঁড়িয়ে গেলো, রাবেয়াকে উঠিয়ে বললো, 'চলো রাবেয়া! নিজের অপমান আর অসম্মান আমি মেনে নিতে পারবো। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সামান্য কটু কথাও আমি সহ্য করতে পারবো না। আর উনারা ইসলাম গ্রহণ না করলে ইসলামের কোন ক্ষতি সাধন হবে না। ক্ষতি হবে উনাদেরই। যাক, এখানকার কয়েকজন ইসলাম গ্রহণে ভীষণ আগ্রহী। তাদেরকে মুসলমান বানাতে হবে।'

'সম্ভবতঃ তুমি এমন কিছু করতে পারবে না।' রাবেয়ার বড় ভাই এতক্ষণ চুপ ছিলো। সে এবার বলে উঠলো, 'রোজি! ওকে ইসলাম প্রচারের কাজ থেকে বিরত রাখো। না হয়...'

'আমি রোজি নই, আমি রাবেয়া ভাইয়া! রাবেয়া ওর ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'উয়েস তার ধর্মের জন্য যা ভালো মনে করবে তা করা থেকে আমি কেন ওকে বাঁধা দিতে যাবো?'

ওরা দু'জন সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। উয়েস লক্ষ্য করলো না, ওরা যখন বের হয়ে আসছে রাবেয়ার বড় ভাই তখন উয়েসের দিকে তাকিয়েছিলো গনগণে আগুন চোখে।

✪ ✪ ✪

রাবেয়ার অনুতাপের শেষ ছিলো না। কেন সে নিজের পিত্রালয়ে উয়েসকে নিয়ে গিয়ে এভাবে অপদস্থ করালো!

'না, না, আর কখনো তোমাকে এখানে আনবো না উয়েস!' রাবেয়ার কণ্ঠ থেকে চরম মনস্তাপ ঝরে পড়লো।' আমি কখনো ভাবিনি, আমার মা-বাবা আমাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন! তবে একটা কথার গুরুত্ব দিয়ো উয়েস! আমার বাবা ধর্মান্ধ হলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। কিন্তু আমার ভাই অতি দুষ্টচক্রের লোক। 'ওর ব্যাপারে সাবধান থেকো।'

'সে আমার কি ক্ষতি করতে পারবে?' উয়েস তাচ্ছিল্য করে বললো, ওর সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। না, কখনো সম্পর্ক করবো ওর সঙ্গে।'

রাবেয়া শুধু এতটুকুই জানে, ওর ভাই ভালো লোক নয়। খারাপ লোক। কিন্তু কতটুকু যে খারাপ সে ধারণা তো রাবেয়ারও হওয়ার কথা নয়। রাবেয়ার এই ভাইটি মুসলমানদের এতই ঘৃণা করে যে, তাদের নাম শুনলেই তার নাক-মুখ কুচকে উঠে। সে রোমী ফৌজের অনিয়মিত সৈনিক ছিলো। দু' একবার রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে। কিন্তু সে দ্রুতই বুঝতে পারে, লড়াইয়ে মুসলমানদের পরাজিত করা সোজা কাজ নয়। তাই সে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসে।

তারপর সে শুরু করে মুসলানদের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা। তিন চারজন ষণ্ডামার্কা সঙ্গীও জুটিয়ে নেয় সে। কিন্তু এখনো উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি সে মুসলমানদের। এজন্যও তার আক্ষেপের শেষ নেই।

মুসলমানদের ব্যাপারে তার এ বিদ্বেষ কেবল নিজের ধর্মান্ধতার কারণেই ছিলো না। বরং অন্তর্নিহিত অন্য আরেকটা কারণও ছিলো। বেশ কয়েক বছর আগে সে যখন সদ্য যুবক। তখন এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমঘটিত সম্পর্ক ছিলো। ওর সঙ্গেই ওর বিয়ের কথা ছিলো। কিন্তু যেভাবে রাবেয়া ও শারীনা, হাদীদ ও উয়েসের প্রতি মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেছে তেমনি সে মেয়েও এক আরব মুজাহিদের প্রতি মুগ্ধ হয়ে রাবেয়ার বড় ভাইকে পায়ে ঠেলে মুসলমান হয়ে যায় এবং সে মুজাহিদের জীবন সঙ্গিনী বনে যায়।

তখন থেকেই রাবেয়ার বড় ভাই মুসলমানদের চরম শত্রু হয়ে উঠে। আর এখন যখন দেখলো তার বোনও তার প্রেমিকার মতো আরেক নওমুসলিমের হাত ধরে চলে গেছে। তখন তার পুরোনো ক্ষত আবার তাজা হয়ে উঠলো।

সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে। এদের সবাই অত্যন্ত জঙ্গী ও হিংস্র মনোভাব পোষণ করে থাকে। এরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলো, যেভাবেই হোক, উয়েসের ইসলামের তাবলিগী কাজ বন্ধ করতে হবে।

'কিন্তু আমরা ওকে রুখবো কিভাবে ?' এক পাণ্ডা বললো।

'কতল।' রাবেয়ার ভাই ফয়সালা শোনালো, 'আমরা আজ পর্যন্ত এমন কিছু করিনি যা দিয়ে ইসলামের কোন ক্ষতি করা যায়। আমরা শুধু বড় বড় কথা বলেই সময় পার করছি। কাজের কাজ কিছুই করছি না।'

কিভাবে কি করবে ওরা সলাপরামর্শ করে নিলো।

তারপর চার পাঁচ দিন কেটে গেলো। উয়েসকে ওরা ফাঁদে জড়াতে পারলো না। এ কয় দিন উয়েস বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলো।

একদিন এক লোক এসে উয়েসকে পেলো তার বাসার বাইরে। উয়েস কোথাও যাচ্ছিলো। লোকটি জানালো, দু' তিনজন খ্রিস্টান মুসলমান হতে চায়। ওরা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছে। উয়েস সেখানে গেলে ওদের বড় উপকার হয়। উয়েস আর কোন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন মনে করলো না। লোকটি নিজেও মুসলমান হবে বলে জানালো। তার হাতে কয়েকজন মুসলমান হবে এটা ভেবে সে বেশ উৎফুল্ল ছিলো।

সন্ধ্যার পর লোকটি উয়েসকে নিয়ে সেদিকে চললো যেখানে ওকে কতল করা হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। ঠিক করা আছে হত্যা করার পর লাশ গুম করে ফেলা হবে। লোকটি উয়েসকে জানালো, তার লোকজন শহরের বাইরে এক জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এ লোকের কাজ হলো, উয়েসকে হত্যাস্থলে নিয়ে যাওয়া। আর রাবেয়ার ভাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সেখানে অপেক্ষা করবে। সেখানে পৌছার পর উয়েসকে কোন ধরনের সুযোগ না দিয়ে শেষ করে দেয়া হবে।

উয়েস ঘাতক দলের এ লোকের সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে পৌছে গেলো। কিন্তু সেখানে কেউ ছিলো না। লোকটি উয়েসকে বললো, ওরা এখনই এসে পড়বে। দু'জনে তাদের আসার অপেক্ষায় বসে রইলো। সময়ও বয়ে চললো। লোকটি বেশ পেরেশান হয়ে গেলো। এখনো কেন পুরো ঘাতক দল আসছে না এ প্রশ্নের উত্তর সেও জানে না।

অবশেষে উয়েস বললো, সে আর এখানে থাকতে পারবে না। তার জরুরী কাজ আছে। এরা যদি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চায় তা হলে যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে তার চেয়ে আরো সুশিক্ষিত কোন মুসলমানের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

উয়েসের মতো এমন সুঠাম ও তাগড়া দেহের কারো বিরুদ্ধে ঘাতক দলের এ লোক তো একা কিছু করতে পারবে না। তাই সে কথায় কথায় আরো কিছুক্ষণ দেরি করিয়ে

দিতে চাইলো। কিন্তু সময় এত বেশি নষ্ট হয়েছে অযথা যে, সে লোক নিজেও বুঝলো এখন আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।

উয়েস অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো। বাসার দোরগোড়ায় এসে দেখলো। রাবেয়া উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার বড় ভাই অত্যন্ত অসুস্থ,' রাবেয়ার গলার পেরেশানী উয়েস টের পেলো, 'একটু আগে আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির এক মহিলা এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেলো। আমি সেই কখন থেকে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। ঐ মহিলা বললো, 'তোমার ভাই দু' তিন দিন থেকে এমন এক রোগে আক্রান্ত যে, বড় বড় ডাক্তাররাও সে রোগের নাম বলতে পারছে না। আজকের রাতটা টিকে কিনা সন্দেহ... বুঝতে পারছি না, আমি কি ভাইকে শেষবারে মতো দেখতে যাবো কি না!'

'যেতে চাইলে আমি তোমাকে বাঁধা দেবো না। আর আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলেও আমি আপত্তি করবো না।' উয়েস বললো।

নিজের বাপের বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট বাঁধা হতে পারলো না মুমূর্ষু ভাইকে দেখার আবেগ। উয়েসকে নিয়ে রাবেয়া ওদের বাড়িতে ঢুকলো। কেউ বাঁধা দিলো না। তার ভাইয়ের তখন ওষ্ঠাগত প্রাণ। হয়তো এ কারণেই কারো অন্য দিকে তাকানোর ফুরসত ছিলো না।

রাবেয়ার ভাবী ও তার মা বাবা কিছু করতে পারছে না বলে অসহায়ভাবে চোখের পানি ফেলছিলো। তার ভাই প্রথমে রাবেয়াকে তারপর উয়েসের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেললো। পর মুহূর্তেই চোখ দুটো খুলে গেলো। একটি হেচকি তুললো এবং তার মাথাটি এক দিকে ঢলে পড়লো। সবাই বুঝলো রাবেয়ার ভাই মারা গেছে। রাবেয়ার দু' চোখ ভরে অশ্রু গড়াতে লাগলো। এ অবস্থায়ও ওর মা-বাবা এমন ভাব করলো যেন রাবেয়াকে দেখেইনি।

উয়েস রাবেয়াকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলো। সে জানতেও পারলো না, তার এ ভাই তার স্বামীকে হত্যার জন্য কি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করেছিলো।

পরদিন খবর এলো রাবেয়ার ভাইয়ের এক বন্ধুও সে রোগে আক্রান্ত। সেও উয়েসকে হত্যার পরিকল্পনায় ছিলো। এর পরদিনই সে মারা গেলো। সেদিন সন্ধ্যায় রাবেয়ার ভাইয়ের আরেক বন্ধু একই রোগে মারা গেলো। সেই উয়েসকে মিথ্যা কথা বলে হত্যার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে গিয়েছিলো।

✪ ✪ ✪

এ অজ্ঞাত রোগ ঐ তিনজনের জন্যই আসেনি। হলবের সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বাড়ি বাড়ি থেকে লাশের খাট বের হতে লাগলো। যেই এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছিলো খুব দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলো। ডাক্তার-বদ্যিরা এর নাম দিলো প্লেগ। যার কোন চিকিৎসা নেই।

তারপরও ডাক্তার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাদের সাধ্যের শেষটুকু দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে গেলো। কিন্তু বাতাসের মতো এ রোগ সারা শামে ছড়িয়ে পড়লো।

জানা যায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ফিলিস্তিনের আমওয়াস নামক এলাকা থেকে। তখন তো আর লোকদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ সচেতনতা ছিলো না। না ছিলো পারিপার্শ্বিক সাবধানতা অবলম্বনের গুরুত্ব। এভাবেই এ রোগ শামের প্রতিটি ঘরের দরজায় এসে মৃত্যুর পরোওয়ানা শুনিয়ে গেল।

✪ ✪ ✪

এখনো দুর্ভিক্ষের কালো আচড় সবখান থেকে মুছে যায়নি। ইসলামী প্রশাসনও সেই ধকল সামলে উঠতে এক প্রকার সংগ্রাম করছিলো। এর মধ্যে আবার সেই প্লেগ-মহামারি। পুরো ইসলামী খেলাফতের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হলো। শুধু সাধারণ নাগরিকরাই এ মহামারিতে আক্রান্ত হলো না; মুজাহিদদের সেনাদলেও এ মহামারির ছোবল লাগলো।

মুসলমানদের এ মহামারিতে আক্রান্তের খবর শুনে বাদশাহ হেরাকল খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তার সভাসদদের ডেকে বললেন, মুসলমানদের পরাজিত করার এখনই মোক্ষম সুযোগ। তার সভাসদগণও জোর সমর্থন জানালো। এ খবর পেয়ে হেরাকলের নিয়োগকৃত আসকাফে আজম কিরাস হেরাকলের কাছে ছুটে এলেন।

'শাহেনশাহে রোম!' কিরাস হেরাকলকে বললেন, 'জানতে পারলাম আপনি নাকি শামে আক্রমণ করার ইচ্ছা করছেন? আর আপনার সভাসদরাও খুব সমর্থন যুগিয়েছে যে, এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না!'

'হ্যা, আসকাফে আজম!' হেরাকল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'শুধু শামই নয়, পুরো আরবকে আমার পদতলে এনে ফেলবো। ওরা তো এখনো দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের ধকলই সামলে উঠতে পারেনি। এর ওপর এখন ওদেরকে চেপে ধরেছে ভয়াবহ মহামারী। কোন বোকাও এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না।'

'শাহেনশাহে রোম! আপনার ক্ষতির উপলব্ধি যদি আমার না হতো তা হলে আমিও আপনাকে সমর্থন করতাম। কিন্তু আপনি আমার মালিক আমার বাদশাহ। আমার প্রতি অনুগ্রহকামী। আর সালতানাতে রোমের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই যে পথে ধ্বংস আছে সে পথে যেতে আপনাকে আমি অবশ্যই বাঁধা দেবো...।

'এ সত্যটা ভুলে যাবেন না। আমাদের অর্ধেক ফৌজ মারা পড়েছে আরবদের হাতে। আর যে ফৌজ বেঁচে-বর্তে মিসরে এসেছে তাদেরকে এখনো আরবদের মুসলমান-ভীতি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আপনার এ বেঁচে যাওয়া ফৌজকেও যদি শেষ পর্যন্ত মহামারির কবলে ফেলে মারতে চান তা হলে শাম-এ হামলা করুন। আপনি কি এ কথাটাও বুঝতে পারছেন না যে, এ মহামারি মুসলমানদেরকেও আক্রমণ করেছে এবং আপনার ফৌজকেও ছেড়ে দিবে না? গতকাল পর্যন্ত আমার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে এতে জানাযায়, মুসলমানদের কয়েকজন সালারও এ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।'

✪ ✪ ✪

মহামারির সংবাদ পাওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) তার শাম সফরের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখনই তার কাছে এ ভয়াবহ মহামারির সংবাদ পৌছে। কিন্তু হযরত উমর এতে খুব বিচলিত হলেন না। নিজের যাওয়াটাই সবদিক থেকে উচিত বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। সরেজমিনে সেখানকার অবস্থা দেখে এ মহামারি থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা করা যাবে তা হলে। তাই তিনি তার সফরের কাফেলাকে রওয়ানার হুকুম দিলেন।

দীর্ঘ সফরের পর আমীরুল মুমিনীনের কাফেলা শামের সীমান্ত তাবুকে পৌছলো। শামের বিভিন্ন এলাকার সালাররা আমীরুল মুমিনীনের শাম ভ্রমণের ব্যাপারে আপত্তি করলেন। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা), সালার ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) ও শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রা) তাবুক গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারা হযরত উমর (রা) কে অনুরোধ করলেন। তিনি যেন এখানেই সফর মুলতবি করেন। কারণ, শামের ধূলো-বালিতেও এখন মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি পদে পদে এখানে মৃত্যুর পাঞ্জা বিস্তার করে আছে।

'এখানে থেকে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' উমর (রা) বললেন, 'এখান থেকে মদীনায় ফিরে গেলে সেসব আত্মার সামনে দাঁড়াতে আমি লজ্জাবোধ করবো যারা এ রোগের কারণে আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। আমি আমার কওমকে এমন ভয়ংকর অবস্থায় রেখে কি করে ফিরে যাবো?'

সালাররা অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এ ভয়াবহ অবস্থায় যদি আমীরুল মুমিনীনের কিছু হয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ করা আর সম্ভব হবে না। উমর (রা) উপস্থিত বর্ষীয়ান সাহাবাগণের পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলো।

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন'! কেউ কেউ এ ধরনের পরামর্শ দিলেন, 'যেহেতু তিনি জাতির কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যেতে চাচ্ছেন তাই কারো এ চিন্তায় পেরেশান হওয়া উচিত হবে না যে, সেখানে গেলে তিনি বিপদগ্রস্ত হবেন।'

'না আমীরুল মুমিনীন! এবার কেউ কেউ এ মতামতও পেশ করলেন, 'যেখানে ধ্বংস আর মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে কমপক্ষে আমাদের খলীফার যাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা বোধ-বুদ্ধি এজন্যই দান করেছেন যাতে সব কাজ সঠিক চিন্তা-ভাবনা করে করা যায়।'

অবশেষে উমর (রা) কুরাইশী সাহাবায়ে কেরাম যারা মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক অভিযানেও শরীক হয়েছিলেন তাদের পরামর্শ তলব করলেন। এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)ও ছিলেন। তিনিসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা করলেন, আমীরুল মুমিনীনের পুরো কাফেলা নিয়ে তাবুক থেকে এক কদম আগে নয় বরং মদীনায় ফিরে যাওয়া উচিত। উমর (রা) তখনই হুকুম দিলেন, আগামীকাল কাফেলা মদীনায় রওয়ানা হবে।

সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা)ও চাচ্ছিলেন, উমর (রা) যেন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে না যান। শামে যান। কিন্তু হযরত উমর (রা) মদীনায় ফিরে যাওয়ার ফয়সালা করলেন। তিনি কেমন এক দ্বিধা মিশ্রিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন,

'ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করছেন!'

হযরত উমর (রা) এর চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ আবু উবাইদা (রা) এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ইবনুল জাররাহ!' উমর (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি জবাব দিলেন, 'হায় একথা যদি অন্য কেউ বলতো... হ্যাঁ, আমি আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করছি। তবে পলায়ন করছি এক ফয়সালা থেকে আরেক ফয়সালার দিকে।'

আবু উবাইদা (রা) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তখনই সেখানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) উপস্থিত হলেন। তিনি শীর্ষ সাহাবাগণের অন্যতম। তিনি বিষয়টা আঁচ করতে পেরে চূড়ান্ত ফয়সালা শোনালেন।

তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা শুনে রাখো, কোন এলাকায় কোন রোগ-ব্যধি মহামারির আকার ধারণ করলে সে এলাকায় তোমারা যেয়ো না। আর যদি আক্রান্ত এলাকায় থেকে থাকো তা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেয়ো না। কারণ, তুমি এ ব্যধি নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং অন্য কোথাও গিয়ে ছড়াবে।'

হযরত উমর (রা) এর অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো। তিনি বেশ প্রশান্ত মনে মদীনায় ফিরে গেলেন।

কিন্তু মদীনায় ফেরার পর হযরত উমর (রা) এর অস্থিরতা আবার বেড়ে গেলো। তার সার্বক্ষণিক ভাবনা এটাই হয়ে উঠলো, শামবাসীকে মহামারি থেকে কি করে বাঁচানো যায়। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন আবু উবাইদা (রা) কে নিয়ে। তাবুক থেকে ফিরে আসার সময় উমর (রা) আবু উবাইদাকেও তার সঙ্গে মদীনায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি জবাব দেন, মৃত্যুর মুখে তার সঙ্গীদের রেখে তিনি কোথাও যাবেন না। 'আল্লাহর ফয়সালা থেকে আমি পালাবো না কোথাও।' এ ছিলো তার শেষ কথা।

তারপর উমর (রা) মদীনা থেকে এক পয়গাম দিয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন এক কাসেদকে পাঠালেন আবু উবাইদা (রা) এর কাছে। পয়গামে লেখা ছিলো, জরুরী একটা বিষয়ে মৌখিক আলোচনা প্রয়োজন। পয়গাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাসেদের সঙ্গে চলে আসুন।

আবু উবাইদা (রা) কাসেদের সঙ্গে এলেন না। সে পয়গামের জবাব পাঠিয়ে দিলেন, যে বিষয়ে আপনি সলাপরামর্শ করতে চাচ্ছেন সেটা স্থগিত হতে পারে। কিন্তু আমি যে লশকরের সিপাহসালার সে লশকরকে এত বড় বিপদে রেখে আমি কোথাও যেতে পারি না। আমি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করছি।

হযরত উমর (রা) এ পয়গাম পড়ে এতই আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়লেন যে, তিনি কেঁদে ফেললেন। উপস্থিত সভামগুলির কেউ একজন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা (রা) কি চলে গেলেন?'...

উমর (রা) বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'না... তবে তিনি হয়তো আর থাকবেন না... উমর (রা) আর বলতে পারলেন না। তার গলা বুজে এলো।

তারপরও হযরত উমর (রা) আবু উবাইদা (রা) এর নামে আরেকটি পয়গাম পাঠালেন যে, আবু উবাইদা (রা) যেন নিচু এলাকা ছেড়ে তার সেনাবাহিনী নিয়ে পাহাড়ি এলাকার বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় চলে যান।

হযরত আবু উবাইদা (রা) এ পয়গাম বাস্তবায়নের কথা ভাবছিলেন। তখনই তিনিও আক্রান্ত হলেন এ জীবন বিধ্বংসী মহামারিতে এবং পরদিনই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। ইন্তিকালের আগে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত করে যান হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) কে।

এর দু'দিন পর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) এর দুই ছেলেও মারা যান। এরপর মৃত্যুর করালগ্রাস তাঁকেও আকড়ে ধরে। হযরত মুআয (রা) শহীদ হওয়ার আগে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন হযরত আমর ইবনে আস (রা) কে।

আমর ইবনুল আস (রা) মুজাহিদ বাহিনী ও শহরবাসীকে হুকুম দিলেন, সবাই যেন পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। লোকেরা ঘর বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে গেলো। ইতোমধ্যে মহামারির প্রকোপও কমে এলো। তারপর আস্তে আস্তে মহামারি তার ধ্বংসের থাবা গুটিয়ে নিলো।

পঁচিশ হাজার মুসলমান এতে মারা গেলো। এর মধ্যে এমন কিছু সিপাহসালার ও সালার ছিলেন যাদের অম্লান গৌরব গাঁথায় ইতিহাস পেয়েছে অমরত্বের সুধা। সেসব প্রাতঃস্মরণীয়দের প্রধানতমরা হলেন, আবু উবাইদা (রা), মুআয ইবনে জাবাল (রা), ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা), হারিস ইবনে হিশাম (রা), সুহাইল ইবনে আমর (রা) এবং উতবা ইবনে সুহাইল (রা)। হারিস ইবনে হিশাম (রা) এর খান্দানের ৭০ জন এবং খালিফা ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর খান্দানের ৪০ জন এতে মারা যায়।

✪ ✪ ✪

রাবেয়ার বাবা উয়েস ও রাবেয়াকে বলেছিলো, এখানকার মুসলমানদের মধ্যে আসল ইসলাম নেই। কারণ, কিছু কিছু মুসলমান মদ পান করে। এমনকি প্রকাশ্যে মদ পান করে। অথচ ইসলাম মদ সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে। উয়েস ও রাবেয়া এর জবাবে বলেছিলো, এটা মুসলমানদের ওপর ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং ইসলামের প্রতি সরাসরি ঘৃণা প্রকাশ।

পরে তদন্ত করে জানা গেলো, রাবেয়ার বাবার সে অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিলো না। বরং সত্য ছিলো সে অভিযোগ। তবে রহস্যও আছে এতে।

শাম মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার পর কিছু আরব্য খান্দান শামের বিভিন্ন এলাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। সেখানকার খ্রিস্টানরা এসব মুসলমানদের অনুগত বনে যায়। তবে মন থেকে তারা মুসলমানদের গ্রহণ করেনি। কিছু কুচক্রী খ্রিস্টান ছলে-বলে-কৌশলে যুবক শ্রেণীর কিছু মুসলমানকে মদের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এজন্য ব্যহার করে তাদের সুন্দরী কন্যাদের।

এলাকার নিষ্ঠাবান মুসলমানরা মদ্যপায়ী মুসলমানদের বাঁধা দিতে চাইলে তারা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বললো, পবিত্র কুরআন মদ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেছে,

'তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে?' এর অর্থ হলো, বিষয়টা বান্দার ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে মদ পান করবে। ইচ্ছা না করলে বিরত থাকবে। তাদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে আরো বললো, রাসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে কোন মদ্যপায়ীকে শাস্তি দেয়া হয়নি।

সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা) এর কাছে এ মদ্যপায়ী মুসলমানদের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হলো। তারা তাদের মদ পানের বৈধতা সম্পর্কে কি কি দলীল দেয়, তাও জানানো হলো। আবু উবাইদা (রা) এ পুরো বিষয়টা খুটিনাটিসহ পয়গামের মাধ্যমে হযরত উমর (রা) এর কাছে পাঠালেন।

হযরত উমর (রা) তাঁর নীতি অনুযায়ী আইন বিশেষজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামের সামনে বিষয়টা উপস্থাপন করলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, যে মদ পান করে তার বোধশক্তি হারিয়ে যায়। আর জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেলে প্রলাপ বকতে থাকে। আর প্রলাপ বকার অর্থ হলো, তার প্রতিটি কথাই হয় ভুল ও অসংলগ্ন। তখন আল্লাহ, রাসূল ও কুরআন নিয়েও অসার কথাবার্তা বলে।

উমর (রা) যখন অন্যান্য সাহাবীর মতামত ও হযরত আলী (রা) এর একথা শুনলেন তখন দ্ব্যর্থহীন এক রায় দিলেন,

'মদ্যপায়ী মুসলমানদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে।'

হযরত আবু উবাইদা (রা) কে উমর (রা) পয়গাম পাঠালেন, মদ্যপায়ীদেরকে আপনার কাঠগড়ায় দাঁড় করান। এরা যদি মদকে হালাল মনে করে তা হলে এদেরকে কতল করে দিন। আর হারাম বললে জেনে-শুনে হারাম কাজ করার অপরাধে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করুন।

আবু উবাইদা (রা) মদ্যপায়ীদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করলেন। সম্ভবত এরা পূর্বেই আমীরুল মুমিনীনের শাস্তির নির্দেশ জানতে পেরেছিলো। তাদের সকলকে আবু উবাইদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন,

'মদ পানের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?'

'মদ পান করা হারাম।' সবাই এক সঙ্গে বললো।

'হে মুসলমানেরা! হারাম জেনেও তোমরা মদ পান করতে! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন না কোন আপদ নেমে আসবেই। আমি তোমাদের জন্য ৮০টি করে বেত্রাঘাতের শাস্তির নির্দেশ জারি করছি।' আবু উবাইদা (রা) তাঁর ফয়সালা শোনালেন।

তারপর তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করা হলো। এর সুদূরপ্রসারী কাজ হলো। এরপর আর কোন মুসলমান মদ পান তো দূরের কথা মদের গন্ধ শোকারও দুঃসাহস দেখাতে পারলো না।

✪ ✪ ✪
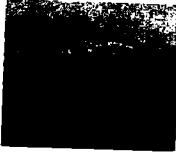
কয়েক মাস চলে গেছে। বিন সামির এক প্রকার বেকার সময় কাটালো মহান পাদ্রী বিনিয়ামীনের কাছে। অবশ্য এর মধ্যে 'আসকাফে আজম' বিনিয়ামীন ঈনীকে বিন সামিরের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। বিন সামির কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে একজন সৈনিক ছিলো। সৈনিকরা অলস সময় কাটাতে পারে না।

সে কট্টর কিবতী ঈসায়ী। ঈসায়িয়াতের ব্যাপারে বলতে গেলে সে উন্মত্ত-উন্মাদ। বিনিয়ামীনের গোপন দলের সদস্য। কিন্তু বিনিয়ামীন ওকে কোন কাজ দিচ্ছে না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, সে ফৌজের একজন সদস্য হয়েও দুই সিপাহীকে মেরে পালিয়েছে। সঙ্গে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে একটি মেয়েকে। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ওকে।

হেরাকলের মহল পর্যন্ত গোয়েন্দাবৃত্তির জাল বিছিয়ে রেখেছেন বিনিয়ামীন। হেরাক্লিয়াস তখন মিসরে নয়; ছিলেন বযনতিয়ায়। মিসরের হুকুমত ছিলো মুকাওকিসের হাতে। মুকাওকিস ছিলেন মূলত হেরাকলের বংশীবদ শাসক। মিসরের আসল বাদাশহ হেরাকল। আর যুদ্ধ বিষয়ক সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী হেরাকলের দুর্ধর্ষ জেনারেল আতরাবুন।

একদিন বিনিয়ামীনের কাছে তার দুই গুপ্তচর এলো। এরা দুজন মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়া) ছিলো। কিছু দিন বযনতিয়ায়ও ছিলো। তারা বিনিয়ামীনকে রিপোর্ট করলো, হেরাকলের মাথায় সবসময় সওয়ার থাকে শাম। তিনি দ্রুত শামে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য পরিকল্পনা করছেন।

আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার পর তিনি আরবে হামলা করার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তার উপদেষ্টারা তাকে এ বলে হামলা থেকে বিরত রাখেন যে, আরবের অধিকাংশ সৈন্য এখন শামে। রোমীয়রা আরবে হামলা চালালে মুসলমান ফৌজ শাম থেকে তাদের ঘিরে ধরবে। আর এর ফল কি হবে তা তো জানাই আছে।

গোয়েন্দারা আরো জানালো, শামে যখন মহামারি দেখা দিলো তখনও হেরাকল শামে হামলার ফয়সালা করেন এবং হামলা করেই দিতেন যদি না তার 'আসকফ' কিরাস তাকে বাঁধা না দিতেন।

কিরাস হেরাকলকে পরামর্শ দিলেন, তিনি ফৌজ নিয়ে শামে প্রবেশ করলেই এ ফৌজেও মহামারি ছড়িয়ে পড়বে। তখন এত বেশি প্রাণহানি ঘটবে যে, রোমী ফৌজের নাম নিশানাও মুছে যাবে। তাছাড়া মিসর থেকে রোমী ফৌজ চলে গেলে মিসরের কিবতী ঈসায়ী ও অন্যান্য ঈসায়ি ফেরকা সরকারি ঈসায়ীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। সামান্য যে ফৌজ মিসরে থাকবে তারা বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়বে। এর পরিণাম এও হতে পারে যে, শাম তো আমাদের হাতে আসবেই না বরং মিসরও আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে।

গুপ্তচররা আরো জানালো, হেরাকলের বংশবাদক মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস হেরাকল ও আতরাবুনকে উৎসাহ যোগাচ্ছে, শামের খ্রিস্টানরা যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দেয় এবং সেখানে গুপ্ত সন্ত্রাসী বাহিনী পাঠায়। হেরাকল আর আতরাবুন এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

শামের মুসলমানদের বর্তমানে যে নাজুক অবস্থা সে হিসেবে খ্রিস্টান কবিলাগুলো খুব সহজে বিদ্রোহ করে বসতে পারে। ওদের প্রয়োজন শুধু দক্ষ নেতার।

কূল হারা ও মাস্তুল ভাঙ্গা নাবিকের মতো এখন মুসলিম প্রশাসনের অবস্থা। আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর উপদেষ্টাপরিষদ চরম উৎকণ্ঠা ও পেরেশানীর মধ্যে রয়েছেন। এমন দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের পর ভয়াবহ মহামারির আঘাতে যত বড় রাজা-বাদশাই হোক তার কোমর ভেঙে পড়ার কথা। এ বিধ্বস্ত অবস্থায় কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ও লড়াইয়ের চাপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমর শক্তিও সহ্য করতে পারবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, রোমীয়রা মুসলমানদের ওপর চড়াও হলে মুসলমানরা হাঁটু গেড়ে বসে আত্মসমর্পণ করবে।

এ অবস্থায় মুসলমানদের আগেও হয়েছিলো। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এক অভিযানের সূচনা করেন। এতে চরম পেরেশান হয়ে হযরত উমর (রা) ও বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী আপত্তি তুলে বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর এখন কঠিন দুঃসময়। প্রিয় নবীজী (সা) কে হারানোর বেদনায় সবাই ক্ষত-বিক্ষত। এ অবস্থায় নতুন কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমরা যদি এভাবে শোকে ডুবে থাকি, কাফেররা বুঝবে এখন আর আমাদের দাঁড়ানোর শক্তি নেই। আবু বকর (রা) যা বলেছিলেন তাই

হলো। মুরতাদ ধর্মদ্রোহীদের এমন এক ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, ক্রমেই তা ভয়াবহ যুদ্ধের আকার ধারণ করলো। উমর (রা) সহ অন্যরা তখন অকপটে স্বীকার করেন, হযরত আবু বকর (রা) এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। মুসলমানদের সেই কঠিন সংকটকালে ইসলামের মুজাহিদরা প্রতিটি রণাঙ্গনে নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

পাহাড়সম ঈমানের দৃঢ়তা থাকলে, আল্লাহর দীনের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা থাকলে, পাথেয়-সম্বল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হলে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন সাহায্য আসে যে, বান্দা তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কিসরায়ে ইরানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের একটি চমৎকার ঘটনা আছে। কিসরায়ে ইরান তখন ইয়াযদগিরদ। ইরানের খোযিস্তানে তার ফৌজ একত্রিত হচ্ছিলো। এদিকে কিসরার বিখ্যাত সব জেনারেল মুজাহিদদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে হয় নিহত হয়েছে, না হয় আহত হয়েছে। না হয় অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিজেদের বিক্ষিপ্ত ফৌজ জমা করছে। খোযিস্তানেও তাই ঘটছিলো।

হযরত উমর (রা) খোযিস্তানের অভিযানে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) কে সিপাহসালার বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। খোযিস্তানে আছে ইরানের বিখ্যাত জেনারেল হুরমুযান। তিনি শাহী খান্দানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও। শক্তিমত্তা ও নেতৃত্বদানের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ বলা হতো তাকে।

হুরমুযান ইয়াযদগিরদেরকে শর্ত দেন, খোযিস্তানের কেন্দ্রীয় শহর আহাওয়ায ও ফারিসের নির্ধারিত কিছু অংশ তার হুকুমতে দিয়ে দিলে তিনি মুসলমানদের এ তীব্র ঝড়ো-বেগ শুধু রুখেই দিবেন না; বরং মুসলিম বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করবেন। ইয়াযদগিরদ তার শর্ত মেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুরমুযানের দাবী অনুযায়ী ফৌজও দেয়া হলো। এতে বিশাল এক শক্তিধর ফৌজি শক্তি হুরমুযানের হাতে এসে গেলো। এমন বিশাল ফৌজ নিয়ে গোটা একটা দেশকেই তছনছ করে দেয়া যায়।

তারপর শহরের আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হুরমুযান তাদেরকে উস্কে দিলেন। বললেন, মুসলমানরা যে এলাকাই জয় করে সে এলাকায় মেয়েদেরকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করে মেরে ফেলে। তাই বাঁচতে হলে নারী-পুরুষ সবাইকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করো। এজন্য সবাই কেল্লার ভেতর চলে আসো। আমি নিশ্চিত তোমরা আমার কথা মতো চললে একজন মুসলমানও এখান থেকে জান নিয়ে পালাতে পারবে না।

দলে দলে লোক শহরে আসতে লাগলো। হুরমুযান বিভিন্ন সময় গরম বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে আগুন-তপ্ত করে তুলেন। শহরর চারদিক জুড়ে সেনা মহড়া ও লোকদের

হৈহুল্লোড়ের সংবাদ সে এলাকার সিপাহসালার আবু মুসা আশআরী (রা) এর কাছে পৌছে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতির কাসেদের কাছে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে পূর্বক সেনা সাহায্য চেয়ে পয়গাম পাঠান।

পয়গাম পেয়ে হযরত উমর (রা) কুফায় নির্দেশ পাঠালেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যেন তার অধীনস্থ অর্ধেক ফৌজ নিয়ে আবু মুসা আশআরী (রা) এর কাছে পৌছে যায়। অনুরূপ আরেকটি পয়গাম পাঠালেন সালার জারীর বাজালীকে।

এ দু'দিক থেকে সেনা সাহায্য পৌছুতে পৌছুতে হুরমুযান তার শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিলেন। আবু মুসা (রা) এর কাছে যথাসময়ে সেনা সাহায্য পৌছালো।

হুরমুযান তার বিশাল ফৌজের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিলেন শহরে অবরুদ্ধ হয়ে লড়ার চেয়ে কেল্লার বাইরে বের হয়ে হামলা করবে।

আবু মুসা আশআরী (রা) সৈন্যসারীর ডান বাহুর নেতৃত্ব দিলেন বারার ইবনে মালিক (রা) কে। আর বাম বাহুতে রাখলেন বারা ইবনে গালিব আনসারীকে। বীরত্ব আর দুঃসাহসিক যোদ্ধা হিসেবে তাদের দারুণ খ্যাতি ছিলো। দেখতে দেখতে দুই ফৌজের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে গেলো। দুশমনের তুলনায় মুজাহিদদের সংখ্যা অর্ধেকের চেয়েও কম ছিলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা হুরমুযানের ফৌজকে পিছু হটিয়ে দিলো।

বেশ কিছু দুশমন ফৌজ মারা গেলো। আর বাকিরা শহরের খোলা দরজার দিকে পালাতে লাগলো। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু কেল্লার দরজায় অনঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অসম সাহসী হুরমুযান। নিজের সৈনদের ভেতরে ঢুকতে দিয়ে হুরমুযান উদ্যত তলোয়ার নিয়ে ফটকে দাঁড়িয়ে রইলো।

সালার বারার ইবনে মালিক (রা) দরজায় পৌছে গেলেন। তার সামনে তখন হুরমুযান। দু'জনের মধ্যে লড়াই হলো। কিন্তু হুরমুযান বারার (রা) কে শহীদ করে দিলেন।

বারার ইবনে মালিক (রা) এর অপ্রত্যাশিত শহীদ হওয়ার ঘটনা দেখে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন সালার মাখরাম ইবনে সওর (রা)। শাহ সওয়ারি আর তলোয়ার চালনায় তার বেশ নাম ডাক ছিলো। তিনি হুরমুযানের ওপর হামলা করলেন। কিন্তু হুরমুযান যেভাবে তা প্রতিরোধ করে পাল্টা হামলা চালালেন তা দেখে মাখরাম (রা) তো হয়রান হয়ে গেলেন। অবশেষে হুরমুযান তাকেও শহীদ করে দিলেন। তারপর হুরমুযান তার অবশিষ্ট সৈন্য কেল্লার ভেতর নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এরপর থেকে হুরমুযান আর কেল্লার বাইরে এসে লড়াইয়ে নামলেন না। কেল্লাবদ্ধ হয়ে লড়াই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু এভাবে কেটে গেলো এক মাসেরও বেশি। এই কেল্লা জয় করা মুসলমানদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়লো।

একদিন মুজাহিদরা শহরের এক ইরানীকে বন্দী করলো। সে বললো, তাকে প্রাণ ভিক্ষা দিলে বিনিময়ে সে অনেক বড় উপকার করবে। তাকে সিপাহসালার আবু মুসা আশআরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

সে বললো, শহরে প্রবেশের গোপন একটি রাস্তার সন্ধান দিতে পারে। বিনিময়ে তার ও তার খান্দানের একশ জনের প্রাণ ভিক্ষা দিতে হবে। আর তার খান্দানের কোন মেয়ের গায়ে মুসলমানরা হাত তুলতে পারবে না।

আবু মুসা (রা) তাকে আশ্বস্ত করলেন, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যই হলো, তারা নারীদের ভক্ষক হয় না, হয় রক্ষক। আর সে যে পথের কথা বলেছে তা যদি সত্যিই থেকে থাকে এবং সফলতা পাওয়া যা তা হলে তার পুরো খান্দানের হেফাজতের দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে।

বন্দী ইরানী বললো, প্রথমে তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এক লোক পাঠাতে। সে তাকে পথ ঘাট তো চিনাবেই সঙ্গে সঙ্গে পুরো শহরকে ভালো করে দেখে আসবে। পাঠানো হলো বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভীক এক মুজাহিদ আসরাস ইবনে আউফকে। সে ইরানীর কথা মতো আসরাসকে গোলামের পোশাক পরানো হলো। গোলাম বেশে সে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীকে নিয়ে রাতে বের হলো।

শহর কেল্লার কাছ ঘেষে নহর রয়েছে নদীর কয়েকটি শাখায় তা প্রবাহিত হয়েছে। একটি শাখা শহরের নিচ দিয়ে এমন গোপন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে যে, প্রায় কারোই তা জানা নেই। শহরের নিচ দিয়েও নদীর টলটলে ধারা প্রবহমান। শহরের ভেতরে সেটার প্রকাশ হয়েছে ঝর্নাধারা হয়ে।

ইরানী আসরাস ইবনে আউফকে সেই নহরের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে শহরের ভেতরে নিয়ে গেলো। প্রথমে আসরাসকে ইরানী তার ঘরে নিয়ে গেলো। তার ভেজা কাপড় ছাড়িয়ে একজন গোলামের শুকনো কাপড় পরালো। তারপর তার মাথায় একটি কম্বলের বোঝা চাপিয়ে দিলো। তারপর বললো, সে যেন ওর পিছু পিছু ঘুরে শহরটা ভালো করে দেখে নেয়।

ইরানী আসরাসকে শাহী মহলসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখালো। আসরাস ফটকে যে প্রহরার ব্যবস্থা আছে সেটাও দেখলো। প্রাচীরের ওপর যেখানে বুরুজের মধ্যে ইরানী ফৌজ আছে আসরাসকে সেটাও দেখানো হলো। আরো ফৌজি স্থানগুলোও আসরাস সাবধানী চোখে পর্যবেক্ষণ করলো।

ইরানী আসরাসকে বললো,

'কেবল দু'শ সৈন্যই শহর দখল করে নিতে পারবে।'

'আমার অনুমানও তাই।' আসরাস বললো।

রাতে আসরাস ইবনে আউফ যে রাস্তায় শহরে ঢুকেছিলো সে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সিপাহসালার আবু মুসাকে জানালো, সে কি কি দেখে এসেছে। আর এও বললো, মাত্র দুই শ' চৌকস এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতির মুজাহিদ হলেই এ শহর জয় করা যাবে। আবু মুসা (রা) বেছে বেছে দুইশ মুজাহিদ নির্বাচন করে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন তাদের।

আসরাস মুজাহিদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো, কি করে শহরে ঢুকতে হবে এবং শহরে গিয়ে তাদের কি করতে হবে।

সেদিন রাতেই আসরাস মুজাহিদদেরকে নিয়ে সে পথে শহরে ঢুকলো। প্রথমেই তারা ফটকের যত প্রহরী ছিলো তাদেরকে কতল করলো অতি নিঃশব্দে। তারপর পা টিপে টিপে অতি সাবধানে বুরুজে গিয়ে উঠলো। মুজাহিদরা বুরুজগুলোর চারদিক ছড়িয়ে পড়ে ইরানী ফৌজকে সামনে কচুকাটা করতে লাগলো। আর ওদিকে শহরের প্রধান ফটকও খুলে দিলো মুজাহিদরা।

এক বুরুজে এক মুজাহিদ চড়ে উঁচু আওয়াজে নারায়ে তাকবীর দিলো। আবু মুসা (রা) এরই অপেক্ষায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহরে এক যোগে হামলার হুকুম দিলেন। মুসলিম সেনারা জলোচ্ছ্বাসের মতো শহরে ঢুকতে লাগলো। ইরানীরা তো কল্পনাও করেনি তাদের ওপর এমন আচমকা গজব নেমে আসবে। ওরা সামলে উঠার আগেই পাইকারি দরে ওদের কতল শুরু হয়ে গেলো।

হুরমুযান ও তার সরদাররা ফৌজ ও সাধারণ লোকদেরকে বলেছিলো, মুসলমানরা যে শহর জয় করে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে বড়ই অমানবিক আচরণ করে। ইরানীরা যখন দেখলো, শহরে মুসলমানরা ঢুকে পড়েছে তখন কিছু লোক তাদের যুবতী মেয়েদেরকে কতল করে করে নহরে ফেলতে শুরু করলো। তখনই মুজাহিদরা এটা জানতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা এতে বাঁধা দিলো। যে কয়েকজন তাদের মেয়েকে এভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে হত্যার দায়ে পাকড়াও করা হলো।

হামলার খবর পেয়েই হুরমুযান তার মহল থেকে পালিয়ে একটি বুরুজে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। হুরমুযান তার অধীনস্থ জেনারেলদেরকে বললেন,

'মনে হয় আরবদের নহরের কোন গোপন পথের সন্ধান কেউ দিয়ে এসেছে। আর বেঈমানীটা করেছে আমাদেরই নিজস্ব কোন লোক। এর দ্বারা এটা বোঝা যায়, আরবদের নক্ষত্র আকাশের চূড়ায় পৌছেছে। আর আমাদের নক্ষত্র এখন অস্তমিত হয়ে গেছে।'

এক শহরবাসীই মুজাহিদদেরকে হুরমুযানের সন্ধান জানিয়ে দিলো। হুরমুযানকে যখন গ্রেফতার করা হলো তখন তার কাঁধে তীর-ধনুক বাঁধা। মুজাহিদরা হুরমুযানকে

বললো, তীর-ধনুক ফেলে আত্মসমর্পণ করতে। হুরমুযান তখন তার ধনুকে তীর গেঁথে নিশানা করে রেখেছিলো।

'আমার তুনীরে একশত তীর আছে'; মুজাহিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন, 'যে পর্যন্ত আমার তুনীরে একটি তীরও অবশিষ্ট থাকবে তোমরা আমার কাছে ঘেষতে পারবে না। আর মনে রেখো, আমার কোন তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আমার হাতে তোমাদের এক শ' লোক হত্যা করিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে কি তোমরা আনন্দ পাবে?'

এক মুজাহিদ সিপাহসালার আবু মুসা (রা) কে নিয়ে এলো। তিনিও তাকে তীর ধনুক ফেলে আত্মসর্পণ করতে বললেন।

'আমি জানি লড়াইরত অবস্থায় ধরা পড়লে তোমরা আমাকে জীবিত রাখবে না।' হযরমুযান বললেন, 'আমার সামনে একটা পথই আছে খোলা। নিজেকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া এবং সমঝোতা করা। কিন্তু আমি আরো অন্য কিছু চাই।'

'তুমি আরো কিছু চাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো।' আবু মুসা (রা) বললেন, 'এ শহর এখন আমাদের। যা ইচ্ছা তাই করতে পারি আমরা। কিন্তু মুসলমানদের আদর্শ কি তা দেখানোর জন্য তোমাকে এর পরও জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি চাও?'

'আমাকে খলীফা উমর (রা) এর কাছে নিয়ে চলো। তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করবেন আমি তা মেনে নেবো। মৃত্যুর আগে তোমাদের খলীফার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই।' হুরমুযান বললেন অনুরোধের সুরে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর নির্দেশ ছিলো দুশমনের কেউ যদি আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে তা হলে তার ইচ্ছা যেন পূরণ করা হয়। আবু মুসা (রা) এর কথা শুনতেই তার তীর-তুনীর আবু মুসা (রা) এর পায়ে ফেলে দিলেন। আর যুদ্ধ বন্দী নীতি অনুযায়ী হুরমুযানের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হলো।

আবু মুসা (রা) দুই অভিজ্ঞ মুজাহিদ ও সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রা) ও আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) কে দায়িত্ব দিলেন। তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় নিয়ে যাবেন। এই শহর থেকে যে মালে গনিমত অর্জিত হয়েছে সেখান থেকে বায়তুল মালের অংশও তাদের সঙ্গে দিয়ে দেয়া হলো। এ মালগুলো বহনের জন্য উটের মোটামুটি একটা কাফেলা তৈরি হয়ে গেলো।

কাফেলা যখন মদীনার কাছে পৌছলো হুরমুযান কাফেলা থামিয়ে তখন নিজের পোশাক পাল্টালেন। সোনা-রূপা খচিত পোশাক পরিধান করলেন। মাথায় দিলেন মণিমুক্তা ও হীরক খচিত মুকুট। হাতে নিলেন সোনার লাঠি। যার মধ্যে দুর্লভ মোতি ও ইয়াকুতের কারুকার্য ছিলো।

কাফেলা যখন মদীনায় প্রবেশ করলো তখন লোকেরা বিস্ময়ভরা চোখে হুরমুযানকে দেখতে লাগলো। তার এ বিচিত্র পোশাক ও সাজ-সজ্জা মদীনার লোকদের জন্য ছিলো

একেবারেই নতুন। লোকেরা জানালো হযরত উমর (রা) এখন মসজিদে আছেন। কুফা থেকে এক প্রতিনিধি দল এসেছিলো আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আনাস (রা) ও আহনাফ (রা) তাকে মসজিদে নববীতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু মসজিদ ছিলো একেবারে খালি। কয়েকটি ছেলে মসজিদের এক কোণের দিকে ইংগিত করলো। দেখা গেলো হযরত উমর (রা) সেখানে শুয়ে আছেন। আসলে কুফার লোকেরা চলে যাওয়ার পর তিনি তার পরিহিত জুব্বাটি খুলে সেটা মাথার নিচে দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন।

হুরমুযানের জুতা মসজিদের বাইরে খুলিয়ে তাকে মসজিদে প্রবেশ করানো হলো। তারপর তাকে বেশ দূরত্বে নীরবে বসে থাকতে বললেন হযরত আনাস (রা)। মসজিদে দু' একজন করে লোক এসে বসতে লাগলো। সেখানে দোভাষীও এসে উপস্থিত হলেন। দোভাষী ছিলেন হযরত হুজরাহ বিন শুবা (রা)। হুরমুযান কিছুটা হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের খলীফা উমর কোথায়?'

'ঐ যে তোমার সামনে যিনি শুয়ে আছেন।'

হুরমুযান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার মাথা আনত করে ফেললেন। তারপর মাথা উঠিয়ে হযরত উমর (রা) এর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

'বিশ্বাস হচ্ছে না, ইনি তোমাদের খলীফা। আমি কোন প্রহরী, মুহাফিজ, পদাতিক বা অশ্বারোহী কোন সৈনিক দেখতে পেলাম না। না মসজিদের ভেতরে না মসজিদের বাইরে। এখানে তো পুরো মুহাফিজ বাহিনীর থাকার কথা ছিলো।'

'আমাদের খলীফার মুহাফিজ আল্লাহ তাআলা।' হুজরা (রা) মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'আমাদের এখানে প্রহরী বা মুহাফিজ এমনভাবে থাকে না যে, খলীফা যেদিকে যান তারাও পেছনে আঠার মতো লেগে থাকে।'

'আসলে এই লোকের কোন নবী বা পয়গম্বর হওয়া উচিত ছিলো। ইনি পয়গম্বর না হলেও তার কর্মকাণ্ড পয়গম্বরগণের মতোই।' হুরমুযানের কণ্ঠে বেরিয়ে এলো এ ঐতিহাসিক রায়।

ততক্ষণে মসজিদ দর্শনার্থীদের ভিড়ে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। কারণ তাদেরকে সেখানে বাঁধা দেয়ার মতো তো কোন আর্মড স্কোয়াড ছিলো না। এত মানুষের সমাগমে নীরবতা আর অক্ষুণ্ন রাখা গেলো না। এদিকে হুরমুযানও এটা ওটা বলে যাচ্ছিলেন। এভাবেই হযরত উমর (রা) এর চোখ খুলে গেলো। তিনি হযরত আনাস (রা) ও আহনাফ (রা) কে দেখে এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তিনি ভেবেছেন এরা হয়তো ইরানের রণাঙ্গণ থেকে জরুরী কোন সংবাদ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে রাজকীয় পোশাকে এক লোককে দেখে তিনি আনাস (রা) ও আহনাফ (রা) এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'এ লোক ইরানী ফৌজের সিপাহসালার। নাম হুরমুযান। শাহী খান্দানের সঙ্গে এর বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।' হযরত আনাস (রা) বললেন।

তাকে কিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কেন তাকে এখানে আনা হলো আমীরুল মুমিনীনকে সব বলা হলো।

'আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত উমর (রা) হুরমুযানের শাহী সাজের দিকে গভীর নজরে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি তাকে ও তার বাহিনীকে ইসলামের প্রতি দুশমনীর কারণে অপসন্দ করেছেন'– উমর (রা) মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, বন্ধুরা আমার! আল্লাহর দীনকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়েতের ওপর আমল করো। মনে রেখো, দুনিয়ার জাকজমকে ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'আমীরুল মুমিনীন! তিনি আপনাকে কিছু বলতে চান। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা নিয়ে এসেছেন।' আহনাফ (রা) বললেন,

'না! গর্জে উঠলেন উমর (রা), 'যে পর্যন্ত ওর দেহে এ পোশাকের একটি সূতাও থাকবে আমি ওর সঙ্গে সে পর্যন্ত কোন কথাই বলবো না। ওকে আগে আমাদের মতো মামুলি কাপড় পরাও।'

আমীরুল মুমিনীনের হুকুম সম্পর্কে হুরমুযানকে অবগত করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ হুকুম পালন করতে হলো। তাকে দাঁড় করিয়ে দু'জন লোক তার শাহী পোশাক খুলে ফেললো। রইলো শুধু গেঞ্জির মতো পাতলা একটা কাপড়। এক লোক দৌড়ে গিয়ে একটা মোটা কাপড় এনে সেটা তাকে পরিয়ে দিলো।

'হুরমুযান! হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, 'হক আর বাতিলের পার্থক্য কি এখনো তোমার জানা হয়নি? নিজের চোখে কী আল্লাহর হুকুম প্রত্যক্ষ করতে পারছো না? তার হুকুম লংঘনের পরিণাম কি হয় তা কি দেখতে পাচ্ছো না' ?

'হে উমর! হুরমুযান দুঃসাহসিক কণ্ঠে বললেন, 'জাহেলী যুগে আমাদের ও তোমাদের মধ্যেই লড়াই হয়েছিলো। আর আমরা তোমাদেরকে তখন পরাজিত করেছিলাম। আর এই ফলাফল হয়েছিলো এ কারণে যে, তখন আল্লাহ না তোমাদের ছিলো না আমাদের।কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদের। তাই বিজয়ও হচ্ছে তোমাদের।'

উমর (রা) এর মনে হলো, হুজরা ইবনে শুবা (রা) দোভাষীর কাজ সঠিকভাবে করতে পারছেন না। তাই তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কে দোভাষীর কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

'তুমি একটা কথা বোঝতে পারোনি ইরানী সিপাহসালার!' উমর (রা) বললেন, 'জাহেলী যুগে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলে যেসব কারণে তার মধ্যে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তখন তোমাদের মধ্যে ঐক্যের শক্তি ছিলো। আর আমাদের মধ্যে ছিলো নানা কুসংস্কার আর বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। এখন ভেবে দেখো, তোমাদেরকে যে আমরা একের পর এক পরাজয়ের স্বাদ দিয়ে যাচ্ছি এর কি কারণ?'

হযরত উমর (রা) এর কণ্ঠে ক্ষোভের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। হুরমুযান অভিজ্ঞ লোক। মানুষের চেহারা পড়তে তার দেরি লাগে না। তাই হযরত উমর (রা.) এর ক্রুদ্ধ ভঙ্গি দেখে বলে উঠলেন,

'হে উমর! আমি জানি, তোমরা আকামে কতল করবে!'

'মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না। আমি জানি না, তোমাকে কি করবো আমি? আর আল্লাহ্ তাআলাই বা আমাকে দিয়ে কি করাবেন?'

হুরমুযান পানি চাইলো। তাকে পানি দেয়ার হুকুম দেয়া হলো। এক লোক একটি ঘটিতে করে পানি এনে তাকে দিলো। কিন্তু হুরমুযান বেঁকে বসলেন।

'হে মুসলিম খলীফা! তৃষ্ণায় মরে গেলেও আমি এ পেয়ালার পানি পান করবো না।'

উমর (রা) এর হুকুমে দামী একটি পাত্রে পানি আনা হলো। হুরমুযান পানি পান করতে গিয়ে অনুভব করলেন তার হাত কাঁপছে। তিনি বললেন,

'হে উমর! আমার ভয় হচ্ছে, আমার পানি পান শেষ হয়ে গেলেই তুমি আমাকে কতল করে ফেলবে।'

'মন থেকে ভয় দূর করে দাও। যে পর্যন্ত তুমি পানি পান না করবে সে পর্যন্ত তোমাকে কতল করা হবে না।'

হুরমুযান একথা শুনে পানি পান না করে পাত্রটি সরিয়ে রাখলো এক দিকে। এরপর হুরমুযান কিছু উত্তেজক কথাবার্তা বললেন। এতে উমর (রা) আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

'আমি তোমাকে কতল করে ছাড়বো।' উমর (রা) হিমশীতল কণ্ঠে বললেন।

'হে উমর! তুমি আমাকে কতল করতে পারবে না। কারণ, এখনই তুমি আমাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছো।' হুরমুযান কুটিল হেসে বললেন।

'তুমি মিথ্যা বলছো।' উমর (রা) ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাকে এ ধরনের কোন অধিকার দেইনি।'

হযরত উমর (রা) এর ক্রুদ্ধ অবস্থা দেখে আনাস (রা) কে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হলো। তিনি উমর (রা) কে জানালেন, হুরমুযান যা বলেছে ঠিকই বলেছে। সে ধোঁকা দিয়ে তার প্রাণের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়েছে।

'আপনি কি বলছেন আনাস?' উমর (রা) রাগে হিসহিস করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এমন লোককে কি করে এ ধরনের সুযোগ দিতে পারি, যে ব্যক্তি আমাদের বড় বড় সালারদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।... আমি তো বুঝতেই পারিনি যে,

এ লোক আমাকে ধোঁকা দিয়ে তার প্রাণের নিরাপত্তা আমার কাছ থেকে আদায় করে নিবে।'

'আমীরুল মুমিনীন! আনাস (রা) বললেন, 'আপনি ওকে বলেছিলেন, যে পর্যন্ত সে পানি পান না করবে সে পর্যন্ত তাকে আপনি হত্যা করবেন না। সে পানি তাই পান না করে সরিয়ে রাখে। এখন তো এ লোক পানি পানই করবে না।'

'ইরানের ধোঁকাবাজ সিপাহসালার!' উমর (রা) হুরমুযানের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, 'তুই আমাকে ধোঁকা দিয়েছিস। খোদার কসম, আমি ধোঁকা খেয়েছি এ কারণে যে, আমার মধ্যে মুসলমানের সরলতা আছে। আর মুসলমান তার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ কখনো গিলে ফেলে না।'

'হে খলীফাতুল মুসলিমীন!' হুরমুযান মুচকি হেসে তার ডান হাত হযরত উমর (রা) এর দিকে প্রসারিত করে বললেন, আমি এসেছি, এ উদ্দেশ্যে যে, আমি মুসলমানদের খলীফার হাতে ইসলাম গ্রহণ করবো আর আমি ধোঁকা দিয়েছি এজন্য যে, লোকেরা যাতে একথা বলতে না পারে যে, আমি তলোয়ার ও প্রাণের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

এভাবে ইরানের বিখ্যাত এক জেনারেল মুসলমান হয়ে গেলেন। মুসলমান হয়েই হুরমুযান হযরত উমর (রা) এর কাছে মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত উমর (রা) তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার জন্য বাৎসরিক দু' হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

হযরত উমর (রা) হুরমুযানের কাছ থেকে যুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ নিতেন এবং তার পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তিনি। এভাবে হুরমুযান ইসলামের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু তার পরিণাম তার প্রতিকূলে গিয়েছে।

ঘটনাটি হলো, আমীরু মুমিনীন হযরত উমর (রা) কে আবু লু'লু' ফায়রুয নামের এক খ্রিস্টান গোলাম মসজিদে শহীদ করে দেয়। সেটা হলো ২৩ হিজরীর ২৬শে যিলহজ মাসের ঘটনা। আবু লু'লু' ছিলো হযরত ইবনে শুবা (রা) এর গোলাম। তাকে গ্রেফতার করা হলে সে খঞ্জর দিয়ে আত্মহত্যা করে। মূলত সে ইরান থেকে যুদ্ধ বন্দী হয়ে মদীনায় এসেছিলো।

হযরত উমর (রা) এর এক পুত্র উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তদন্ত করছিলেন, আমীরুল মুমিনীনকে কি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে হত্যা করেছে না এর পেছনে কোন চক্রের হাত আছে। হত্যাকারীর খঞ্জর জব্দ করা হয়েছিলো প্রথমেই। সেটি সাধারণ কোন খঞ্জর ছিলো না। বরং খঞ্জরটি দু'ধারী ছিলো এবং এর বাট ছিলো মাঝখানে।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) এ খঞ্জরটি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেখানে কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন,

'খোদার কসম! আমি এ খঞ্জর আগেও দেখেছি একবার!' একথা বলে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) চমকে উঠে আবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। আমি হুরমুযানকে দু'জন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করতে দেখেছি। এর একজন ছিলো জাফীনা এবং আরেকজন ছিলো ঐ অভিশপ্ত আবু লু' লু। আমাকে দেখে তিনজনই চমকে উঠে। দ্রুত তারা সেখান থেকে সরে পড়ে। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তখনই খঞ্জরটি কারো হাত থেকে পড়ে যায়। আবু লু'লু দ্রুত সেটা উঠিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে।

একথা শুনে বর্ষীয়ান সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) রায় দিলেন, হুরমুযান এবং জাফীনা হযরত উমর (রা) এর হত্যাকাণ্ড চক্রান্তের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলো।

এ রায় যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) শুনলেন তখন রাগে-ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘর থেকে বের হলেন। হুরমুযানের ঘরে গিয়ে হুরমুযানকে বাড়ির বাইরে ডেকে আনলেন। বললেন, আমার সঙ্গে এসো। আমার ঘোড়াটি একটু দেখে যাও। হুরমুযান আগে আগে হাঁটছিলো। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এক কোপে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সোজা জাফীনার ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাকে ডেকে একইভাবে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। জাফীনা পড়ে গেলো। আর উঠলো না কোন দিন।

✪ ✪ ✪

মিসরের আত্মগোপনকারী 'আসকাফে আজম' বিনিয়ামীনের কাছে বিন সামিরের মতো আরো কয়েকজন খ্রিস্টান আশ্রয়ে ছিলো। এরা সবাই বিনিয়ামীনের গুপ্তদলের লোক। এদের দু'জনের সঙ্গে বিন সামিরের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। এরা দু'জন বিন সামিরের মতো ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ বিশ্বাসী। বিন সামিরের মতো রোমীয় ও মুসলমানদের শক্ত বিরোধী।

বিনিয়ামীনের কাছে যে দুই গোয়েন্দা হেরাকলের রিপোর্ট নিয়ে এসেছিলো তাদের একজনের সঙ্গে বিন সামিরের এ দুই বন্ধুর এক জনের বন্ধুত্ব আছে। সেই গোয়েন্দা তার বন্ধুকে গোপনে জানিয়ে দেয় সে কি সংবাদ নিয়ে এসেছে।

'তাহলে কি শামের ঈসায়ীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?' বিন সামিরের বন্ধু তার গোয়েন্দা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো।

'না,' গোয়েন্দা বন্ধু বললো, 'আসকাফে আজম বিদ্রোহের পক্ষে নন। তিনি বলেন, এর আগে শামের ঈসায়ীরা বিদ্রোহ করে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ওদিকে হেরাকলের আসকাফে আজম কিরাসও বিদ্রোহের বিপক্ষে।'

'হেরাকল কি শামে হামলা করবেন না?' বিন সামিরের বন্ধু জিজ্ঞেস করলো।

'না, হেরাকল এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন।' গোয়েন্দা বন্ধু বললো।

'আসলে এরা মুসলমানদেরকে আবার সামলে উঠার সুযোগ দিচ্ছে।' বিন সামিরের বন্ধু বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বললো। 'এটাই তো ছিলো হামলা করার সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হারালে মুসলমানরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তারপর শামের মতো মিসরী ফৌজকেও চরম শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।'

'আসকাফে আজম বিনিয়ামীনের রায় একটু ভিন্ন। গোয়েন্দা বন্ধু বললো, 'তিনি চাচ্ছেন শামে কোন ধরনের বিদ্রোহ যেন না হয়। যাতে মুসলমানরা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির ক্ষতি পূরণ করে এবং আবার শক্তি সঞ্চয় করে মিসরে হামলা করতে পারে। তারপর রোমী ফৌজকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

'এটা হতেই পারে না।' বিন সামিরের বন্ধু অন্ধ আবেগে বললো, 'এর অর্থ হলো, শামেও মুসলমানদের রাজত্ব চলবে এবং মিসরেও তাদেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।... না... না... কখনোই তা হতে দেবো না। আমরা শামে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেবো।'

পরদিন সকালে উঠে বিনিয়ামীন, বিন সামির ও তার দুই বন্ধু এবং ঈনীকে খুঁজে পেলেন না। আস্তাবলে গিয়ে দেখলেন সেখানে চারটি ঘোড়া কম। প্রতিক্রিয়ায় তিনি শুধু বললেন, 'খোদা যেন ওদেরকে নিরাপদে রাখেন'।

বিনিয়ামীনের ওখানে কোন প্রহরার ব্যবস্থা ছিলো না। আর এর দরকারও ছিলো না। অতি বন্ধুর গিরি কন্দর পেরিয়ে এ বালিয়াড়ির রাজ্যে আসতে হয়। গতকাল রাতে ওরা অত্যন্ত নিঃশব্দে আস্তাবল থেকে চারটি ঘোড়া নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ে। বালিয়াড়িতে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি তো এমনিতেই শোনা যায় না। আর ওরা তো অতি সাবধানে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

সকাল পর্যন্ত ওরা অনেক দূর চলে যায়। বিন সামির যেহেতু ফৌজ থেকে ফেরার হয়েছে এবং দুই সৈন্যকে খুন করে এসেছে, এজন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিটানো চৌকি থেকে দূরের পথ ধরে তাদেরকে যেতে হচ্ছিলো। অনেক ঘুর পথে ওদেরকে শামে যেতে হবে। আরব সাগরের কোন অখ্যাত তীরে ওরা আগে পৌঁছুতে চায়। এজন্য ওরা তিনদিন সফর শেষে বুহায়রায়ে আহসারের দক্ষিণ প্রান্ত যেখান থেকে সুয়েজখাল শুরু হয়েছে সেখানে পৌঁছলো। এসব অঞ্চলে তখনো রোমীয় ফৌজের আনাগোনা শুরু হয়নি।

ওরা এমন জায়গায় পৌছুলো যেখানে ছোট ছোট পাল তোলা জাহাজ চলাচল করে। ওরা ওদের ঘোড়াগুলোও জাহাজে করে নিয়ে যাবে। জাহাজে সে ব্যবস্থাও আছে। আর তিন চার দিন পর জাহাজ এখান থেকে রওয়ানা করবে।

জাহাজের গন্তব্য আরব সাগরের উপত্যকার বহু দূরের এক বন্দর। দূরত্ব সাড়ে তিন শ মাইল। বেশ কয়েক দিনের সফর। বিন সামির ফৌজি অফিসার ছিলো। বিভিন্ন অভিযানে তাকে বহু জায়গায় যেতে হয়েছে। এজন্য সে জানে, আরবের যে বন্দরে ওদেরকে জাহাজ পৌছে দেবে, সেখান থেকে শাম পৌছুতে হলে বিশাল মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হবে। অতি কঠিন এবং ভয়াবহ সফর।

জাহাজ নোঙ্গর উঠিয়ে চলতে শুরু করলো। বিন সামির ও তার বন্ধুরা ঠিক করলো, এ জাহাজের প্রতিটি মুসাফিরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান তাদেরকে ওদের মিশনের কথা জানিয়ে ওদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করবে।

সেদিন থেকেই ওরা জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলো। দু'দিনেই জানা হয়ে গেলো জাহাজে কতজন যাত্রী খ্রিস্টান আর কতজন মুসলমান বা অন্য ধর্মের। চার পাঁচজন সরদার শ্রেণীর লোককে ওরা টার্গেট করলো। এদের মধ্যে একজন আবার শামের এক খ্রিস্টান গোত্রের সরদার। ওরা ওদের নির্বাচিত লোকদের সঙ্গে খাতির জমাতে লাগলো। তারপর তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কাতে শুরু করলো। দু একজনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও হলো। কিন্তু এরা তো শেষ পর্যন্ত ছিলো খ্রিস্টানই। তাই ওদের কথা মেনে নিতেও সময় লাগলো না।

বিন সামির ও তার দুই বন্ধু এই খ্রিস্টানদেরকে রাজি করাতে চেষ্টা করছিলো, তারাও যেন শামে গিয়ে খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

মধ্য বয়সের কাছাকাছি এক খ্রিস্টান ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিন সামিররা অনুভব করলো, লোকটিকে বেশ বুদ্ধিধর মনে হয়। যখন কথা বলে তখন অন্যকে বেশ প্রভাবান্বিত করে তুলে। একদিন ওদের তিনজন তাকে ঘিরে ধরলো। পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। লোকটি জানালো, শামের অমুক শহরে থাকে সে। তিনজনই তাকে নিয়ে উঠেপড়ে লাগলো।

মুসলানদের বিরুদ্ধে তাবলীগ করতে শুরু করে দিলো। বললো, শামে খ্রিস্টানরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে তা হলে আর কিছু হোক না হোক সেখানে ঈসায়ী রাজ্য তো প্রতিষ্ঠিত হবে। লোকটি ওদেরকে সমর্থন করে জিজ্ঞেস করলো, এটা কিভাবে সম্ভব আর ওরা কি একাজেই যাচ্ছে নাকি? বিন সামির তাদের মিশন সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত জানিয়ে বললো, তারা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এ কাজ করবে।

মধ্যবয়সী লোকটি কথায় কথায় জানতে পারলো, হেরাকল, মুকাওকিস ও বিনিয়ামীন কি করছেন। বিনিয়ামীনকে তার দুই গোয়েন্দা যে রিপোর্ট দিয়েছিলো বিন সামির তাও

লোকটিকে জানিয়ে দিলো। লোকটি কৌশলে আরো খুঁটিনাটি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নিলো। রোমী ফৌজের কি অবস্থা? তাদের জেনারেলরা কি করছে ইত্যাদি বিষয়ও বাদ গেলো না। এমনকি বিন সামির যে ফৌজি কর্তা এবং সে কি করে বিনিয়ামীনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাও বলে দিলো।

এক রাতে বিন সামির জাহাজের ছাদের ওপর গেলো। চাঁদনী রাত। সমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হয় আকাশের চাঁদটি সমুদ্রের বুকে সাতার কাটছে। অভিভূত হওয়ার মতো দৃশ্য। একটু পায়চারী করতেই সে লোকটিকে দেখতে পেলো। ওর সন্দেহ হলা, এ সে লোক নয়! কিন্তু হুবহু সে লোকই। বিন সামির ভাবলো একই অবয়বের দু'জন লোকও তো থাকতে পারে। কিন্তু ওর সন্দেহ হলো। সে আরো কাছে গিয়ে দেখলো। সন্দেহ হওয়ার কারণ হলো, লোকটি নামায পড়ছে। অথচ সে জানে, এ লোক খ্রিস্টান। সে লোক এশারের নামায পড়ছিল। তার পাশে আরো দুই লোক নামায পড়ছিল। নামায শেষ হলে, বিন সামির গভীর কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি বলেছো, তুমি একজন খ্রিস্টান অথচ তুমি মুসলমানদের নামায পড়ছো!'

'আমি ভাই দরবেশ মানুষ।' লোকটি স্বাভাকি গলায় বললো, 'আল্লাহর ইবাদত করা ফরয। একই ধরনের ইবাদত বিভিন্ন ধর্মে আছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি মুসলমানদের নামায পড়ছি। আসলে এভাবেই আমি ইবাদত করি।'

জবাবে বিন সামির সন্তুষ্ট হলো না। একের পর এক প্রশ্ন করে গেলো সে লোকটিকে। সে লোকও কৌশলে জবাব দিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু বিন সামির নিশ্চিত হয়ে গেলো এ লোক মুসলমান।

সে তার বন্ধুদেরকে জানালো, কি ঘটেছে এ লোককে নিয়ে। বিন সামির সঙ্গে সঙ্গে এও বললো, এ লোক শুধু মুসলমান নয়, এ ধরনের চতুর লোক গোয়েন্দাও হয়ে থাকে।

পরদিন অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে তারা নিশ্চিত হলো এ লোক একজন আরব মুসলমান। প্রকৃতই এ লোক মিসরে প্রেরিত মুসলিম গোয়েন্দা ছিলো। সঙ্গে যে দু'জন নামায পড়ছিলো এরাও তার সঙ্গী। সহকারী গোয়েন্দা।

বিন সামির দারুণ চটে উঠলো। কারণ, এ লোক তার কাছ থেকে অনেক বেফাস তথ্য জেনে নিয়েছে। এর থেকেও বিন সামির নিশ্চিত হয়ে গেলো এ লোক গোয়েন্দা ছাড়াও আর কিছুই নয়।

বিন সামিরের বন্ধুরা সব শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। তিনজনই এক বাক্যে বললো, এ তিন মুসলমানকে হত্যা করতে হবে। রাতে সুযোগ বুঝে হাত পা বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হবে।

'তাকে মারতে হলে আজ রাতেই শেষ করে দেয়া হোক।' বিন সামির ফিসফিস করে বললো।

'ঐ বেটার সাথে আবার বেশ কথা আছে। ওকে বলবো, চলো ভাই হাওয়া খেয়ে আসি ছাদ থেকে। আশা করি সে বিলম্ব করবে না এ কথায়। তারপর তাকে এমন জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাবো যে, কেউ দেখবে না। তারপর বেটাকে সাগরে নামিয়ে দেবো। কেউ টেরও পাবে না।

বিন সামির সেদিন সন্ধ্যাতেই সেই মুসলিম গোয়েন্দার সঙ্গে খাতির জমাতে শুরু করলো। কথায় কথায় খুব আন্তরিক হয়ে উঠলো। যেন তাদের মধ্যে কত দিনের পরিচয়। সে অনুনয় করে বললো,

'আজ রাতে জাহাজের ছাদে একটু নিরালায় আপনার একটু সান্নিধ্য পেতে চাই।'

'কেন? কোন বিশেষ ব্যাপার আছে না এমনিই গল্প করার জন্য?' মুসলিম গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি অনেক ভেবেছি। অবশেষে মেনে নিয়েছি আপনি সত্যিই সুফি দরবেশ মানুষ। আর আপনি বিদ্বান এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমানও। আমাকে আপনার শাগরিদ মনে করুন। আজ রাতে আপনার পথের দিশা আমাকে দেখিয়ে দিন। আসলে আমি অত্যন্ত পেরেশান একজন মানুষ। হয়তো খোদা আমার প্রতি নারাজ। আমি জীবনের অনেক কিছুই আপনাকে শোনাতে চাই।'

'ঠিক আছে ভাই। যখনই বলবে ওপরে চলে যাবো। তুমি বললে সারা রাত তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবো।'

সে রাতে জাহাজ প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। মধ্য রাতের একটু আগে ঐ মুসলিম গোয়েন্দাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো জাহাজের ছাদের ওপর। নিচে যাত্রীরা সব শুয়ে পড়েছে। ছাদ প্রায় ফাঁকা। বিন সামির ও এ মুসলিম গোয়েন্দা ছাড়া দুই তিনজন যাত্রী আছে মাত্র। তারা দূরে দাঁড়িয়ে রাতের সাগরের দৃশ্য উপভোগ করছে। আকাশের দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এর অর্থ হলো, আকাশে মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। বাতাসের প্রবাহও থেমে গেছে। যে পালগুলো বাতাসে ভরে পত্ পত্ করছিলো সেগুলো এখন সাধারণ কাপড়ের মতো ফর ফর করছে। এ কারণে জাহাজের গতিও অনেক মন্থর হয়ে এসেছে।

বিন সামির তার শিকারকে ছাদের রেলিঙের কাছে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর দেখলো, বড় দ্রুত মেঘের পাহাড়সম খণ্ডগুলো আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে চাঁদ মেঘের কোলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বিন সামির দুই সঙ্গীও ছাদে উঠে এলো। ওরা ধীরে ধীরে বিন সামিরের ও তার শিকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুবর্ণ সুযোগ এখন। চাঁদের অনুপস্থিতিতে চার দিকে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে। এখন তিনজন মিলে একজনকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দেয়া অতি সহজ কাজ হয়ে পড়লো।

বিন সামিরের কাছে ঘেষতেই আচমকা প্রচণ্ড বাতাস শুরু হয়ে গেলো। সবাই টের পেলো, সাগরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এখনই ওরা ওদের শিকারের কাজ খতম করে দিবে।

'সাবধান ভাইয়েরা! কয়েকজনের সতর্ক গলা ভেসে এলো তখনই। এখনই নিচে চলো। ভয়াবহ তুফান আসছে। দেরি করলে সবগুলো সাগরের পেটে চলে যাবে।... তাড়াতাড়ি করো... দ্রুত...।'

জাহাজের নাবিক ও তার সহকারীরা ছাদে উঠে এসেছে। ওরা সারা ছাদে ছড়িয়ে পড়ে পালগুলো খোলা শুরু করে দিলো। বিন সামিরদের আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিলো না। পলকেই প্রচণ্ড বাতাস গ্রাস করলো ওদেরকে। কোন রকম ওরা নিচে নামতে পারলো। তারপর হিমশীতল বাতাসের সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। কাগজের নৌকার মতো দুলে উঠলো জাহাজ।

ঘুমন্ত যাত্রীরা শায়িত অবস্থাতেই একজন আরেকজনের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুসলিম গোয়েন্দা, বিন সামির ও তার বন্ধুরা কে কোথায় তার কোন হদিস রইলো না। সাগরের বিশাল বিশাল উত্তাল তরঙ্গ জাহাজে আছড়ে পড়ছে। বিক্ষুব্ধ সাগর আর উন্মাতাল ঝড় জাহাজকে যেন খেলনার পাত্র বানিয়ে নিয়েছে। যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে আছড়ে মারছে।

জাহাজে কত রকমের যাত্রী আছে। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক শিশু সবই আছে। কিন্তু এখন এ দিশেহারা অবস্থায় কারো দিকে কারো কোন খেয়াল নেই। মায়েরা শিশু বাচ্চাদের বুকের সঙ্গে প্রাণপণ চেপে ধরে রাখলো। কিন্তু জাহাজ যখন ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে লাগলো এবং ঘন ঘন ডানে বামে কাত হয়ে পড়তে লাগলো তখন মায়েদের অজান্তেই বাচ্চাগুলো ছিটকে পড়ে হারিয়ে যেতে লাগলো জাহাজের ভেতরেই। যাত্রীদের মনে হচ্ছিলো তারা উত্তাল সাগরে রয়েছে।

যাত্রীরা কানফাটা চিৎকারে হাত পা ছুড়ছিলো। কিন্তু ঝড়ের দানবীয় প্রলয়ংকারী শব্দে সেসব চাপা পড়ে যাচ্ছিল। জাহাজ সেই কখন নাবিকের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছুটে গেছে। এখন জাহাজ ও তার যাত্রীদের জীবন এই ভয়াল ঝড়ের দয়ার ওপর রয়েছে।

তবে একটা কাজ হয়েছে। জাহাজ কোন অজানা এক সমুদ্র তীরের খুব কাছে চলে এসেছে। তবে জাহাজের আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে জাহাজ ডুবতে শুরু করলো। আর যাত্রীরা সাগরে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। একটু পর জাহাজ সম্পূর্ণ ডুবে গেলো। পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলো জাহাজের ভাঙা মাস্তুল, খণ্ডিত কাঠ খণ্ড এবং আরো কতকিছু তখনো চার দিকে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

✪ ✪ ✪

ভোর হলো একটি নির্মল দিবসের ইংগিত দিয়ে। আকাশে ছোট ছোট মেঘের ভেলা উড়া উড়ি করছে। কী নিস্পাপ পবিত্র আবহ চার দিকে। সাগর কত শান্ত। যেন রাতে কিছুই হয়নি। কত নিরীহ যাত্রী। কত মা ও তার দুধের শিশু তার পেটে নিয়ে সাগর এমন শান্ত হয়েছে তা সেই জানে।

সাগর তীরে বিক্ষিপ্ত কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে। কিছু লোক এমনভাবে পড়ে আছে যেন জ্ঞান হরিয়েছে। আর কিছু তো পা ঘেষতে ঘেষতে এক দিকে যাচ্ছে। আসলে ভাগ্য এদেরকে সহায়তা করেছে। ওরা সাতার জানতো এবং ঝড়ও জাহাজকে এ উপকূলে এনে ডুবিয়েছে। তবুও যেখানে জাহাজ ডুবেছে সেখানে সাগর কম গভীর নয়। যত বড় সাতারুই হোক ভাগ্যে না থাকলে সেখান থেকেও তীরে পৌঁছানো সম্ভব ছিলো না।

তিনজন লোককে দেখা গেলো উপত্যকা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনজনই আরবী। ওদের চলার ধরন দেখে বুঝা যাচ্ছে এরা এ এলাকা চিনে এবং কোথায় জনবসতি আছে তা তাদের জানা আছে।

তারা মাইল তিনেক যাওয়ার পর দেখলো, বলির মধ্যে একটি লোক বসে আছে। এমনভাবে বসে আছে যেন উপুড় হওয়ার চেষ্টা করছে। বিধ্বস্ত চোখ মুখ। ওরা ওর কাছে এগিয়ে গেলো। পায়ের আওয়াজ পেয়ে লোকটি ওপর দিকে তাকালো। একে একে তিনজনকে দেখলো। তারপর একজনকে দেখে তার চোখ দুটি বড় হয়ে গেলো। তাকে চিনতে পেরেছে।

এ হলো সেই মুসলিম গোয়েন্দা বিন সামির, যে নিজে ও তার দুই সঙ্গী তাকে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু অবশেষে তাদেরকেই সাগরে ছিনিয়ে নিয়েছিলো।

মুসলিম গোয়েন্দাও ওকে চিনে ফেললো। সে হলো বিন সামির। কিন্তু সে একা কেন?

'তুমি বড় সৌভাগ্যবান বিন সামির!' মুসলিম গোয়েন্দা বললো, 'এমন ঝড়ের মরণ-ছোবল আর বিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউ থেকে জীবিত বের হওয়া তো অলৌকিক ব্যাপার। তোমার সঙ্গে অতি সুন্দরী একটি মেয়ে ছিলো। সে কি ডুবে গেছে?'

'না বন্ধু! ও আমার স্ত্রী ছিলো। সাগরে নয়। এ বালির রাজ্যে ডুবে গেছে।' বিন সামিরের সুর ব্যথাতুর হয়ে উঠলো।

'ওহ! খুবই দুঃখজনক বিন সামির! বুঝতে পারছি। ওকে সাগর থেকে উদ্ধার করতে পারলেও এখানে এনে বাঁচাতে পারোনি। দাফন করেছো এখানেই? এখানে কোথায় করেছো দাফন?

'তুমি কিছুই বুঝো নাইরে ভাই! কী বলবো তোমাকে, আমার ওপর দিয়ে কি বয়ে গেছে! হায় সাগরেই যদি'...

'শোন বিন সামির!' এখন আমি তোমাকে আসল পরিচয় খুলে বলছি। আমি কোন ঈসায়ী নই। আমি মুসলমান। আমার নাম মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কী। তুমি এখন আমাদের দেশে রয়েছো। এ আরব সাগরের উপত্যকা। আমি আমার বন্ধুরা তোমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে যাব না।'

মাসউদ ও তার দুই সঙ্গী তার পাশে বসে গেলো। মাসউদ বললো, 'এখন তুমি তোমার কথা বলো। তোমার ওপর দিয়ে কি বয়ে গেছে'...

বিন সামির মনে মনে দারুণ বিষম খেলো। সে তো এ মাসউদকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। এর ব্যাপারে ছিলো তার চরম ঘৃণা আর বিদ্বেষ। সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লো, মাসউদ ও তার দুই সঙ্গীকে সে বিশ্বাস করবে কি না। কিন্তু মাসউদের গলায় যে সহানুভূতির ছোঁয়া অনুভব করেছে এবং ওরা যেভাবে তার পাশে বসেছে এ থেকে স্পষ্ট সহমর্মিতা প্রকাশ পাচ্ছে। যত কিছু হোক এরা বন্ধু না হলেও অনিষ্টকারী শত্রু নয়। তাই সে তার কাহিনী বলে গেলো।

জাহাজ যখন ডুবতে শুরু করলো তার দুই সঙ্গী তখন সাগরে লাফিয়ে পড়লো। বিন সামির সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলো ঈনীকে নিয়ে। সে এও ভেবে রেখেছিলো, ঈনী ডুবে গেলে সেও ডুবে মরে যাবে।

ততক্ষণে ঈনীও সাগরে লাফিয়ে পড়েছে। সেও লাফিয়ে পড়ে ঈনীকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু সে বিশাল ঢেউয়ের আড়ালে চলে যাওয়াতে বিন সামিরের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেলো। একটু পরই সে ঈনীকে দেখতে পেলো এবং স্বস্তিও পেলো বেশ। তার এক সঙ্গি ঈনীকে উপুড় করে তার পিঠে নিয়ে তীরের দিকে সাতরে যাচ্ছিলো।

সেখানে তো ঝড়ের শো শো ডাক আর তরঙ্গাভিঘাত। চার দিক কেয়ামত করে তুলেছিলো। তবু বিন সামিরের সেই বন্ধুর আওয়াজ সে শুনতে পেলো,

'বিন সামির! ওকে নিয়ে ভেবো না। আমি ওকে উদ্ধার করতে পারবো।'

বিন সামির নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো সে এবার নিজে তীরে পৌছার জন্য সাগরের সঙ্গে ঝুঝতে লাগলো। সৈনিক হওয়াতে দক্ষ সাতারু ছিলো। কম ছিলো না ওর সঙ্গীরাও।

তীর একটু দূরে থাকলেও সাগরের ঢেউ ওদের অনুকূলে ছিলো। এক সময় ওদেরকে সাগর তীরে নিয়ে ফেললো। ততক্ষণ আরো কয়েকজন এভাবে তীরে পৌছতে

পেরেছে। ওদের অবস্থা তখন বিধ্বস্ত। দেহের প্রতিটি জোড়া যেন ভেঙ্গে পড়ছিলো। চারজনই মাটিতে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। বিন সামির ওদেরকে জানালো, এটা আরব উপত্যাকা। শাম এখান থেকে অনেক দূর।

ওরা বিশ্রাম নিলো অনেক সময় ধরে। বিশ্রাম হয়ে গেলে ওরা চলতে শুরু করলো। কোথায় এবং কোন দিকে যে ওরা যাবে সেটা নির্ণয় করার মতো কোন জ্ঞান ছিলো না ওদের। তবু চলতে লাগলো। একটু পরই রাত নেমে এলো। এক জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। বিন সামির ও ঈনী আলাদা ঘুমালো। আর ওর দুই সঙ্গী একটু দূরে গিয়ে শুলো। সারা দিন হারভাঙা ধকল গেছে। শুতেই ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

অর্ধ রাতের দিকে চিৎকার চেচামেচির আওয়াজে বিন সামিরের চোখ খুলে গেলো। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। পাশে ঈনী নেই। চাদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো, একটু দূরে ওর দুই সঙ্গী ঈনীকে নিয়ে টানাহেচড়া করছে। ওর যে বন্ধু ঈনীকে পিঠে করে সাগর থেকে উদ্ধার করে এনেছে সে ঈনীকে নিচে ফেলে তার কাপড় খোলার চেষ্টা করছিলো। আর আরেক বন্ধু ঈনীর দু'হাত ধরে রেখেছিলো। ঈনী সমানে বিন সামিরের নাম ধরে চিৎকার করছিলো।

বিন সামির সেদিকে প্রায় উড়ে গেলো। গিয়েই একজনকে দশাসই একটি ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। আরেকজনকে পুরো শক্তি দিয়ে মারলো লাথি। দু'জন দু' দিকে ছিটকে পড়লো। বিন সামির ঈনীকে উঠালো। ওর তো মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিলো। বন্ধু হয়ে বন্ধুর এত বড় সর্বনাশ। এরা নাকি আবার বড় ধার্মিক!

'বিন সামির দূরে সরে যাও।' ওর এক বন্ধু বললো, 'সাগর থেকে ওকে উদ্ধার করে এনেছি আমি। আর আমার এ বন্ধু এ কাজে সাহায্য করেছে। তাই এ মেয়ের ওপর তোমার যতটুকু অধিকার আছে আমাদেরও ততটুকু অধিকার আছে।'

'আরে তুমি তো ওকে সাগরে ডুবে মরার জন্য রেখে এসেছিলে। এখন বলতে গেলে ওর ওপর তোমার কোন অধিকারই নেই।' দ্বিতীয়জন বললো।

বিন সামির ঈনীকে তার পেছনে নিয়ে গেলো। তারপর ওদের বুঝাতে চেষ্টা করলো, তোমরা না ধর্মের জন্য নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছো। এতো শয়তানী কাণ্ড! কি উদ্দেশ্যে ওরা ঘর ছেড়ে বের হয়েছে সেটা ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু এসব কথা ওদেরকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করলো না। ওরা উল্টো হুমকি ধমকি দিতে লাগলো। অবশেষে একজন প্রস্তাব রাখলো, শুধু আজকের রাতটার জন্য ঈনীকে ওদের হাতে তুলে দেয়া হোক। বিন সামির বুঝতে পারলো এরা আজ সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে উঠেছে। বিন সামির বললো,

'তোমাদের দু'জনের ওপর আসলে শয়তান ভর করেছে। আমি শয়তানের দেমাগ ঠিক করার নিয়ম জানি।'

একথা বলে বিন সামির ওদের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ওরা দু'জন কোন সুযোগ দিলো না। তার ওপর টুটে পড়লো। বিন সামিরও টুটে পড়লো। বিন সামির একা দুজনের সঙ্গে লড়তে লাগলো। কিন্তু ওরা ক্রমেই ওর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগলো। কারণ, ওরাও তো বিন সামিরের মতোই শক্তিধর যুবক। ঈনী দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো। বিন সামিরকে যে সাহায্য করবে সে সাহস ও শক্তি সে পাচ্ছিলো না।

কারো কাছেই কোন হাতিয়ার ছিলো না। থাকলে বিন সামির এতক্ষণে খুন হয়ে যেতো। লড়তে লড়তে বিন সামিরের দম ফুরিয়ে এলো। দু'জনে ওকে চোখে মুখে ও মাথায় মারতে লাগলো। বিন সামির চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো। পড়ে যাওয়ার পরও তার হাতে পায়ে ওরা আঘাত করে গেলো।

জ্ঞান ফেরার পর বিন সামিরের মনে হলো, ওর হাড় কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। মাথা ঘুরছিলো। ও' উঠতে গেলো। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সে চার দিকে তাকালো। তার সামনে ছিলো কেবল ধূধূ বালি আর বালি। ঈনীর নাম নিশানাও ছিলো না কোথাও। সে সেখানেই বসে রইলো। ঈনীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এ সত্য সে মেনে নিতে পারছিলো না।

'মাসউদ ভাই! বিন সামির বললো, 'আমাকে তুমি সাহায্য করবে এ আশা আমার করা উচিত নয়। কিন্তু তুমি বলছিলে আমি এখন তোমাদের দেশে। তোমরা আমাকে একা রেখে যাবে না। তা হলে কি আমি বুঝে নেবো তোমরা আমাকে সব ধরণের সাহায্য করবে? করার কথাও নয়... তুমি জানো, আমি ঈসায়ী... তা হলে আমাকে সাহায্য করবে কেন?'

'আমি মুসলমান বিন সামির'! মাসউদ ইবনে সুহাইল বললো, 'আমি ইসলামের বিধানের অনুসারী। তোমার ধর্ম যাই হোক। তুমি একজন মানুষ এবং বিপদগ্রস্ত। ইসলাম আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমাকে সাহায্য করার জন্য। আর ইসলামে এ বিধানও দিয়েছে যে, তোমার মুখ থেকে যা বের হবে তা কাজে বাস্তবায়ন করো। আমার বন্ধুরাও তোমাকে সাহায্য করবে... আসলে তোমার স্ত্রী এত রূপসী ছিলো যে, ওকে ভোগ করার জন্য সাধু পুরুষও টলে উঠতো।'

✪ ✪ ✪

বিন সামির হাটবে কি, প্রথম প্রথম তার পা ফেলতেই কষ্ট হচ্ছিলো। মাসউদ বিন সুহাইলের দুই সঙ্গীর সাহায্যে সে এখন হাঁটতে পারছে। মাসউদ অভিজ্ঞ এক গোয়েন্দা। বিন সামিরেরই দুই সঙ্গী ও ঈনীর পায়ের ছাপ মরুর বালিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও এমন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে যে, ঈনীকে জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাসউদ একা একা পদচিহ্ন ধরে গিয়ে আবার ফিরে এলো। কি দেখে এসেছে ওদেরকে তা জানালো। মরুভূমিতে পায়ের ছাপ লুকানো অবম্ভব ব্যাপার।

'ওরা তা হলে বেশি দূরে যায়নি'! মাসউদের এক সঙ্গী বললো, আর অত দূরে যেতেও পারবে না... আচ্ছা! ওদের সঙ্গে পানি ছিলো কিনা বলো তো বিন সামির!'

না, পানি ওদের কাছে কোত্থেকে আসবে? আমরা তো সাগর সবে পেরিয়ে এসেছি'। বিন সামির বললো।

'চলো বিন সামির! আমাদের গন্তব্য ভিন্ন হলেও প্রথমে আমরা চেষ্টা করবো তোমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে।' মাসউদ বললো।

বিন সামির মাসউদের দুই সঙ্গীর সাহায্যে কিছু দূর ধীরে ধীরে হেঁটে গেলো। ততক্ষণে সূর্যের উত্তাপে চারদিক উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। এই উত্তাপ্ত বিন সামিরকে যেন প্রাণ ফিরিয়ে দিলো। সে কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে লাগলো। তার সৈনিকের শরীর। কষ্টসহিষ্ণু দৈহিক কাঠামো তার। দু' তিনবার সে আহত অবস্থায় পায়দল সফরও করেছে। এজন্য দেখা গেলো, সে দ্রুত নিজের শক্তি ফিরে পাচ্ছে।

বিন সামিরের দুই বেঈমান সঙ্গীর পদচিহ্ন ধরে ওরা অগ্রসর হচ্ছে। কিছু দূর যাওয়ার পর শক্ত জমিন পড়লো। কোথাও সমতল এলাকা। কোথাও অসমতল এলাকা। আবার কোথাও জমি হঠাৎ করে নিচে নেমে গেছে। আবার মাটি ফুড়ে বেরিয়ে এসেছে ছোট ছোট টিলা। গোলক ধাঁধার মতো ব্যাপার। তবে পদচিহ্ন সবখানেই স্পষ্ট। নিয়মিত কোন রাস্তা না থাকলেও ওদের পদচিহ্ন ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো ওদের। তবু প্রচণ্ড সহ্যক্ষমতা নিয়ে ওরা এগিয়ে চললো। সামনে পড়লো ছোট-খাট একটা উপত্যকা। যার চার দিক উঁচু উঁচু পাচিলের মত পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এর ভেতরেও ছোট ছোট কয়েকটি টিলা আছে। ওরা একটি প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরা পরস্পরের সাহায্যে প্রাচীরের ওপর ওঠে গেলো। সবার আগে মাসউদের এক সঙ্গী ওপরে উঠলো।

'আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করেছেন।' সে সঙ্গী বললো, 'ওপরে এসে দেখো, বেহেশত আমাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।'

সবাই ওপরে উঠে দেখলো, মাইল দূয়েক দূরে খেজুর বৃক্ষের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে ওটা মরুদ্যান। ওদের ক্লান্তি তিনভাগের এক ভাগ কমে গেছে। হাঁটার গতিও গেছে বেড়ে। সূর্য চলে যাচ্ছিলো তার অস্তাচলে।

মরুদ্যানের কাছে গিয়ে দেখা গেলো, মরুদ্যানের চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আরবরা জানে, প্রাকৃতিকভাবেই মরুদ্যানের চারদিক এভাবে কুদরতী হাতে দেয়ালের মতো পরিবেষ্টন করে থাকে। অনারবরা দেখে বলবে, এটা কোন নিপুণ কারিগরের কীর্তি।

হঠাৎ নারী চিৎকার ভেসে এলো ওদের কানে।

ওরা প্রাচীরের ওপর উঠে দেখলো, ঈনী আরেক দিকের চালু প্রাচীর বেয়ে নিচে নামছে। আর দুই ষণ্ডা তাকে পেছন থেকে তার দুই বাহু ধরে ফেললো।

'বদমাশের দলেরা ওই যে,' বিন সামির দাঁতে দাঁত পিষে বললো।

মাসউদ ও তার দুই সঙ্গী দৌড়ে প্রাচীর বেয়ে নিচে নেমে ঈনীকে ধরে ওদের হেফাজতে নিয়ে নিলো। বিন সামিরের দুই গাদ্দার বন্ধু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো, এই মেয়ে ওদের। কেউ ওদের কাছ থেকে তাকে নিয়ে যেতে পারবে না। বিন সামির প্রাচীরের ওপর থেকে বললো, 'না। এ তার ঈনী, তার স্ত্রী।'

মাসউদ ও তার সঙ্গীরা খঞ্জর বের করে বললো, 'খবরদার যা বলবো তাই শুনবে তোমরা। এখানেই বসে যাও। একটুও নড়ার বা চালাকি করার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে।'

ওরা তো নিরস্ত্র। ওরা বোবা বনে গেলো। সে অবস্থাতেই বসে পড়লো। মাসউদ ঈনীকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে বললো,

'শোন বোন! ওরা তোমাকে নিয়ে কি করেছে বলো আমাদেরকে।'

'ওখানে ওরা কি কবেছে তা তো বিন সামিরের মুখ থেকেই শুনে থাকবেন আপনারা। আর এখানে এনে আমাকে বেইজ্জতী করেছে।' ঈনী বললো প্রচণ্ড ঘৃণার সুরে।

মাসউদ তার বন্ধুদের দিকে তাকালো। একজন বললো, এক শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। এটা শুনতেই বিন সামিরের দুই সঙ্গী ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে উঠলো। কিন্তু কেউ ওদেরকে পাত্তা দিলো না। মাসউদ ও তার দুই সঙ্গী মিলে একজনকে মাটিতে ফেলে দিলো। দু'জন তার হাত ও পার শক্ত করে ধরলো।

তারপর মাসউদ তার খঞ্জরটি ঈনীকে দিয়ে বললো,

'খঞ্জর দিয়ে ওর বুকের মাঝখানে আঘাত করো। তারপর ওর পেটও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলো।'

ঘৃণায় লজ্জায় ঈনীর শরীর কাঁপছিলো। মাসউদের কতা শেষ হওয়ার আগেই পুরো শক্তি দিয়ে খঞ্জরটি সে লোকের সেখানেই মারলো মাসউদ যেখানটার কথা বলেছিলো। তারপর ওরা দ্বিতীয়জনকে মাটিতে ফেলে দিলো। সে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছিলো।

'আমাকে বেইজ্জত করার সময় আমিও এভাবে চিৎকার করে তোদের দয়া ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কিন্তু... কথা শেষ করার আগেই ঈনী ওকেও একইভাবে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো।

ঈনী যেন উন্মাদিনী হয়ে গেছে। তার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে। সে তার বেইজ্জতীর বদলা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এরপরও ওদের মৃত দেহে সে একের পর এক আঘাত করেই চললো। বুক-পেট আঘাতে আঘাতে একাকার করে দিলো। চোখ-মুখও ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়লো। মাসউদ ঈনীকে বাঁধা না দিলে সে ওদেরকে কিমা বানিয়েও ক্ষান্ত হতো না।

তারপর বিন সামিরকে জড়িয়ে ধরলো। বিন সামিরও ঈনীকে তার বুকে নিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। দু'জনের কান্নার রোল দেখে মাসউদ ও তার সঙ্গীদের চোখ ছলছল করে উঠলো।

মরুদ্যানের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাকা একটি ঝর্নাধারা বয়ে গেছে। ঝর্নাধারার টলটলে পানি গিয়ে জমা হচ্ছে ছোট একটি জলাশয়ে। বিন সামির ঈনীকে নিয়ে জলাশয়ে চলে গেলো। তার হাত-পা এমনকি সারা দেহ রক্তে মাখা-মাখি হয়ে আছে। একটি আড়াল নিয়ে ঈনী বিন সামিরের সাহায্যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে লাগলো।

সবাই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আগে তৃপ্তিভরে পানি পান করে নিলো। পুরো মরুদ্যানে অগনতি খেজুর বৃক্ষ। ওরা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলে আছে। কিছু কিছু খেজুর গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করেছে। আর অধিকাংশটিই কাঁচা এখনো।

তিন আরব তিনটি গাছে চড়ে বসলো। গুচ্ছ খেজুর পেরে নিচে ফেলতে লাগলো। তারপর আলগা কিছু খেজুরও পারলো।

বিন সামির ও ঈনী ওদের কাছে শুতে গেলে মাসউদ বাঁধা দিলো ওদেরকে। ওরা যেন একটু আড়াল নিয়ে ঘুমায়। কারণ ওরা স্বামী স্ত্রী। ওরা একটু দূরে সরে গিয়ে কয়েকটি গাছের আড়ালে শুয়ে পড়লো।

এই দু'দিনের ঘটনায় ঈনী এতই ভীত ছিলো যে, ঈনীর ঘুম আসছিলো না। বিন সামিরের অবস্থাও ছিলো তথৈবচ।

'ওদের প্রতি কি তোমার বিশ্বাস আছে?' ঈনী বিন সামিরকে জিজ্ঞেস করলো।

'এখন আমি কিছুই বলতে পারবো না। বিন সামির বললো অনিশ্চিত গলায়। 'আমার আফসোস হচ্ছে, সাগরে ঝাপিয়ে পড়ার সময় আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিলো না। তবে এরা যদি কোন ঝামেলা করে তাহলে প্রথম সুযোগেই ওদের থেকে খঞ্জর ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবো।'

ঘুমের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছিলো বিন সামিরের চোখে। কিন্তু বিন সামির সে পাহাড় সরিয়ে প্রাণপণ জেগে থাকতে চেষ্টা করছে। ওর চিন্তা হলো, স্বধর্মের এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যখন ঈনীর সঙ্গে এমন আচরণ করতে পেরেছে। আর এরা তো মুসলমান– অপরিচিত।

ঈনীর মতো সুন্দরী মেয়েকে দেখে কেই বা ঠিক থাকতে পারবে। ঈনীও বিন সামিরের মতো সজাগ থাকতে চাচ্ছে। ওদিকে মাসউদ ও তার সঙ্গীরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

তবে মাঝ রাতের আগেই ওরা ঘুমের কাছে পরাজিত হলো। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। আচমকা এমন কিছু আওয়াজ ভেসে এলো যেন কিছু লোক লড়াই করছে আর চিৎকার চেচা-মেচি করছে। বিন সামির ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসলো।

সবার আগে তাকালো তিন আরবের দিকে। ওরা এমন গভীর ঘুমে রয়েছে যে, বজ্রপাতেও ঘুম ভাঙ্গবে না। বিন সামিরে ভীত চোখ গেলো উদ্যানের ঢালু প্রাচীরের ওপর। কয়েকটি মরু শৃগাল তার মৃত সঙ্গীদের লাশ নিয়ে রীতিমতো উল্লাস করছে। খাচ্ছে লাফাচ্ছে চিৎকার করছে।

ওরা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো আবার। আরো অনেক পর আযানের শব্দে বিন সামির ও ঈনীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। এক আরব প্রচীরে দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছিলো।

'শুয়ে পড়ো এখন ঈনী! এরা এখন নামায পড়বে।' বিন সামির বললো।

দু'জনে আবার গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলো। সূর্যোদয়ের পর মাসউদ ওদেরকে জাগিয়ে বললো, তাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ওরা সঙ্গে যেতে চাইলে রওয়ানা হয়ে যাক।

'আমরা একা একা তো কোথায় যেতে পারবো না। তোমাদের গন্তব্য পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকবো। তারপর সামনে এগিয়ে যাবো।' বিন সামির উঠে বসতে বসতে বললো।

'তোমার গন্তব্য কোথায়?' মাসউদ জিজ্ঞেস করলো।

বিন সামির সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলো না। ঈনীর দিকে তাকালো। তারপর মাথা নামিয়ে ফেললো। যেন মাসউদের প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তার। মাসউদ আবার জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি কি তোমার নিজের গন্তব্য সম্পর্কেও জানো না?' মাসউদের এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা তোমাদেরকে বাধ্য করবো না। মাসউদ বললো, চাইলে তুমি তোমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারো। আর বোঝাই যাচ্ছে, এ এলাকা তোমাদের কাছে অপরিচিত। আমাদের সঙ্গী হতে যদি প্রয়োজনবোধ করো তাহলে আমরা সানন্দে তোমাদেরকে সঙ্গী করে নেবো। আর না হয় এখান থেকেই তোমাদেরকে বলে দিবো আলবিদা।'

'তোমাদের ব্যবহারে আমরা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছি যে, আমি কি উদ্দেশে কোথায় যাচ্ছিলাম তা তোমাদেরকে বলে দিই। আমি কট্টর ঈসায়ী। এক ঈসায়ী আরেক ঈসায়ীর

বিরুদ্ধে সামান্য সমালোচনাও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমার ঐ বন্ধু দু'জন আমার বিশ্বাসের ভিতটাই টলিয়ে দিয়েছে। ওরাও ছিলো পাক্কা ঈসায়ী। আমাদের মনে দুটি জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরা ছিলো। এক রোমী। দ্বিতীয় মুসলমান। আমরা কিতবী ঈসায়ী। আমাদের ধর্মীয় নেতা বিনিয়ামীন।'

'তুমি হয়তো ভুলে গেছো, জাহাজে তুমি আমাকে একজন ঈসায়ী ভেবে তোমার মিশনের কথা বলে দিয়েছিলে। তুমি শামে যাচ্ছিলে। কিন্তু সমুদ্র ঝড় তোমাকে তোমার গন্তব্য থেকে অনেক দূরে এনে ফেলেছে। তুমি যাচ্ছিলে শামের ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিতে।'

'হ্যাঁ, আমি এ উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আর যাবো না।'

'কেন? কেন যাবে না এখন? তুমি যদি আংশকা করে থাকো যে, তোমাকে আমরা এ কারণে কতল করে ফেলবো, তা হলে তোমাকে এ আশংকা থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যেতে পারো। আর চাইলে আমাদের সঙ্গে মদীনায়ও যেতে পারো। তারপর সেখান থেকে তোমাদের শামের পথে উঠিয়ে দেবো। আমাদের সাহায্যের যদি প্রয়োজন বোধ করো তা হলে সবরকম সহযোগিতা পাবে।'

বিন সামিরের জন্য এ প্রস্তাব ছিলো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। কারণ, তিন মুসলমান ওদেরকে এখানে ছেড়ে গেলে আর কোনদিন কোন লোকালয়ে পৌঁছুতে যে পারবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত ওরা। অর্থাৎ এখানেই একদিন এসে উপস্থিত হবে ঘাতক মৃত্যু।

সেখান থেকে মদীনা তো অনেক দূর। মাসউদ ও তার সঙ্গীরা গোয়েন্দা। চন্দ্র ও সূর্যের গতিবিধি দেখে পথ চেনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো ওদেরকে। এ ছাড়া মরু-ভেদের খবর তো জানতোই ওরা।

আসলে বিন সামিরের মনের অবস্থা এখন বাতাসে নিভু নিভু দীপশিখার মতো।

মাসউদ ও তার দুই সঙ্গী বিন সামিরের মানসিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। এজন্য ওকে ও ঈনীকে সঙ্গী করে নিতে আপত্তি করলো না।

সফরের প্রথম রাত ওদের যাপন করতে হলো খোলা আকাশের নিচে। বিন সামির ও ঈনী ওদের তিনজন থেকে বেশ দূরত্ব রেখে শোয়ার ব্যবস্থা করলো। এই রাতটাও ওদের ভয়ে ভয়ে কাটলো। আসলে বিন সামিরের বিশ্বাস হচ্ছিলো না, দুনিয়াতে এমন উঁচু চরিত্র মাধুরীর মানুষও থাকতে পারে যারা এমন রূপসী মেয়েকে দেখেও নির্বিকার থাকতে পারে। কিন্তু এ রাতটিও নিরাপদই কাটলো।

এর পরের রাত এক লোকালয়ের কাছে কাটলো ওরা। লোকালয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার-পানীয় ওরা নিয়ে নিয়েছিলো। এতে বাকি পথ ওদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

এরপর আরো দু'রাত ওরা খোলা আকাশের নিচে কাটালো। বিন সামিরের মন থেকে এখন সে শংকা দূর হয়ে গিয়েছে। সে তো দেখছিলোই ঈনীর ব্যাপারে এ তিনজনের কোন আগ্রহই নেই।

তবে বিন সামিরের ব্যাপারে মাসউদ কিছুটা আগ্রহী। মাসউদ চেষ্টা করছিলো ওর মনে চেপে থাকা কথা বের করতে। মিসর, মিসরের কিবতী ঈসায়ী এবং রোমী ফৌজের ব্যাপারে বিন সামির এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলো যেন সেও মুসলমান এবং সেও চায় মিসরে মুসলমানরা হামলা করুক।

একদিন সে স্পষ্ট করে বললো, রোমী ফৌজের মধ্যে আগের সেই শক্তি ও সাহস নেই। দীর্ঘ যুদ্ধের চাপ ও অগণিত পরাজয়ে ওদের দমও শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এজন্য মুসলমানরা যদি মনে করে রোমীরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে ময়দান ছেড়ে পালাবে তা হলে ভুল করবে। কারণ, রোমী জেনারেলরা তাদের ফৌজে সেই পূর্বের শৌর্যবীর্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। তারা এখন তলিয়ে দেখছে, মুসলমানদের জয়ের আসল কারণ কী আর রোমীয়দের পরাজয়েরও বা কী কারণ?

অবশেষে ওরা মদীনায় পৌছে গেলো। মদীনায় পৌছে ইবনে মাসউদ বিন সামিরকে জিজ্ঞেস করলো, সে এখন কোথায় যাবে?

'কোথাও নয়।' বিন সামির জবাব দিলো, আমি আমার মনযিলে পৌছে গেছি। আমি এখানে এসেছি এ আশায় যে, আমাকে ও ঈনীকে ইসলামে যেন দীক্ষিত করা হয়।'

'তা হলে আরো ভেবে-চিন্তে দেখো। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তোমাকে তোমার গন্তব্যের পথে পৌছে দেয়া হবে।' মাসউদ বললো।

'মাসউদ ভাই! আসলে আমি তোমাদের তিনজনের অন্তরঙ্গ ব্যবহার ও নির্মল চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি শুনেছিলাম, আরবরা চরম জাহেল– মূর্খ। ইসলাম এসে তাদেরকে জ্ঞান-গরিমা ও মানবতার শীর্ষ আসনে পৌছে দিয়েছে। বাস্তবেও এর প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমি পেয়েছি। এখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে, ঈনী যদি সম্পূর্ণ একাও তোমার হাতে পড়তো তবু তুমি আমার বন্ধুদের মতো ব্যবহার করতে না ওর সঙ্গে। ও থাকতো একেবারেই নিরাপদ।'

বিন সামির ও ঈনীকে মাসউদরা তাদের সালারের কাছে নিয়ে গেলো। বিন সামিরের পুরো ঘটনা শোনালো সালারকে। সালার বিন সামির ও ঈনীকে ইসলামে দীক্ষিত করে নিলেন। তারপর মাসউদকে দায়িত্ব দিলেন ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা দিতে।

বিন সামিরের কাছ থেকে মাসউদ মিসরের রোমী ফৌজ ও কিবতীদের সম্পর্কে যে তথ্য জোগাড় করেছে তা তার সালারকে জানালো। মুসলিম প্রশাসনের জন্য এ ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য। তাই কালবিলম্ব না করে সে তথ্য আমীরুল মুমিনীনের কাছে পৌছে দিলেন মাসউদের সালার।

✪ ✪ ✪

মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে বহু মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। তাদের শূন্য স্থানগুলো ধীরে ধীরে পূরণ করার চেষ্টা চলছে সর্বক্ষণ।

এ দিকে হযরত আমর ইবনে আস (রা) এর ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়ছিলো। সময় বড় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির আগে তিনি আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাই এখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারির প্রকোপ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমর ইবনে আস (রা) হযরত উমর (রা) এর কাছে পয়গাম পাঠালেন, যাতে মিসর অভিযান শুরু করার অনুমতি চেয়েছেন তিনি।

তিনি পয়গামে লিখেছেন, মিসর থেকে যে সংবাদ আসছে এ থেকে এ আংশকা দিন দিন প্রকট হচ্ছে যে, আমরা কালবিলম্ব করলে হেরাকল পুণরায় শামে হামলা চালাবেন। অথবা তাজা সংবাদ অনুযায়ী শামের ঈসায়ী গোত্রগুলোকে বিদ্রোহ করতে উস্কে দেয়া হবে। আর বিদ্রোহ হলে মুজাহিদদের বিদ্রোহ দমনে নামতে হবে। তখন নিশ্চিতভাবে হেরাকল হামলা চালাবেন। আর এর পরিণাম পরাজয় ছাড়া কিছুই হবে না।

উমর (রা) এ পয়গাম পেয়ে আগের চেয়ে আরো অধিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার কাছেও মিসরের তাজা তাজা খবর, হেরাকল ও কিবতীদের মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য আসছিলো। আমর ইবনে আস (রা) এর মতো তিনিও একই ধরনের শংকায় ভুগছিলেন।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি অবশেষে আমর ইবনে আসের কাছে জবাবী পয়গাম পাঠালেন। পয়গাম নিয়ে গেলেন ঐতিহাসিক কাসেদ শরীফ ইবনে আবদাহ্‌। আমর ইবনে আস (রা) তখন ফিলিস্তীনের একটি কেল্লা অবরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি পয়গাম খুলে দেখলেন, উমর (রা) পয়গামে লিখেছেন,

'মহামারির করালগ্রাস আমাদের লশকরের অনেক তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।
তাই ফিলিস্তিনের মুসলসানদেরকে বলুন তারা যেন আপনার ফৌজে যোগ দেয়...

স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যারা মুসলিম লশকরে যোগ দিলো, উমর (রা) তাদেরকে নিয়মিত ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন এবং তাদের জন্য ভাতারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমর ইবনে আস (রা) এ হুকুমের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি অবরোধের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) এর হাতে। সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলেন।

তিনি সময় অপচয় করতে চাচ্ছিলেন না। তাই দ্রুত কিছু লশকর জমা করলেন। তার নিজস্ব লশকর থেকেও কিছু সৈন্য নিলেন। তারপর কোচ করলেন। এ লশকরের সংখ্যা ছিলো সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার। এতে ঘোড় সওয়ারই ছিলো বেশি।

রওয়ানা হওয়ার আগে আমর ইবনে আস (রা) হযরত উমর (রা) কে ফিরতি পয়গাম পাঠালেন কাসেদ শারীফ ইবনে আবদাহের মাধ্যমে। তাতে লেখা ছিলো, আমর ইবনে আস (রা) ফিলিস্তিন ও শাম থেকে সেনা সাহায্য নিতে চান না। কারণ, এসব এলাকার প্রতিরোধ শক্তি এতে দুর্বল হয়ে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। মদীনা থেকে সেনা সাহায্য পাঠানো হোক। যারা তার সঙ্গে মিসরের পথে যোগ দিবে।

তিনি পূর্ণ আশাবাদী ছিলেন। মদীনা থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য সেনাসাহায্য পেয়ে যাবেন। আর যে সেনা নিয়ে তিনি যাচ্ছেন এরা নদী পেরিয়ে গিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াতে পারবে কি না এরও কোন নিশ্চয়তা নেই।

আমর ইবনে আস (রা) অতি দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। এর কারণও ছিলো। তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন, মদীনা ও কেন্দ্রীয় খেলাফতের যারা এ মিসর অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন তারা আগের চেয়ে আরো সরগরম হয়ে উঠেছেন। হযরত উমর (রা) কে চাপ সৃষ্টি করছেন, তিনি যেন তার এ হুকুম প্রত্যাহার করেন।

তাদের মধ্যে সবার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন হযরত উসমান (রা)। হযরত উমর (রা) এর পরই হযরত উসমান (রা) সাহাবা কেরামের মধ্যে সবচেয়ে শীর্ষ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে আমীরুল মুমিনীন যে কোন সময় এ অভিযান স্থগিত করে দিতে পারেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, আমর ইবনে আস (রা) এর এ আশংকা ভুল ছিল না। উসমান (রা) এ অভিযানের খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন হযরত উমর (রা) এর কাছে।

'খোদার কসম! আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো এ ধরনের ভুল করার লোক ছিলেন না কখনো। এ সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) বললেন, আপনার এ হুকুম ভুল এবং যাকে আপনি এ হুকুম দিয়েছেন তিনি সঠিক লোক নন।'

উমর (রা) হতভম্ব হয়ে উসমান (রা) এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি হয়রানির চরম সীমানায় পৌছে যাচ্ছিলেন যে, আমর ইবনে আস (রা) এর মতো সিপাহসালারকে তিনি বেঠিক লোক বলে মন্তব্য করছেন।

'খোদার কসম, ইবনে খাত্তাব! উসমান (রা) বললেন, 'আমর ইবনে আস (রা) এর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর মতো

নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনিও খালিদ (রা) এর মতো নিজেকে এবং পুরো লশকরকে বিপদের মুখে ফেলে দেন। এজন্যই তাকে এ অনুমতি দেয়া উচিত হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমর (রা) বিত্তশালী খান্দানের ছেলে। নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে স্পষ্ট। তৃতীয় ব্যাপার হলো, মিসরের পরিস্থিতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। তিনি যে সেনা নিয়ে গেছেন তাও যথেষ্ট নয়। আর এ সেনাদলে এমন মূল্যবান কিছু মুজাহিদও আছে যারা একের পর এক বিজয় অর্জন করে রোমীয়দের শাম থেকে বের করে দিয়েছে। আর এখন আপনি ও আমর ইবনে আস (রা) দু'জন মিলে এসব বিজয়ী গাজিয়ানে ইসলামকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন!'

হযরত উমর (রা) এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় পড়ে গেলেন যা তার স্বভাব বিরোধী। তিনি তো যে কোন ফয়সালা অত্যন্ত পরিষ্কার ধীর-স্থির মস্তিষ্কে করতেন। কিন্তু তাকে এবার এ চিন্তা আরো অধিক পেরেশান করে তুললো যে, হযরত উসমান (রা) এর মতো ব্যক্তিত্বই যদি তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় অটল থাকেন তা হলে অনেকেই নাখোশ হবেন। তার মতো এমন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব আরো কয়েকজন মিসর অভিযানকে আত্মঘাতী মনে করছিলেন। এই প্রথম তিনি কোন ব্যাপারে এমন কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন।

তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে ফয়সালা করলেন, আমর ইবনে আস (রা) কে ফিরিয়ে আনা হোক। পয়গামের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো এরকম।

'আমার এ চিঠি যদি আপনি মিসর সীমান্ত অতিক্রম করার আগে পেয়ে যান তা হলে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে যাবেন। আর যদি মিসর সীমান্তে ঢুকে পড়ে থাকেন তা হলে অব্যহত রাখুন সম্মুখে চলার গতি। সে ক্ষেত্রে আমি সেনা সাহায্য পাঠিয়ে দেবো।'

কাসেদ শরীফ ইবনে আবদাহ্ এ পয়গাম নিয়ে গেলেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো যত দ্রুত সম্ভব এ পয়গাম আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে পৌঁছে দিবে।

কাসেদ শরীফ ইবনে আবদাহ্ যখন আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে পৌঁছলেন তিনি তখন 'রাফহা' নামক স্থানে। তিনি সমুদ্রের তীর ধরে খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছিলেন। এর কারণ হলো, তিনি আশা করছিলেন, হযরত উমর (রা) এরই মধ্যে সেনাসাহায্য পাঠিয়ে দিবেন। সেনাসাহায্য এলেই তিনি সেনাদলের যাত্রা দ্রুততর করবেন।

কাসেদের হাত থেকে আমর ইবনে আস (রা) পয়গাম তো নিলেন কিন্তু সেটা তিনি পড়লেন না। রহস্যজনকভাবে সেনাদলের চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আর চলতে চলতে কাসেদের কাছ থেকে মদীনার নানান খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

অবশেষে আমর (রা) এর ফৌজ 'রাফহা' থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলো। তিনি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গ্রাম কোন সীমান্তে পড়েছে। লোকেরা বললো, এটা মিসর সীমান্তে পড়েছে। তখনই তিনি পয়গাম খুলে পড়লেন এবং তার সালারদের শোনালেন। বললেন, সবাই দেখে নাও, আমীরুল মুমিনীন হুকুম দিয়েছেন, মিসর সীমান্তে প্রবেশ করে থাকলে তোমরা তোমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে।

তিনি জবাবী পয়গাম পাঠালেন যে, তার লশকর মিসর সীমান্ত পেরিয়ে গেছে তাই সেনাসাহায্য যেন পাঠানো হোক।

আমর ইবনে আস (রা) পরে তার সালারদের বললেন, তিনি যখন দেখলেন, কাসেদ শুধু পয়গাম নিয়ে এসেছে, সঙ্গে কোন সেনাসাহায্য নেই তখনই বুঝে গিয়েছিলেন পয়গামের বিষয়বস্তু কি হতে পারে? কারণ, তিনি হযরত উমর (রা)-এর দূরদৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কে জানতেন। এ কারণেই তিনি তখন পয়গাম খুলে দেখেননি।

তাদের সামনে ছিলো 'আরীশ' নামক একটি স্থান। মাঝারি ধরনের একটি শহর আরীশ। আমর ইবনে আস (রা) শহরটি অবরুদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এটা দেখে হয়রান হয়ে গেলেন যে, সেখানে রোমী ফৌজের একজন সিপাহীও নেই। মুজাহিদরা শহরে প্রবেশ করে শহর নিজেদের দখলে নিয়ে নিলো।

আরো ৭০ মাইল দূরে এ ধরনেরই 'ফারমা' নামক আরেকটি শহর আছে। আমর ইবনে আস (রা) খুব আনন্দিত ছিলেন যে, তিনি রোমীয়দের অজান্তে একটি শহর নিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তী শহরটিও এভাবেই জয় করে নিবেন। সেনাসাহায্য যে এখনো পৌঁছেনি এজন্য তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না।

কিন্তু এ ছিলো হযরত উমর (রা) এর ভুল ধারণা। তার লশকর মিসরের সীমান্তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস ও জেনারেল আতরাবুনের কাছে এই খবর পৌঁছে যায়।

শাসনকর্তা মুকাওকিস জেনারেল আতরাবুনকে পরামর্শ দিলেন, 'আরীশ' থেকে 'ফারমা' পর্যন্ত ৭০ মাইল এলাকা মরু অঞ্চল। মুসলমানদেরকে মরু এলাকায় পরাজিত করা যাবে না। তাই ওদেরকে আরো এগিয়ে আসতে দেয়া হোক।

জেনারেল আতরাবুন মুকাওকিসের এ পরামর্শ মেনে নিলেন এবং আরীশ থেকে রাতারাতি পুরো ফৌজ সরিয়ে 'ফারমা' শহরে একত্রিত করলেন। তারপর এ শহরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করে তুললেন।

আমর ইবনে আস (রা) তো নির্ভার মনে তার যৎসামান্য মুজাহিদ দল নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এ শহর জয় করে এ অভিযানের যারা বিরোধী তাদের সিদ্ধান্তের ভুল প্রমাণ করবেন। কিন্তু তাকে বলার মতো কেউ ছিলো না যে, রোমীয়রা তার জন্য মরণ ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে।

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আস যত নির্ভার মনেই থাকুন না কেন কিন্তু তার চলার গতি ছিলো অত্যন্ত সতর্ক। একে তো সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার। তারপর এখনো সেনাসাহায্য পৌঁছারও কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া এখন কিছুটা ভারমুক্ত হলেও তিনি এতটা আশা করছেন না যে, রোমী ফৌজের সঙ্গে তার লড়াই হবেই না। তাই তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিলো সতর্কতাপূর্ণ।

সত্তর মাইল দীর্ঘ মরুপ্রান্তর। মুজাহিদীনে ইসলাম উটের মতো স্বচ্ছন্দে মরু বিয়াবান পাড়ি দিচ্ছে। রোমী শাসক মুকাওকিস ঠিকই বলেছিলেন, মরু অঞ্চলে মুসলমানদের পরাজিত করা সহজ কাজ নয়।

বিশ্রামের জন্য প্রথম তাঁবু ফেলা হলো। কিন্তু মদীনা থেকে কোন সেনাদল এলো না। তবে হলব থেকে হাদীদ তার স্ত্রী এবং হেরাক্লিয়াসের কন্যা শারীনাকে নিয়ে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে পৌঁছলো।

পর দিন মদীনা থেকে আরেক অভিজ্ঞ গোয়েন্দা মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কী ওখানে পৌঁছে গেলো। এর সঙ্গে ছিলো, ফাহাদ বিন সামির ও তার স্ত্রী ঈনী। বিন সামির ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় ফাহাদ বিন সামির। কিন্তু ঈনী তার নাম পরিবর্তন করেনি।

মাসউদ ইবনে সুহাইলকে মদীনা থেকে মিসরে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য পাঠিয়েছেন আমীরুল মুমিনীন। মিসরের ব্যাপারে তার বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে। গুপ্তচর হিসেবে এর আগে কিছু দিন মিসরে কাটিয়ে গেছে মাসউদ। ইসলাম গ্রহণের পর ফাহাদ বিন সামির ও ঈনীকে মদীনাতেই রাখা হয়। তাদের জন্য কিছু ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখনো কোন কাজে তাকে লাগানো হয়নি। যেকোন দায়িত্ব দেয়ার আগে সে কতটা নির্ভরযোগ্য সেটা আগে দেখা জরুরী ছিলো। কিন্তু কর্মহীন সময় তাকে অস্থির করে তুলছিলো। সে কয়েকবার বলেছেও রোমীদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযানে সে যেতে রাজি। এমনকি গুপ্তচরবৃত্তির ঝুঁকিপূর্ণ কাজও সফলতার সঙ্গে করতে পারবে। মিসর

সম্পর্কে তো তার বেশ অভিজ্ঞতা ছিলোই। যে এলাকায় আমর ইবনে আস (রা) যাচ্ছেন সে এলাকাও তার যথেষ্ট চেনা।

তারপর মাসউদের মিসর রওয়ানার খবর শুনে কাউকে না বলে ঈনীকে সঙ্গে নিয়ে তার সফরসঙ্গী হয়ে গেলো। কারো কাছ থেকে তার কোন হুকুম নেয়ার প্রয়োজনও ছিলো না। পথে খুব কম তাঁবু ফেলে ওরা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে পৌছে যায়।

আমর ইবনে আস (রা) এর আরবের মধ্যে মিসর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানাশোনা ছিলো। বহু বছর ধরে তিনি মিসর নিয়ে সীমাহীন আগ্রহ লালন করে গেছেন মনে মনে। বিশেষ করে উত্তর মিসরের ব্যাপারে তো তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তা ছাড়া তার ব্যক্তিগত গোয়েন্দা সবসময় তিনি মিসরে নিয়োজিত রাখেন। এভাবে কিবতী ঈসায়ীদের আসকাফে আজম বিনিয়ামীনের সঙ্গে একটা যোগসূত্রও গড়ে উঠে।

এখন মাসউদ ও হাদীদের মতো অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও দুঃসাহসী নৈশ হামলাকারীকে পেয়ে তিনি গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। ওদের মেধা ও দক্ষতা সম্পর্কে আমর (রা) সম্যক অবগত। তবে ফাহাদ বিন সামির তার জন্য একেবারে নয়া লোক ছিলো। মাসউদ ফাহাদের পরিচয় সংক্ষেপে আমর (রা) কে জানালো। আর ফাহাদের জজবা আবেগ দেখে তিনি ওর ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) তার সালারদের কাছে ডেকে সে তিন গোয়েন্দার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে 'ফারমা' থেকে তার গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে এলো 'ফারমা' শহরে আমাদের চেয়ে রোমী সেনাদের সংখ্যা দ্বিগুণ।

আমর ইবনে আস (রা) আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাসউদ ইবনে সুহাইলকে ফারমা পাঠালেন। সালারদেরকে তিনি আরো জানালেন, দুই গোয়েন্দাকে বিনিয়ামীনের কাছে পাঠানো হয়েছে। তারা বিনিয়ামীনকে অনুরোধ করবে, কিবতী ঈসায়ীদেরকে যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে না লড়ায়। বরং গোপনে যেন মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করে।.

'তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের সেনা সংখ্যায় কত কম।' আমর ইবনে আস (রা) বললেন, 'কোন শহর আবরোধ করার জন্য আমাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রসদপত্রও নেই। তারপরও আমরা এপর্যন্ত এসে গেছি ,অথচ এখনো সেনাসাহায্য পৌঁছেনি। আর আমি নিজের এই জটিলতাকে সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি যে, আমীরুল মুমিনীনকে আমি এ অভিযানের জন্য এক প্রকার জোর করে রাজি করিয়েছি এবং তাঁকে এই আশ্বাসও দিয়েছি যে আমি এতে সফল হবো। তাই আমি যে কোন মূল্যে সফল হতে চাই।'

'সফল আমাদের হতেই হবে।' এক সালার বললেন, 'যদি আমরা ব্যর্থ হই তা হলে আমরা শুধু অপদস্থই হবো না আমীরুল মুমিনীনকেও তার উপদেষ্টাদের সামনে লজ্জিত করবো। যে বিষয়ে এখনো তিনি তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন।'

'মিসর জয় বা পরাজয় আমার জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।' আমর ইবনে আস (রা) বললেন, 'ব্যর্থ হলে আমি আর জীবিত মদীনায় ফিরবো না। কারণ, জীবিত ফিরলে মিসর হামলার বিরোধীদের সামনে আমি কখনো মুখ দেখাতে পারবো না। যার মধ্যে আমার প্রিয় ও বুযুর্গ সাহাবী হযরত উসমান (রা)-ও আছেন।...

'দেখো আমরা এতদূর চলে এসেছি যে, আমাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ ভরসাকে পাথেয় করে এসেছি আমরা এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করবেন। শর্ত হলো, দৃঢ় সংকল্প ও নেক নিয়ত থাকতে হবে। কোন না কোন পথ নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।'

'আপনি কি এমন কোন পথের কথা ভেবেছেন?' ফাহাদ বিন সামির জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, ভেবেছি।' আমর (রা) বললেন, 'আর এ পথ তুমি ও হাদীদ খুলতে পারবে... সবার আগে আমাদের প্রয়োজন রসদ।... আনাজ তরকারি আর গোশত... এজন্য কিছু সেনা সেসব এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে যেখানে বিপুল পরিমাণে সব্জির মজুদ আছে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রামে হামলা করবে। শুধু খাদ্যশস্য আর গরু-বকরি, উট আনা হবে। কারো কোন ক্ষতি করা চলবে না। তবে এতে আমাদের সেনা সংখ্যাও কমে যাবে।'

'তা হলে দুআ করুন সেনাসাহায্য যেন এসে যায়। এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' এক সালার বললেন।

'আমার মনে হয় অপেক্ষা না করাই ভালো হবে।' আমর (রা) বললেন, 'এখন যখন দুশমন জেনে ফেলেছে আমরা তাদের সীমানায় ঢুকে একটি শহরও দখল করে নিয়েছি। এখন তো ওরা যে কোন মূল্যে আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়বে শিগগিরই। আর আমাদের অপেক্ষার অর্থ হলো, দুশমনকে প্রস্তুতি গ্রহণের অধিক সময় দেয়া। আমি অন্য আরেকটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছি।'

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বাটলারসহ মুসলিম ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন। সেই ব্যবস্থা ছিলো এরকম, যেখানে এ মরুভূমি শেষ হয়েছে সেখান থেকে সবুজ শ্যামল এলাকা শুরু হয়েছে। এর মাঝামাঝি এলাকার আবাদিতে দূরদূরান্ত পর্যন্ত বেদুইন গোত্রগুলো বাস করে। এরা ঈসায়ী হলেও ধর্মীয় রীতি নীতি এদের ভিন্ন। ভিন্ন ওদের সমাজ ব্যবস্থাও। সন্দেহ নেই, ওরা হেরাক্লিয়াসের সরকারি ঈসায়ীর যেমন বিরোধী তেমনি ওরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিও। যুদ্ধ বিষয়ক কলাকৌশলও ওরা বোঝে। সিপাহসালার আমর (রা) চাচ্ছিলেন, এদেরকে হাত করে নিলে রসদপত্র ওদের দ্বারা সংগ্রহ করা যাবে অনায়াসে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) বেদুইনদের কথা তুলতেই ফাহাদ বিন সামির চমকে উঠে এক হাত উঠালো। যেন ওর কোন কথা মনে পড়েছে।

'সিপাহসালার!' ফাহাদ বিন সামির বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা চাইলে এ থেকে একটা পথ নিশ্চয় বের হবে। আমি রোমী ফৌজের সঙ্গে এসব এলাকায় থেকেছি। ওদের সামাজিক প্রথা-পার্বন ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জানা আছে আমার। পাঁচ ছয় দিন পর চাঁদের তৃতীয় তারিখ পড়বে। এ দিন ওরা এক উৎসবে মেতে উঠবে। আমি ও হাদীদ সেদিন ওখানে থাকবো।'

✪ ✪ ✪

ইস্কান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়) বসে বসেই মুকাওকিস ও আতরাবুন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে প্রতিদিনই খবর পেয়ে যাচ্ছেন মুসলমানদের। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এটা জেনে গেছেন যে, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা শুধু কমই নয় বরং সেনাসাহায্যেরও কোন নাম নিশানা নেই।

মুকাওকিস প্রথম থেকে বলে আসছেন, সামান্য লড়াইতেই এ গুটি কয়েক মুসলমান খতম হয়ে যাবে। আর লড়াই না হলে ওরা খাবারের অভাবেই মারা যাবে। হয়তো এর আগেই ওরা হাতিয়ার ফেলে আত্মসর্পণ করবে এবং বলবে আমাদেরকে খাবারের কিছু দাও।

যেসব এলাকায় খাদ্যশস্যের প্রচুর মজুদ রয়েছে গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সেসব এলাকায় রোমী ফৌজ পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং হুকুম হলো, মুসলমানরা যদি খাদ্যশস্য নিতে হামলার জন্য আসে তা হলে সেখানেই তাদেরকে খতম করে দিতে হবে।

সিপাহসালার আমর (রা) এর সামনে যে বড় ভয়ংকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তা তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। আরেকজন দ্রুতগামী কাসেদ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন যে, তারা এখন আর সেনাসাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে পারছে না।

ইতিমধ্যে মাসউদ ইবনে সুহাইল মাক্কী ফারমা থেকে ফিরে এলো। মাসউদ জানালো, মুকাওকিস ও আতরাবুন ফারমাতে হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছেন, মুসলমানরা শহর অবরোধ করতে চাইলে তাদেরকে সে সুযোগ দিবে না। বাইরে বের হয়ে ওদের ওপর হামলা করে করে পিছু হটে আসবে। যাতে ধীরে ধীরে ওদের সেনা সংখ্যা তলানিতে গিয়ে পৌছে। কারণ ওদের সাহায্যার্থে আর কোন সেনাদল আসবে না।

ফারমা শহর এক পাহাড়ি এলাকায় বিস্তৃত। শুধু পাহাড় প্রাচীরই এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নয়; বরং পুরো শহর অনেকগুলো কেল্লা দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে কারণে অবরোধকারীদের জন্য এ শহর ভয়ংকর এক শত্রু।

ফারমা শহরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত শক্ত হওয়ার পেছনে কারণও রয়েছে। এ শহর ফেরাউনের আমল থেকেই প্রসিদ্ধ। তদানিন্তন সময়ে এর নাম ছিলো পুলুয। যে এলাকায় ফারমা শহর অবস্থিত সেখানে নীলনদের প্রবাহ সাতটি শাখায় প্রবাহিত হয়েছে। এর একটি প্রশাখার নাম পুলুনি। এ নামেই তখন সেই শহরের নাম হয় পুলুয। পরে কোন এক সময় এর নাম হয় ফারমা।

এ এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাটি বেশ উর্বর। শস্য ও ফল ফলাদির জন্য এ এলাকা অতি বিখ্যাত। তাই এই শহরের অধিবাসীরাও বেশ অবস্থাসম্পন্ন। এখানকার আঙ্গুর ও আঙ্গুরের তৈরি শরবত তো পৃথিবী বিখ্যাত। আজও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

✪ ✪ ✪

আজ চাঁদের তৃতীয় তারিখ। কমপক্ষে হাজার তিনেক বেদুইন এক জায়গায় বসে আছে। জায়গাটি একটি উপত্যকার মতো ঢালু। ফারমা থেকে অনেক দূরে, যেখানে মরুভূমি শেষ হয়ে এসেছে সেখানে কোথাও কোথাও সবুজের সমারোহ দেখা যায়। এই উপত্যকা অঞ্চলও এমনই একটি জায়গা।

বর্ষা মৌসুমে এ উপত্যকা পানিতে ভরে যায়। তারপর তিন চার মাস পর পানি শুকিয়ে যায়। তবে পানির কল্যাণে বিশাল জমি জুড়ে সবুজ ঘাসের সমারোহ গজে উঠে। কিছু বৃক্ষলতাও গজিয়ে উঠে। বেদুইনদের কাছে এ ধরনের সবুজ উপত্যকা বেশ পবিত্র স্থান। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে তারা এখানে এসে একত্রিত হয়। এমনি একটি উৎসবে ওরা আজ এখানে সমবেত হয়েছে।

সমবেত বেদুইনদের মাঝখানে একটি বিশালাকায় গরু দেখা যাচ্ছে। যার ধূসর রঙা শিংগুলোকে নানান রঙে রঙ্গিন করা হয়েছে। গরুটির গায়ে সবুজ চমকদার কাপড় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মশালের আলোয় সেই কাপড়ের চমকে কেমন রহস্য সৃষ্টি করেছে। হালকা বাতাসে যখন কাপড়টি দুলে উঠে তখন আরো অদ্ভুত লাগে দেখতে। গরুর ক্ষুরে এমন কোন পদার্থ লাগানো হয়েছে, মশালের আলোয় সেটাও চমকে উঠে কেমন রহস্য সৃষ্টি করেছে। আর গরুর গলায় পরানো হয়েছে মরু ফুলের হার।

বিশ বাইশ জন যুবতী একই ধরনের পোশাক পরে গরুটির চারদিকে নৃত্য করছে। মেয়েগুলোর পোশাক খুব সংক্ষিপ্ত। ঢোল-তবলা আর শানাই বাজছে। মেয়েদের এ নৃত্য বেশ গোছালো এবং ছন্দময়। যেন অদৃশ্য কেউ তাদের এ নৃত্য পরিচালনা করছে।

সুশৃঙ্খল সুন্দর উপস্থাপনায় তারা দেহভঙ্গি প্রদর্শন করে নৃত্য করছে। তালে লয়ে কোন ছন্দপতন ঘটছে না। নৃত্য চলছে বাজনার তালে তালে। বাজনার মধ্যেও কেমন এক অচিন সুর মন বিহ্বল করা তরঙ্গ আছে। তিন হাজার বেদুইন যেন এর চুম্বকীয় নেশায় বুঁদ হয়ে গিয়েছে।

নৃত্যের তালে তালে গরুটিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করলো ওরা। তারপর একটি মেয়ে নৃত্যরত মেয়েদের বৃত্ত থেকে নাচের মুদ্রা তুলে বেড়িয়ে এলো এবং গরুটির সামনের দিকে চলে গেলো। তারপর গরুর মুখে চুমু খেয়ে আবার মেয়েদের বৃত্তে চলে এলো। তারপর সে মেয়ের পেছনের মেয়েও তাই করলো। এভাবে একে একে সবাই গরুর মুখে চুমু খেলো। বৃত্ত এখন একটি সারি হয়ে গেছে। সারিবদ্ধ হয়েই মেয়েরা ওখান থেকে চলে গেলো।

শেষ মেয়েটি মশালের আলোর বাইরে চলে যাওয়ার পর মৃদু সঙ্গীতের বাজনা তীব্র হয়ে উঠলো। শানাই-তবলার তালও উচ্চ লয়ে উঠলো। এ আসলে রক্ত উত্তেজক যুদ্ধ সঙ্গীতের বাজনা।

এক দিক থেকে বিশজনের একটা বেদুইন দল সারিবদ্ধ হয়ে নাচের সে স্থানে এলো যেখানে মেয়েরা এতক্ষণ নৃত্য করছিলো। ওরাও মেয়েদের মতো গরুটিকে প্রদক্ষিণ করে নাচ শুরু করলো।

পুরুষালী এ নাচ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলো। প্রত্যেকের এক হাতে নাঙ্গা তলোয়ার আরেক হাতে ঢাল। তলোয়ারগুলোকে এমন বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাচ্ছে যে, একেকটা তলোয়ারকে কয়েকটা করে মনে হচ্ছে। নাচ আর সঙ্গীতের সুর-তাল এমন মোহ সৃষ্টি করেছে যে, দর্শকের শরীর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নৃত্যরত পুরুষদের প্রত্যেকের হাতের তলোয়ার এক রকম। কেবল দুটি হাতের তলোয়ার একটু ভিন্ন ধরনের। এরা দু'জন নৃত্যদলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এলো। একজন গরুর ঘাড়ের এক পাশে আরেকজন গরুর আরেক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে দুই নাচনেওয়ালী মেয়ে বড় দুটি থালা নিয়ে ঘুরে এলো।

তখনই ডান পাশে দাঁড়ানো বেদুইনটি পুরো শক্তিতে তলোয়ার দিয়ে গরুর ঘাড়ে আঘাত করলো। গরুর অর্ধেক ঘাড় কেটে গেলো। পর মুহূর্তে অপর পাশে দাঁড়ানো বেদুইন দ্বিতীয় আঘাত করলো। বড় একটি থালার মধ্যে ছিন্ন মস্তকটি পড়ে গেলো।

গরু একদিকে পড়ে যাচ্ছিলো, নাচের দুই বেদুইন মটকার মতো বড় একটা পাত্র নিয়ে দৌড়ে এলো। সেটি গরুর ঘারের কর্তিত স্থানে জোর করে চেপে ধরলো। যাতে এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে পড়ে নষ্ট না হয়। নাচের বেদুইনরা নাচ বন্ধ করে সবাই এসে তীব্র বেগে ছটফট করতে থাকা গরুটিকে ধরে তাবুতে নিয়ে গেলো।

এ রক্ত ওদের কাছে পবিত্র ও বড় বরকতের জিনিস। পুরো বেদুইন গোষ্ঠী ছোট ছোট পেয়ালায় করে এ রক্ত নিয়ে যাবে। বড় বড় পানির মটকায় মিশিয়ে রাখবে। ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস হলো, এর দ্বারা সব ধরনের কঠিন রোগ সেরে যায়। দুধ বিহীন প্রাণীর থলে দুধে পূর্ণ হয়ে যায়। ঘরে রাখলে প্রেতাত্মা সে ঘরে উঁকিও দেয় না।

যখন গরুর মস্তকটি ছিন্ন হলো তিন হাজার বেদুইন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে শ্লোগানের মতো কি যেন বলতে লাগলো। এ সময় ওদের ধর্মীয় 'পেশওয়া' দাঁড়িয়ে গরুটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সবাই আবার নীরব হয়ে গেলো।

'পবিত্র রক্ত বরকতময় হোক!' একটু দূর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এলো। 'তোমাদের কুরবানী (বলিদান) কবুল হয়েছে। খোদার আওয়াজ শোন, যিনি সূর্যকে উত্তাপ ও চাঁদ তারাকে আলো দান করে থাকেন।'

বেদুইন 'পেশওয়া' যেখানে ছিলো ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পেছনে কয়েকজন বেদুইন সরদার ছিলো ওরাও দাঁড়িয়ে পড়লো। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে সে দিকে ঘুরে তাকিয়ে রইলো। পুরো বেদুইন গোষ্ঠীও ওদিকে দেখতে লাগলো।

আওয়াজটি এসেছে উপত্যকার এক দিকের উঁচু ঢাল থেকে। লোকেরা সব দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। দাঁড়ানোর কারণে মাটিতে রাখা মশালের আলো সেদিকে পৌঁছুতে পারছে না। 'পেশওয়া' লোকদেরকে সামনে থেকে সরে যেতে বললো।

তখনই ঢালের প্রান্তে ধবধবে সাদা অবয়বের কোন মানুষের আকৃতি দেখা গেলো। সেদিকে সরাসরি আলো না পৌঁছাতে কেমন ধোয়াটে লাগছে। এর মধ্যেও দেখা গেলো অবয়বটির দু' পাশে দু'টি লাঠি স্থাপিত। লাঠি দু'টির মাথায় প্রায় এক বিঘত করে কাপড় পেচানো। লোকটির গায়ে বিশাল আলখেল্লা। মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো সাদা রোমাল। ধবধবে রোমাল আর আলখেল্লা যেন আকাশের তারার মতো চমকাচ্ছিলো। লোকটির বাহু দুটি একটু সামনের দিকে ঝুকিয়ে ডানে বামে ছড়িয়ে রাখা।

কেউ কাছে গিয়ে দেখলে বুঝতো, এ ওদের মতোই আল্লাহর এক বান্দা। কিন্তু তাদের পেশওয়ার সে সাহস ছিলো না যে, এগিয়ে দেখবে আসলে ঘটনা কি। এরা কল্পনার পূজারী লোক। চিন্তা-ভাবনার গভীরতা বলতে ওদের কিছুই ছিলো না। জমিনের আশ্চর্যজনক কিছু দেখলেই ওরা সেটাকে কোন রূহানী বা আসমানী জিনিস মনে করতো।

ওরা একে কোন প্রেতাত্মা বা জিন-ভূতও মনে করছে না। ওদের বিশ্বাস মতে মানুষকে ক্ষতিকারক জিনিস কালো পোশাকের এবং কালো বর্ণের হয়। একে তো সবাই দেখছে চাঁদের মতো সাদা।

পুরো উপত্যকা জুড়ে এমন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে যেন ওখানে কোন প্রাণী নেই।

'ভয় পেয়ো না তোমরা'! আবার ঢালের প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে এলো।

'তোমাদের মতোই আমি একজন মানুষ। খোদা পাঠিয়েছেন। খোদার পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমাদের জন্য এনেছি আলো।'

সবাই দেখলো তখনই তার ডান দিকে প্রথমে তারপর বাম দিকে মশাল জ্বলে উঠলো। সবাই দেখলো মশাল কেউ জ্বালায়নি। সে লোকও জ্বালায়নি। তার দু' হাত সেভাবেই দু দিকে ছড়িয়ে আছে। সেখানে কেউ নেইও যে মশাল জ্বালাবে। বিস্ময়ে বেদুইনদের মুখ হা হয়ে গেলো। কল্পনার পূজারীদের কল্পনার জানালা যেন আরো দ্বিগুণ হয়ে খুলে গেলো। সরদার, 'পেশওয়া' সবার একই অবস্থা হলো।

'খোদার পয়গাম খোদার দূতের মুখে শোন!' আলখেল্লা পরা লোকটি বললো।

বলেই সে অতি ধীর পদক্ষেপে ঢালু প্রান্ত থেকে উপত্যকার দিকে নামতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো তার পা যেন মাটিতে লাগছে না। নিচের দিকে ভেসে আসছে। দু' দিকের মশালের আলো আরো রহস্যময় আবহ সৃষ্টি করছিলো সেখানে। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে একটি নারী-মূর্তির অবয়ব স্পষ্ট হতে লাগলো। যেন তার অস্তিত্ব থেকেই মেয়েটি বেরিয়ে আসছে।

নারী-মূর্তি পুরোপুরি স্পষ্ট হওয়ার পর সবার কাছে মনে হলো, এ মর্ত্যলোকের মানবী নয়। এমন অপরূপা নিস্পাপ আর ঐশ্বর্যময় চেহারা ওরা আর কখনো দেখেনি। ওর পুরো দেহ রেশমী কাপড়ে আবৃত।

'তোমাদের কুরবানী কবুল হয়ে গিয়েছে।' মেয়েটি দু'হাত দু' দিকে প্রসারিত করে বললো,

'সাবধান হও সবাই। রক্তের তুফান আসছে। তোমাদের দুগ্ধদানকারী জানোয়ারগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের অনেককেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু খোদার হুকুম পালন করলে তিনি তোমাদেরকে বাঁচাবেন। আগামীকাল তোমাদের কাছে তিনজন লোক আসবে। ওরা আসবে উটে সওয়ার হয়ে। খোদা ওদেরকে ইশারা দিয়ে দিয়েছেন। ওরা যা বলবে খোদায়ী পয়গাম মনে করবে। আর না হয় তোমাদের পবিত্র গরুর রক্ত বৃথা যাবে। তোমাদের ধ্বংস কেউ রুখতে পারবে না।... তোমাদের কাছে খোদায়ী পয়গাম পৌঁছে গেছে। আমি আকাশে খোদার কাছে ফিরে যাচ্ছি।'

আলখেল্লা পরা লোকটি যে ঢালুতে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ধীরে ধীরে উল্টো পায়ে পেছন দিকে চলে যেতে লাগলো। মেয়েটিও ওর পেছনে যেন ওরই অস্তিত্বে মিশে যাচ্ছিলো। দুই মশালের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটি। মেয়েটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। সবাই নিশ্চিত হলো, আকাশের দূত আকাশে ফিরে গেছে।

'এই মশাল সারারাত এখানে জ্বলবে।' লোকটি বললো গর্জন করে।' 'এটা খোদায়ী রোশনী। কাল সকালে এসে এগুলো এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ শুধু কুরবানীর রাতে জ্বালাবে। আমরা যাচ্ছি। সকাল পর্যন্ত কেউ যেন এ দিকে না আসে। কেউ আসলে তার ওপর আসমানী বিজলী পড়বে।'

সে উল্টো পায়ে ঢালের পেছনে এমনভাবে নেমে গেলো যে, দর্শকদের মনে হলো, সে উপত্যকার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বেদুইনরা তখনো তাকিয়ে রয়েছে সেদিকেই।

'তোমরা ভয় পেয়ো না।' ধর্মীয় পেশওয়া নিস্তব্ধতা ভেঙে বললো, 'এ খোদয়ী ইশারা। সৌভাগ্যবান সে জাতি, যারা এমন পবিত্র ইশারা পেয়ে থাকে। উৎসব করো নতুন করে। কাল যারা আসবে ওদের কাছ থেকে আরো কিছু খোদায়ী কথা জেনে নেয়া যাবে।'

✪ ✪ ✪

আরবদের মেধা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার কথা স্বীকার করেছে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও দার্শনিকরাও। তারা এক বাক্যে স্বীকার করেছে, তারা যদি তাদের মেধার মূল্যায়ন করতো তা হলে পুরো বিশ্বকে ওরাই শাসন করতো।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) ওদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, বেদুইনদেরকে ওদের দলে ভেড়াতে। ফাহাদ বিন সামির, মাসউদ ইবনে সুহাইল ও হাদীদ তিনজন এ বিষয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলো।

মাসউদ ও হাদীদ তো আরবের বেদুইনদের ব্যাপারে জানতো। ওরা তো জানে না, মিসরের বেদুইনদের ধ্যানধারণা সম্পূর্ণই ভিন্ন। এটা ওদেরকে জানালো ফাহাদ।

হেরাকল ওদেরকে পাইকারী হত্যা এবং মিসর থেকে বের করে দিয়ে বলেছেন, মিসর থাকতে পারবি এক শর্তে, ওরা যেন মিসরি ফৌজে যোগ দেয়। এসব হুমকি ওদের মোটেই ভীত করতে পারলো না। এমনকি হুমকি দমকির পথ ছেড়ে লোভ লালসার পথও ধরলেন হেরাকল। বেদুইনদেরকে কিছুতেই গালাতে পারলেন না। হেরাকল জানেন, ওদেরকে হামলা করেও মরুভূমিতে রোমীরা শুধু মারই খাবে। ওদের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারবে না।

এসব জানিয়ে হাদীদ বললো, ওদেরকে এভাবে কেউ নিজের দলে ভেড়াতে পারবে না। তবে ওরা কল্পনার পূজারী। এই ওদের দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানো যায়।

এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে ওরা এক কৌশলের আশ্রয় নিলো। শারীনা অসম্ভব রূপবতী হলেও ঈনীর বয়স কম হওয়াতে ঈনীর রূপ-তেজদীপ্ততা আরেকটু প্রখর ছিলো। ঈনীকেই আকাশ থেকে পয়গাম নিয়ে আসা হুর হিসেবে মানাবে।

এ নাটকের জন্য একজন লক্ষভেদী তীরন্দায প্রয়োজন। যার তীর কখনো ভ্রষ্ট হয়নি। দূর থেকে সম্পূর্ণ ধনুক টেনে তীর ছুড়লে তা লক্ষভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু ধনুক সামান্য টেনে খুব কাছের কোন কিছুতে লক্ষভেদ করা মুশকিলের ব্যাপার। অতি বড় দক্ষ তীরন্দাযই তা করতে পারবে। ওরা এমন একজন তীরন্দাযও পেয়ে গেলো।

ওরা আগে ওদের নাটকের রিহার্সেল দিলো অনেক বার। তারপর সময় হলে ফাহাদের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলো। ফাহাদ ওদেরকে এমন এলাকা দিয়ে নিয়ে গেলো যা রুক্ষ এবং কঠিন পথ। এখান দিয়ে কেউ পথ অতিক্রম করে না। এখান দিয়ে যাওয়াতে সেই উপত্যাকার কাছে গিয়ে লুকানোর জায়গাও পেয়ে গেলো ওরা। ওরা ঘোড়ায় না গিয়ে উটে চড়ে গেলো। কারণ, উট নিঃশব্দে চলতে পারে।

চাঁদের তৃতীয় তারিখে ওরা উপত্যকার পেছনের ঢালে এসে উপস্থিত হলো। ওদেরকে দেখার মতো কেউ ছিলো না। বেদুইনরা এসে সমবেত হলো। উৎসব শুরু হলো। বেদুইন তরুণীরা যখন নাচতে শুরু করলো তখন মাসউদ মশালের লাঠি দু'টি নিয়ে এগিয়ে গেলো বসে বসে। যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। বেদুইনদের জটলার দিকে তাকালো। নিশ্চত হলো, সবাই উৎসবে এতই মগ্ন যে, কেউ ওকে দেখছে না। মাসউদ মশালের লাঠি দুটি নিশ্চিত মনে স্থাপন করলো। মাসউদের পরনে সাদা আলখেল্লা, মাথায় সাদা পাগড়ী এবং এর ওপর সাদা রোমাল। ফাহাদ ওকে বলে দিয়েছে যখন গরুর গর্দান সম্পূর্ণ কাটা হবে তখনই তার আসমানী দূতের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এর মধ্যে সবাই এসে পালা করে বেদুইনদের উৎসব দেখে গেলো। তারপর যখন গরুর গর্দান কাটা হলো তখন মাসউদ দুই নিভানো মশালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো। মাসউদ যখন ঢালের প্রান্তে দাড়াঁলো তখন ঈনী ওর পিঠের সঙ্গে প্রায় লেগে দাঁড়িয়ে গেলো। ঈনীকে এদিক দিয়ে দিয়ে কেউ দেখতে পেলো না।

মাসউদ সফলভাবে তার রোল পূর্ণ করলো। তখনই তীরন্দায এক বারুদী তীর পালা করে দুই মশালের দিকে ছুরে মারলো। মশাল তেলে ভেজানো ছিলো, সঙ্গে জ্বলে উঠলো।

তার পর ঢালের প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। আর ঈনী তার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু মনে হচ্ছিলো, এই মহাপুরুষের অস্তিত্ব থেকে এক নারী মূর্তির অস্তিত্ব বিকাশ লাভ করেছে। এ ছিলো মশালের আলোর সৃষ্ট করা দৃষ্টিভ্রম।

ঈনী তার রোল সফলতার সঙ্গে শেষ করলো। মাসউদ উল্টো পায়ে ঢালের প্রান্তে চলে গেলো এবং ঈনী তার পেছনে ঢাকা পড়লো।

কল্পনার পূজারী বেদুইনরা মনে করলো, ঈনী অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সেই পুরুষকেও ওরা এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো।

✪ ✪ ✪

পরদিন বেদুইনদের ধর্মীয় 'পেশওয়া' ও চার পাঁচজন সরদার সেই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে চারদিকে দেখছিলো। গত রাতে আসমানী রূহ বলে গেছে, তিনজন লোক উট সওয়ার হয়ে ওদের কাছে আসবে। অনেক বেদুইন দূরদূরান্তে দাঁড়িয়ে তিন উট সওয়ারের পথ পানে তাকিয়ে ছিলো।

অবশেষে একজন আকুল হয়ে বলে উঠলো, 'ঐ যে আসছে... তিনজনই ... ওরা এসে গেছে... নিশ্চিত ওরাই হবে... উট সওয়ারই তো।' বেদুইনরা দেখলো তিন উট সওয়ারকে আসমানী দূত হয়ে তারা নেমে আসতে শুরু করলো।

মাসউদ, হাদীদ ও ফাহাদ দেখতে দেখতে ওদের কাছে পৌছে গেলো। ওরা উট থেকে স্বাভাবিকভাবে না মেনে উট থেকে লাফিয়ে নামলো। পেশওয়া ও সরদাররা ছুটে এসে ওদেরকে বড় উষ্ণ আবেগে সংবর্ধনা জানালো।

'আমরা তোমাদেরই প্রতিক্ষায় ছিলাম।' বেদুইন পেশওয়া বললো, 'আমরা নিশ্চিত তোমরা তারাই যাদের ব্যাপারে গত রাতে আসমানী রূহ খোদায়ী পয়গাম দিয়ে গেছেন। তিনিই কি তোমাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি তোমাদের পরিচয় বলে গিয়েছিলেন, তোমরা উটে সওয়ার হয়ে আসবে।'

'আমরা জানি না, তোমরা কিভাবে কি পয়গাম পেয়েছো!' মাসউদ বললো, 'আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের সিপাহসালার। স্বপ্নে তিনি খোদায়ী ইশারা পেয়েছেন যে, ঐ মরু অঞ্চলে এক জাতি থাকে, যাদের অবস্থা এতটা স্বচ্ছল নয় যে, ওরা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। যাও সেই জাতিকে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। ওদের ভালোমন্দের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় নিয়ে নাও। সিপাহসালার স্বপ্নে তোমাদের যে নিশানা দেখেছেন তা আমাদের বলেছেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন এ জায়গাটা হুবহু সেরকমই এবং তোমাদের বেশভূষাও তার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

গত রাতে কি দেখেছিলো এবং তাদেরকে কিভাবে খোদায়ী পয়গাম দেয়া হয়েছে এক বৃদ্ধ সরদার তা সবিস্তারে ওদের তিনজনকে শোনালো।

'আমরা এর আগে জানতাম না তোমরা কাল রাতে কি দেখেছো'? মাসউদ বললো, 'আমরা কেবল জানি আমাদের সিপাহসালার স্বপ্নে কোন পয়গাম পেয়েছেন সেটা তোমরাও পেয়েছো।'

কাছেই বেদুইনদের পেশওয়ার তাঁবু রয়েছে। পুরো তাঁবু চামড়ার তৈরী। তাঁবু বেশ বড়। সবাইকে তাঁবুর নিচে নিয়ে যাওয়া হলো। ওরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তাদের সিপাহসালার কোথায়?

মাসউদ জানালো কোথায় আছে ওদের সিপাহসালার। তিনি আরীশ জয় করেছেন ইতোমধ্যে।

'তোমরা কি মুসলমান?' এক সরদার জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান। আগে বলো মুসলমানদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি?' মাসউদ ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

বেদুইনদের বৃদ্ধ সরদার এর যে জবাব দিয়েছে ইতিহাসে তা আজও সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, বৃদ্ধ সরদার বলেছেন,

'বিস্ময় জাগে এটা ভেবে যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে, যার বলে নগণ্য সংখ্যার সৈন্য নিয়ে বিশাল বিশাল ফৌজকে ময়দান থেকে উৎখাত করছে? আর যেদিকেই রুখ করেছে সফলতা ওদের পায়ে চুমু খেয়েছে।'

'এতে হয়রান হওয়ার প্রয়োজন নেই' মাসউদ বললো, 'এটা খোদায়ী শক্তি। এ শুধু তার পক্ষ থেকেই আসতে পারে। যারা এ শক্তির অধিকারী হয় তাদের অন্তর জুড়ে থাকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তারা দুর্বলদের ওপর হাত উঠায় না। অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করে না। অসহায় কাউকে নিজেদের অধীনস্থ বানায় না।'

এ দলের আমীর মাসউদই বিস্তারিত বলে যাচ্ছে। মাসউদ আরবের দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কথা উল্লেখ করলো। এটাও উল্লেখ করলো, এই মহামারিতে পাঁচ হাজার লোক মারা গেছে এবং মুসলমানদের অর্ধেক ফৌজ মহামারির শিকার হয়েছে।

'তোমরা এটা ভেবে দেখো'? মাসউদ বিস্তারিত সব শুনিয়ে বললো, 'এ অবস্থায় হেরাকল যদি শামে হামলা চালাতেন তা হলে সহজেই মুসলমানদের পরাজিত করে আবার শাম ফিরিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ ছিলো খোদায়ী শক্তির নিদর্শন যে, হেরাকল হামলার সাহসও করতে পারলেন না। আমাদের সিপাহসালার এটা চিন্তাও করেননি যে, এ ভয়াবহ মহামারি থেকে বাঁচার জন্য তিনি মদীনায় চলে যাবেন। তারপর তিনি এতে আক্রান্তও হন এবং মারাও যান।'

মাসউদ এটাই বুঝাতে চাচ্ছে যে, এতো বড় বিপদের পরও মুসলমানরা মনোবল হারায়নি। তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সঙ্গে লড়াই করেছে এবং আজ ওরা মিসরে প্রবেশ করে আরীশের মতো শহর জয় করে নিয়েছে।

'এখন আমাদেরকে বলো তোমরা আমাদের জন্য কি পয়গাম নিয়ে এসেছো? আর আমাদেরকে কি করতে হবে?' পেশওয়া জিজ্ঞেস করলো।

'তোমাদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও কল্যাণকর পয়গাম নিয়ে এসেছি' মাসউদ বললো, 'তোমাদের মধ্যে যারা লড়াইয়ের যোগ্য তাদেরকে আমাদের সিপাহসালারের কাছে পৌছে দাও এবং আমাদের সিপাহসালারের নেতৃত্ব মেনে নাও... আমরা জানি শাহেনশাহ হেরাকলও তোমাদেরকে কোন এক সময় এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো তোমরা'। ধর্মীয় পেশওয়া বললো, 'কিন্তু এখন তোমাদের কথা শুনে এবং এর আগে মুসলমানদের ব্যাপারে আমরা যা শুনেছি এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, হেরাকল ও তোমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। হেরাকল এতই ক্ষমতা-প্রিয় হয়ে উঠেছেন যে, ধর্মকেও নিজের সম্পত্তি মনে করে বিকৃত করে ফেলেছেন। তার বিকৃত ধর্ম কেউ গ্রহণ না করলে তাকে কতল করে দেয়া হয়। তিনি আমাদের হুমকি দিয়েছিলেন, আমাদের জোয়ানদের তার ফৌজে পাঠাতে হবে। কিন্তু তোমরা কোন হুমকি-ধমকি দিচ্ছ না। এজন্য আমরা তোমাদের কথা শুনবো এবং তোমাদেরকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দিবো না।'

মাসউদ ওদরেকে জানালো, ওদের জোয়ানরা এত মালে গনিমত পাবে যে, ওরা সবাই বিশাল সম্পদশালী হয়ে উঠবে। তাদেরকে আরো জানানো হলো, মুসলমানদের মধ্যে কখনো এমন ভেদাভেদ নেই যে, ফৌজের উচ্চপদস্থদেরকে মালে গনিমতের বড় বড় অংশ দেয়া হয় আর সৈনিকদেরকে দেয়া হয় নামমাত্র সামান্য কিছু। বরং সিপাহসালার থেকে নিয়ে সবার অংশ সমান। মাসউদ ওদেরকে আরো বললো, খোদার পক্ষ থেকে ওরা যদি কোন পয়গাম পেয়ে থাকে তা হলে তা অমান্য করার কোন দুঃসাহস যেন না দেখায়। তা হলে ওদের চতুষ্পদ প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শিশুরা অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

কিছু জরুরী বিষয় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর মাসউদরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

বেদুইনদের এ দলটি মুসলিম সেনাদলে যোগ দিতে আসছে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) এ খবর শুনে শুধু পেরেশানমুক্তই হলেন না খুশিও হলেন এবং ওদেরকে ওদের কৃতিত্বের জন্য প্রাণভরে বাহবা দিলেন। কিন্তু যখন ওদের নাটকের কথা শুনলেন তখন আচমকাই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। চোখ-মুখ হয়ে উঠলো গম্ভীর।

'যুদ্ধে দুশমনকে ধোঁকা দেয়ার রীতি ইসলাম সমর্থন করে?' আমর (রা) বললেন, 'কিন্তু এই ধোঁকা চলে যুদ্ধের ময়দানে। দুশমনের ফৌজকে সে ধোঁকায় ফেলা হয়। একে জঙ্গি চাল বা রণ-কৌশল বলা হয়। কিন্তু তোমরা সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়েছো, যা প্রশংসার যোগ্য নয়। তোমরা আমাকে পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছো ঠিক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার কাঁধে এমন এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছো যা থেকে কখনো মুক্তি পাবো কি না জানি না।'

'মাননীয় সিপাহ্সালার!' হাদীদ বললো, 'আমরা আপনাকে এই বোঝা থেকে মুক্ত করবো, আপনি যদি পথ বাতলে দেন। এখন তো আর এটা সম্ভব নয় যে, আমরা বেদুইনদের কাছে গিয়ে বলবো যে, ওরা যেন আমাদের সেনাদলে না আসে। আমরা যদি কোন ভুল করে থাকি তা হলে তা শোধরানোর পথ কী তা আমাদেরকে বলুন।'

'একথা আমি আমার সালার ও তাদের সেনা কর্মকর্তাদের বলবো' সিপাহ্সালার বললেন, 'ঐ বেদুইনদের যেহেতু ধোঁকা দিয়ে এখানে আনা হচ্ছে তাই ওদের হকের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। ওদের ধর্ম ও অন্যায় বিশ্বাসের প্রতি সামান্যতম হস্তক্ষেপ চলবে না। ওদেরকে মূর্খ ও পশ্চাদপদও মনে করবে না। মালে গনিমতের প্রাপ্য অংশ ওদেরকে দিতে হবে। ওরা যদি অবাধ্য হয় তা হলে ওদের অবাধ্যতার প্রতিও সম্মান জানাতে হবে। ওরা এ অবধ্যতাকে নিজেদের স্বজাতির সম্মান বলে বিশ্বাস করে। তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাবোধের হেফাজত করতে হবে।'

আমর (রা) সালারদের ডেকে বেদুইনদের ব্যাপারে সব কথা বললেন এবং হুকুম জারি করলেন, এ বেদুইনদেরকে মুজাহিদদের চেয়ে অধিক সম্মান দিতে হবে। ওদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আনতে চেষ্টা করো, তবে এখন নয়।

'চেষ্টার প্রয়োজন হবে না।' এক সালার বললেন, 'ওরা যখন সম্মান পাবে। গুরুত্ব পাবে এবং আমাদের ব্যবহার দেখবে তখন নিজেরাই মুসলমান হয়ে যাবে।'

প্রায় দু হাজার বেদুইন যোদ্ধা মুসলমানদের দলে এসে যোগ দিলো। ওদেরকে দেখে আমর (রা) খুশি হলেও পেরেশানমুক্ত হলেন না। আগে ওদের লড়াই ও শৃঙ্খলার সঙ্গে রণাঙ্গনে থাকার যোগ্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। যদি এদের অবাধ্যতা রণাঙ্গনেও থাকে তা হলে তো কমান্ডারের হুকুমের পরওয়া না করেই লড়তে শুরু করবে।

আমর (রা) কে এখন যেটা পেরেশান করছে সেটা হলো রসদ সমস্যা। গোয়েন্দা মাধ্যমে খবর এসেছে, প্রতিটি গ্রামে রোমী ফৌজ পৌছে গেছে। তাই তিনি তার সালারদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। সিদ্ধান্ত হলো। এ ব্যাপারে বেদুইনদের কাজে লাগানো হবে। আমর (রা) আগেই বেদুইনদের ছোট ছোট সেনাদলে বিভক্ত করে একজন করে কমান্ডার নিযুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে কামান্ডারের ওপর একজন মুজাহিদ অফিসার নিযুক্ত করে দিয়েছেন।

তারপর তিনি বেদুইন সরদারদের ডেকে রসদের কথা উঠালেন। অগ্রগামী সেনাদলের মধ্যে রসদের কি তীব্র প্রয়োজন তা ওদেরকে বুঝালেন যে, যদি খাবার-দাবারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি না থাকে তা হলে দুশমন এর পূর্ণ ফায়দা উঠাতে চাইবে।

বেদুইন সরদাররা স্বতস্ফূর্ত হয়ে রসদ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে নিলো। ওরা নিশ্চয়তা দিলো, মুসলিম সেনারা আর রসদের অভাব অনুভব করবে না।

'তবে একটা কথা মনে রেখো,' আমর ইবনে আস (রা) বললেন, 'খাদ্যশস্য, আর গোশত দানকারী প্রাণী আনার অর্থ হলো আনাজ তরকারি ও গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি আনা। কোন লুটপাট চলবে না। কোন মেয়ের দিকে ভুলেও দৃষ্টি নিক্ষেপ চলবে না। আমরা এসব ছোট ছোট গ্রাম নয় বড় বড় শহর জয় করতে এসেছি। আসল ধন-সম্পদ তো সেসব শহরে পাওয়া যাবে, যা থেকে তোমরা পূর্ণমাত্রায় অংশ পাবে।... আর মনে রেখো, প্রত্যেক গ্রামেই রোমী ফৌজ আছে। ওদের সঙ্গে লড়তে হবে। একটা রোমীকেও যেমন জীবিত ছাড়া যাবে না তেমনি গ্রামের কারো ওপর হাত উঠানো যাবে না।'

বেদুইনদের এ কাজ দেয়ার আরেকটি সুবিধা ছিলো, ওরা গ্রামগুলো চিনে এবং জানে কোথায় সব্জিজাত জিনিস অধিক পরিমাণে পাওয়া যাবে। যে বেদুইনদের কাছে ঘোড়া ছিলো না তাদেরকে ঘোড়া এবং কাউকে কাউকে উটও দেয়া হলো।

✪ ✪ ✪

মুসলিম সেনাদল এখন রসদের প্রতীক্ষায় ধীর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে। দিনভর সফরের পর সাময়িক তাঁবু ফেলা হলো রাতের বিশ্রামের জন্য। ফজরের নামাযের পরই আবার সফর শুরু হয়ে গেলো। মরুভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবুজের আনাগোনা এখন মাঝে মধ্যেই নজরে পড়ছে।

আরো একটা দিনের সফর শেষ করলো মুসলিম লশকর। একটু দূরেই একটি পানির জলাশয় পেলো মুজাহিদরা। মশকগুলো পানিতে ভরে নিলো। উট ও ঘোড়াগুলোকেও পানিতে ছেড়ে দিলো।

মাঝরাতের পর সান্ত্রীরা মুজাহিদদেরকে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। মুজাহিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। নিস্তব্ধ রাতে এমন আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো যেন দুশমন ঘোড়া ছুটিয়ে এ দিকে আসছে। মুজাহিদরা দ্রুত লড়াইয়ের জন্য

তৈরি হয়ে গেলো। আমর ইবনে আস (রা) সৈন্য বিন্যাসও করে ফেললেন। শত্রু দেশে যে কোন সময়ে হামলার আশংকা ছিলো। এতে অস্বাভাবিক কোন ব্যপার নেই।

ঘোড়ার এ তুফান কাছিয়ে এলো। এমন কিছু শব্দ শোনা যেতে লাগলো যা রোমীয়দের ভাষার সঙ্গে মিলে না। সিপাহসালার মশাল জালানোর নির্দেশ দিলেন। দেখতে দেখতে অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠলো। দেখা গেলো দুশমন নয়, বেদুইনদের দুটি যোদ্ধা দল।

মুজাহিদরা আনন্দ ধ্বনি দিতে শুরু করলো। কারণ, বেদুইনদের দল দুটি অসংখ্য গরু-মহিষ ভেড়া-বকরি-উট এবং আনাজ তরকারি নিয়ে এসেছে। আনাজ তরকারি উটের পিঠে করে আনা হয়েছে। ঘোড়ার দু' একটা গাড়িও এলো।

এ শুধু চার পাঁচটি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেসব গ্রামের রোমী ফৌজরা লড়াইয়ের সুযোগও পেলো না। কারণ, নৈশ হামলার মাধ্যমে বেদুইনরা ওদেরকে প্রথমে কচুকাটা করে। তারপর গ্রামবাসীকে বলে, নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত আনাজ তরকারি ও চতুষ্পদ জন্তু আছে সব এক জায়গায় একত্রিত করো। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কেউ ঝামেলা না করলে কারো ওপর হাত উঠানো হবে না এবং মেয়েদের দিকে চোখ তুলেও দেখা হবে না।

দেখতে দেখতে খাদ্য শস্যের বিশাল এক স্তুপ হয়ে গেলো এবং চতুষ্পদ জন্তুর এক পাল বনে গেলো।

প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সঙ্গে একজন করে মুসলিম কমান্ডার ছিলো। তারা গ্রামবাসীদেরকে জানিয়ে দিলো এসব জিনিস বেদুইনরা নিজেদের জন্য নিচ্ছে না; বরং সেনাদলের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। যারা মিসর জয় করতে এসেছে। তাদের উদ্দেশ্যে সফল হলে তোমাদের এসব জিনিসের বিনিময় তারা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ যদি রোমী ফৌজকে সহযোগিতা না করো তা হলে শত্রুর সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় তার সঙ্গেও তেমন আচারণ করা হবে।

'ফারমা' এখন আর বেশি দূরে নয়। আমর (রা) এর রসদের সমস্যাও মিটে গেছে। বেদুইনদের অন্যান্য ব্যাটালিয়ানও সফলতার সঙ্গে রসদপত্র যোগান দিতে লাগলো। এভাবে এই পরিমাণ রসদ জমা হয়ে গিয়েছে যে, অনেক দিনের জন্য আর রসদের চিন্তা করতে হবে না। এর দ্বারা বেদুইনরা একটা জিনিস প্রমাণ করলো, তারা বিশ্বস্ত। সঠিক পথ নির্দেশনা পেলে বিপজ্জনক অবস্থায়ও ওরা বিশ্বস্ত থাকবে।

ফারমা পৌঁছার আগে মুসলমানরা শেষবারের মতো তাঁবু ফেললো। সিপাহসালার আমর (রা) সালারদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসলেন। বেদুইনদের যে ব্যাটালিয়ান করা হয়েছে তা কি বহাল থাকবে না ভেঙে ফেলা হবে। সালাররা পরামর্শ দিলেন, বেদুইনদের এভাবে ভিন্ন দলে না রেখে মুসলিম সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ, ওরা অমুসলিম হওয়াতে যেকোন সময় রোমী ঈসায়ীদের অধীনস্ততা মেনে নিতে পারে। তাই বেদুইনদেরকে পুরো বাহিনীতে ছড়িয়ে দিলে এ আশংকা আর থাকবে না।...

তাই করা হলো।

এরপর আমর ইবনে আস (রা) সেনাদের উদ্দেশ্যে জরুরী এক ভাষণ দিলেন। ভাষণের চুম্বকীয় অংশ ঐতিহাসিকরা লিবিদ্ধ করেছেন। আলফ্রেড বাটলার লিখেছেন, আমর ইবনে আস (রা) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্য বলেন,

'আমরা এখন মিসরের সেই পথ ধরে যাচ্ছি, যা পৃথিবীর অতি প্রাচীন পথ। আরব থেকে যত নবী-রাসূল মিসর আগমন করেছেন সবাই এ পথ ধরেই আগমন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ), ইয়াকুব (আ), ইউসুফ (আ), ঈসা (আ) এর পুরো খান্দান এ পথেই মিসর এসেছেন। হযরত মুসা (আ) এ পথ ধরেই ফেরাউনের জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। এ শহরের পাশে বয়ে যাওয়া নীল দরিয়া এখনো নীলই আছে। ফেরাউন– দ্বিতীয় রেমিসেসের পিছু ধাওয়ার পর মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলকে এ নীল দরিয়াই পথ করে দিয়েছিলো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছার জন্য। এ পথ অত্যন্ত পবিত্র। এ পথ আমাদের আম্বিয়া গণের। এটা মনে করো না, আমরা কোন দেশ জয় করতে এসেছি। এতো আমাদেরই পবিত্র ভূমি। এদেশে শুধু আল্লাহর হুকুমত চলবে। আর এ হুকুম কায়েম করবে তোমরা... ইনশাআল্লাহ'....

'মিসর ও আফ্রিকার হাজীরা এ পথ ধরেই হজ্জ আদায় করতে যায়। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়। ঈসায়ীদের জন্যও এ পথ অত্যন্ত পবিত্র। ঈসায়ীরা এ পথ ধরেই বায়তুল মুকাদ্দাস যাতায়াত করে। এ হযরত ঈসা (আ) এর পুণ্যময় পথ। কিন্তু মিসরের এক বাদশাহ সেই ঈসায়ী ধর্মকে বিকৃত করে নিজের মনগড়া এক ধর্ম চালু করেছে। আর এ বিকৃত ধর্ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। আমরা সেই মজলুম ঈসায়ীদেরকে হেরাকলের জুলুম-অত্যাচার ও বর্বরতার কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছি'।

ঈসায়ীদের কথা তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন বেদুইনদের কথা চিন্তা করে। কারণ, বেদুইনরা কল্পনা পূজারী হলেও মৌলিকভাবে ওরা ঈসায়ী। তাই ওদেরকে রোমীয়দের বিরুদ্ধে নিতে হলে এ ধরনের কৌশলপূর্ণ বক্তব্যই জরুরী ছিলো। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা এ কারণে আমর ইবনে আস (রা) এর দূরদর্শী সমর নীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাকে তুলনা করেছেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর সঙ্গে।

আমর ইবনে আস (রা) এরপর ফারমা শহরের অবস্থানগত গুরুত্বের কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, শহরটি বিশাল একটি কেল্লাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তার আশপাশে আরো অনেকগুলো কেল্লা গড়ে উঠায় শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়াও শহরে রোমী ফৌজের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে চারগুণ বেশি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ভয়াবহ আশংকাও সবসময় মুসলমানদের তাড়া করে বেড়াবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিকরীযী ও ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, এসব বিষয়ে মুজাহিদদের অবগত করে আমর ইবনে আস (রা) মুজাহিদদেরই উদ্দেশ্যে বললেন,

'মুজাহিদীনে ইসলাম! এটা নিয়ে পেরেশান হয়ো না যে, আমরা সংখ্যায় কম এবং আমাদের সমরাস্ত্রও নগণ্য। প্রতিটি রণাঙ্গনেই কি আমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলাম না? তোমরা রোমীদের লাখ লাখ সৈন্যের মোকাবেলায় এত স্বল্প সংখ্যক নিয়ে পরাজয়ের পর পরাজয় তাদেরকে উপহার দাওনি? ওদের ওপর এখনও তোমাদের ভীতি ছড়িয়ে আছে।...

আমরা প্রতিটি রণাঙ্গনে এজন্যই বিজয়ী হয়েছি যে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখনও মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ তাআলার এ বাণী কতবার যে সূর্যের মতো দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে যে, যে আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্য করবে এবং আমার পথে জিহাদ করবে তাকে আমি দুর্বল ও নগণ্য সংখ্যা সত্ত্বেও দুশমনের ওপর বিজয় দান করবো।'...

দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো। ওদেরকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ো না। আমরা যদি এখন শুধু ফরমা শহর নিয়ে নিতে পারি তা হলে মনে রেখো, দুশমনের ওপর আমরা আরেকবার প্রাধান্য বিস্তার করলাম। এর ফলে ইনশাআল্লাহ একদিন মিসর ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

✪ ✪ ✪

আরীশ শহর দখল করার পরই আমর ইবনে আস (রা) যে কিবতী ঈসায়ীদের আসকাফে আজম বিনিয়ামীনের কাছে দু'জন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন তারা ফিরে এসেছে। আমর (রা) বিনিয়ামীনের কাছে এ পয়গাম পাঠিয়েছিলেন যে, রোমী ফৌজে মিসরের যে সব কিবতী ঈসায়ী আছে তারা লড়াই করবে না, বরং ধোঁকা দিবে। আর কিবতী ঈসায়ীরা যেন রোমী ফৌজকে কোন প্রকার সাহায্য না করে। সম্ভব হলে হেরাকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারলে আরো ভালো হয়।

বিনিয়ামীন তীক্ষ্ণদর্শী লোক। তিনি দুই গোয়েন্দা মুজাহিদকে মৌখিক পয়গাম পাঠিয়ে দিলেন। বিনিয়ামীনের বক্তব্য হলো, লোকদেরকে বিদ্রোহী হওয়ার ব্যাপারে উস্কিয়ে দেয়া যাবে না। কারণ, এখনো বলা যাচ্ছে না, বিজয় কি হেরাকলের হবে না মুসলমানদের? মুসলমানরা পরাজিত হলে সে ক্ষেত্রে হেরাকল বিদ্রোহের অপরাধে একজন কিবতীকেও জীবিত রাখবেন না। তাদের বাচ্চারাও রেহাই পাবে না।

তা ছাড়া লোকদেরকে উস্কিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষ হেরাকলের জুলুম অত্যাচার ও হিংস্র আচার-ব্যবহারের কারণে এমনিতেই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। মনে হয় না ওরা ওদের যুবক ছেলেদেরকে যুদ্ধে যেতে দিবে। হেরাকল যদি কিবতী যুবকদের ফৌজে ভর্তি হওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করে তা হলে কিবতীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে মরুভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

যেসব কিবতী রোমী ফৌজে আছে তাদেরকেও কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ওরা রোমীদের বিরুদ্ধে এতই ক্ষুব্ধ যে, ওরা কখনোই রোমীদের পক্ষে জান বাজি রেখে লড়াই করবে না।

মোটকথা, কিবতীদের মনোভাব মুসলমানদের পক্ষে থাক বা না থাক হেরাকল ও তার ফৌজের বিরুদ্ধেই যে এরা থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য রোমীরা ক্ষতিগ্রস্তও হবে।

এই জবাবে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) সন্তুষ্টই হলেন। ওদিকে ইস্কান্দারিয়ায় বাদশাহ মুকাওকিস, জেনারেল আতরাবুন ও সরকারি ঈসায়ীর আসফাকে আযম কিরাস জরুরী একটি মিটিঙে বসলেন।

মুকাওকিস বললেন, 'ফারমার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। ফারমাবাসীরা মুসলমানদেরকে বিজয়ের নামও নিতে দিবে না। তবে কিবতীদের ব্যাপারে মুকাওকিস বেশ চিন্তিত'।

'আসকাফে আজম! আপনি ঈসায়ীদের মধ্যে কি সে জজবা সৃষ্টি করতে পারবেন যে জজবা মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে।' মুকাওকিস কিরাসকে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, কিরাস বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোমরা কি জানো না, কিবতি ঈসায়ীরা আমাকে হেরাকলের কসাই বলে থাকে! আমার হাতে ঐ কিবতী ঈসায়ীদের যে রক্ত ঝরেছে কখনো ওরা ক্ষমা করবে না। ওদের সামনে যাওয়ারও উপযুক্ত নই আমি।'

তাদের মধ্যে আরো কিছু কথাবার্তা হলো। আতরাবুন বার বার কিরাসকে বললো, কিরাস যেন বিভিন্ন শহরে গিয়ে লোকদেরকে গির্জায় ডেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। কিন্তু কিরাস এতে রাজি না। তার কথা হলো, তাকে আসকাফে আযম লোকেরা বানায়নি, বানিয়েছেন হেরাকল। তাই লোকেরা ওকে সরাসরি জল্লাদ বলে জানে; কিন্তু ধর্মীয় 'পেশওয়া' মানে না।

অবশেষে রায় হলো, আগামীকাল শহরবাসী এবং ফৌজকেও ঘোড় দৌড়ের ময়দানে সমবেত করে ভাষণ দেয়া হবে। লোকে যদি তার বক্তব্য গ্রহণ করে নেয় তা হলে বড় বড় শহরে গিয়ে এভাবে বক্তৃতা দিবেন।

'কিন্তু আমি এধরনের সাদামাটা বক্তৃতার প্রয়োজন বুঝি না'। আতরাবুন বললো, 'আমি ফৌজকে যেভাবে তৈরি করেছি আশা করা যায়, ওরা অবশ্যই লড়াই করবে। কিন্তু আমি জানি, মুসলমানদের দুঃসাহসিক লড়াই সম্পর্কে। আমাদের ফৌজের প্রাণহানি ঘটবে অনেক বেশি। শোন, আমাদের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কম হয়নি। তই সৈন্য সংখ্যা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন অনেক যুবকের। এর পদ্ধতি একটাই। তা হলো অত্যন্ত জালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে লোকদের কে ফৌজে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ইস্কান্দারিয়া ও আশপাশের প্রতিটি কোণে এ ঘোষণা পৌছে দেয়া হয়েছে যে. আগামীকাল অমুক সময় শহরের অমুক ঘোড় দৌড়ের ময়দানে শাহে মকাওকিস প্রজাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জরুরী বক্তব্য রাখবেন।

পরদিন হাজার হাজার মানুষ সে ময়দানে সমবেত হয়ে গেলো। এত বিশাল ময়দান লোকে লোকারণ্য। মুকাওকিস শাহী গাড়িতে চড়ে রাজকীয় কায়দায় মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তার সঙ্গে জেনারেল আতরাবুনও ছিলো। লক্ষাধিক লোকের জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মুকাওকিসের শাহী মেজাযের অহংবোধ আকাশচুম্বী হয়ে উঠলো।

'বাহাদুর রোমী ও বীর শ্রেষ্ঠ মিসরী ভাইয়েরা'! মুকাওকিস গলার সর্বশক্তি ব্যয় করে বললেন, 'মুসলমানরা এখন তোমাদের ঘরে এসে পৌছে গেছে। ওরা এই আত্মতুষ্টিতে এসেছে যে, তোমাদেরকে এখানেও পরাজিত করবে। ওরা আরীশ কব্জা করে নিয়েছে। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলছি। ওরা আরীশ লড়াই করে নেয়নি। আমরা সেখান থেকে ফৌজ আগেই সরিয়ে নিয়েছি, যাতে মুসলমানরা মিসরে সহজে ঢুকতে পারে। এতে মুসলমানরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগে আরো এগিয়ে আসবে; তখন আমরা ওদেরকে আমাদের জালে আটকে ফেলবো। তখন আর ওদের একজনও ফিরে যেতে পারবে না। এখন ওরা ফারমা শহরের কাছাকাছি পৌছে গেছে। মৃত্যু বড় দ্রুত ওদেরকে আমাদের ফাঁদের মধ্যে ধেয়ে আনছে'।

এরপর তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব বিষোদগার ঝারলেন এবং ঈসায়ী ফৌজকে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ফৌজ হিসেবে প্রমাণ করে বললেন,

'পৃথিবীতে একমাত্র ঈসায়ীদের শাসন ক্ষমতাই চলবে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হবে যদি তোমরা সবাই ঈসায়িয়াতের হেফাজতের দায়িত্ব নাও। আজ দেশ, ও ধর্ম চাচ্ছে কুরবানী। যদি তোমরা শামের মতো মিসরও মুসলমানদেরকে দিয়ে দাও তা হলে ঈসায়ী ধর্ম এখানেই খতম হয়ে যাবে এবং মিসর হয়ে যাবে মুসলামানদের। ওরা

কাপুরুষ-বুযদিল আর আত্মমর্যাদাবোধহীন ছেলো যারা শাম মুসলানদের পায়ে নিক্ষেপ করে পালিয়ে এসেছে। আমি জানি তোমাদের তলোয়ার মুসলমানদের খুনের পিয়াসী, মুসলমানরা আসছে। নিজেদের তলোয়ারের তৃপত্তা মিটায়ে নাও। শামের পরাজয়ের প্রতিশোধ মনভরে নিয়ে নাও।'

মুকাওকিসের বক্তৃতা ক্রমেই জোশেলা ও আবেগী হয়ে উঠতে লাহলো, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন শ্রোতাদের মধ্যে জোশ জাবার কোন লক্ষ্যনই নেই। এধরনের বক্তৃতার মাঝখানে তো শ্রোতারা নেকে নেকে শ্লোগানে মুখরিত করে তুলে চারদিক। অথচ আজ সবাই নিশ্চুপ- স্তব্ধ।

মুকাওকিস আরো বললেন, আমাদের শাহনশাহ হেরাকল মুসলমানদের সমসংখ্যা দেখে আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলেন। কিন্তু ফলাফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি মিসরীরা আর করবে না। এখন নতুন করে ফৌজ তৈরি করা হবে। এজন্য জযবাদীপ্ত ছয় মনোবলের যুবকদের প্রয়োজন। মুকাওুকস বক্তৃতা আরো জ্বালাময়ী করে তুললেন।

এরপরও সমবেত প্রজা- শ্রোতারা প্রতিক্রিয়াহীন নিশ্চুপ। নোরেল আতরাবুন মুকাওকিসকে ইংগিতে বক্তৃতা বন্দ করতে বললো। মুকাওকিস সেটা বুঝে ও তার মুখের কাছ অব্যহত রাখলো এবং ঈসায়ীর নামে জয়ধ্বনি তুললো।

তখনই সমবেত লোক থেকে উচু একটি আওয়াজ উঠলো,

'শুধু একটা কথা বলুন। আপনি কোন ঈসায়িয়াতের কথা বলছেন?--

শাহে হেরাকল ও কীরাসের ঈসায়ী ধর্ম না আসকফে আযম বিনিয়ামীনের ঈসায়িয়াত?

কেউ যেন মুকাওকিসের গলা চেপে ধরলো, এ প্রশ্নে তার মুখ হয়ে গেলো। কিন্তু এরপরও তার মধ্যে শাহী মেজায জেগে উঠলো এবং তিনি হয়ে উঠলেন। আতরাবুন তাকে বললো, কিবতীদের মনোভাব ভালো ঠেকছে না। কিন্তু মুকাওকিস তার জিদ বজায় রেখে আতরাবুনকে বললো।

'কে এই হতভাগা। তার এই প্রশ্নদ্বারা আমার যতটা না তোমাদের শাহেন শাহ হেরাকল ও তোমাদের আরো অনেক অপমান করেছে সে। ও কে গ্রেফকার করে শাস্তি দাও।

'না, আতরাবুন বললো, 'আমিও এটা চাই যে, এলোগুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কিন্তু অবস্থা দাবী করছে আমাদের কাদের প্রতি আমাদের সমীহ মনোভাব। আমরা এখন কঠোর মনোভাব দেখালে কিবতীরা নিশ্চিত অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে যাবে।'

মুকাওকিস ও আতরাবুন সেখান থেকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এলো। তৎক্ষনিকভাবে মুকাওকিস দু'টো কাজ করলেন। প্রথমে তিনি কাসেদকে হেরাকলের

কাছে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, মুসলমানরা প্রায় ফারমার নিকটে যেন হেরাকল উপযুক্ত পয়গাম পাঠান।

মুকাওকিস কিবতী যে কাজটা করলেন তাহলো খুব দ্রুতগামী এমন এক সেনা দল ফরমার উদ্দেশ্যে পাঠালেন যার মধ্যে বেশি ঈসায়ী সংখ্যায় প্রায় নিরান্নব্বই ভাগ। আর কিবতী ঈসায়ী নেই বললেই চলে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো কোন রকম বিলম্ব না করে বিদুৎগতিতে ফারমা পৌঁছবে এবং সেখানে ফৌজের মধ্যে যে সব কিবতী ঈসায়ী আছে তাদেরকে যেন ইস্কান্দারিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। মুকাওকিস সন্দেহ করছিলেন, ফারমায় যে পরিমাণ কিবতী ঈসায়ী আছে তা এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা মুসলমানদের দিয়ে দিতে পারে।

হেরাকল তখন ছিলেন বযনতিয়া। বযনতিয়া কাসেদের পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লাগার কথা।

✪ ✪ ✪
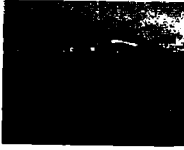
মুসলিম সেনাদল তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে মুকাওকিসের পাঠানো রোমী ফৌজ ইস্কান্দারিয়া থেকে ফারমা পৌঁছে গেছে এবং কিবতী ইসায়ীদেরকেও সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এভাবে ফারমা শহরের অপ্রতিরোধ্যতা আরো নিশ্ছিদ্র হয়ে গেলো।

মুজাহিদরা ফারমা অবরোধ করলো। কিন্তু শহর পাহাড়ের ওপর হওয়াতে আশেপাশে জায়গায় খুবই সংকীর্ণ। এতে শহরের প্রাচীর ও কেল্লার ওপর থেকে যে তীর ছোড়া হচ্ছে তার কিছু কিছু মুসলমানদেরকে লক্ষ্যভেদ করছে। মুসলমানরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আসলে এখানকার পাহাড়টিই এ শহরের জন্য প্রাকৃতিকভাবে অপরাজেয় ঢাল।

মুজাহিদরা তাদের নির্ভীকতা ও স্বাভাবিক বীরত্বের নমুনা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার দেখিয়েছে। কয়েকবারই ওপর থেকে আসা তীর বৃষ্টি উপেক্ষা করে দৌড়ে দৌড়ে শহরের প্রধান ফটকের কাছে চলে গেছে এবং ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। কারণ দরজা তো অত্যন্ত মজবুত ছিলোই, তারপর তীর বৃষ্টি দরজার জন্য অতিরিক্ত ঢাল বনে গেছে। কয়েকজন মুজাহিদ দরজার সামনে শহীদ এবং মারাত্মক যখমী হয়ে গেছে এরিমধ্যে।

কেল্লা জয় করা বা সফলভাবে অবরোধ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের এই সেনাদলের কাছে ছিলো না। মিনজানিক, তীর নিক্ষেপকারী রশি এবং রশিওয়ালা সিঁড়িও ছিলো না। কেল্লা জয় করার ব্যাপারে তো মুসলমানদের আলাদা দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু এই দক্ষতা কাজে লাগনোর জন্য এসব জিনিস হলো প্রধান মাধ্যম।

মুকাওকিসের হুকুম অনুযায়ী দুশমন ছোট ছোট দলে কেল্লার ভেতর থেকে বাইরে এসে হামলা করে দ্রুত কেল্লার ভেতরে চলে যেতে লাগলো। এভাবে চললো বেশ অনেকদিন। এতে দুশমনের চেয়ে মুসলমানরাই অধিক কোনঠাসা হতে লাগলো।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিলো, পাহাড়ের ওপর তাদের লড়াইয়ের জায়গা এত কম যে, সালাররা দিক বদল করে হামলার মোড় ঘুরাতে পারছিলেন না এবং কোন চালও চালতে পারছিলেন না। তারপর যখন কেল্লার ভেতর থেকে হামলা আসতো তখন মুসলমানদের পিছু হটতে হতো এবং পাহাড়ের ঢালু জমি তাদেরকে স্থির পায়ে থাকতে দিতো না। বাধ্য হয়ে তাদের পাহাড়ের নিচে চলে আসতে হতো। রোমীরা নিচে আসতো না বরং ওপর থেকেই দ্রুত কেল্লার ভেতরে চলে যেতো।

বেশ কিছু দিন চলে গেলো অবরোধের। সফলতার পাল্লা দুশমনেরই ভারী। এবার সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলেন। তার ফৌজের কিছু অংশকে বুঝিয়ে দিলেন হামলা আসলে কি করে করতে হবে।

একদিন কেল্লার এক দিকের দরজা খুলে গেলো। আটকে থাকা জলোচ্ছাসের মতো রোমী ফৌজ ধেয়ে এলো এবং মুজাহিদদের সেই অংশের ওপর হামলে পড়লো আমর ইবনে আস (রা) যাদেরকে বিশেষ কৌশল শিখিয়ে দিয়ে ছিলেন। ওরা শহরের একদিকে ছিলো, রোমীদের হামলা হতেই আমর (রা) তার এ অংশকে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে হামলা রুখতে রুখতে শহরের দেয়ালের পাশে চলে এলেন। দরজা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। দরজার দখলে নেয়াই আপাতত লক্ষ্য। কিন্তু রোমীরা মাত্রাতিরিক্ত তীর ছুড়ছে। ওরা বুঝে ফেললো মুসলমানদের চাল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা কেল্লার ভেতরে চলে যেতে শুরু করলো, মুসলমানরা তাদের পথ আগলে দাঁড়ালো।

মুসলমানরা যেহেতু এখন পাহাড় থেকে না নেমে দেয়ালের কাছে অবস্থান নিয়েছে এজন্য ওরা জমে লড়াই শুরু করে দিলো। কিন্তু রোমীদের তুলনায় তাদের সংখ্যা নেহায়েতই কম। বড় রক্ত ক্ষয়ী লড়াই হলো। অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। রোমীরাও নিহত হলো অসংখ্য। কিন্তু সংখ্যায় অনেক হওয়া রোমীয়রা প্রাধন্য বিস্তার করে কেল্লার ভেতরে চলে যেতে সক্ষম হলো। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

মুজাহিদের সেনা সংখ্যা আরো কমে গেলো।

সাধারণত কেল্লার বাইরে উঁচু উঁচু গাছ যাকে। ওগুলোর ওপর চড়ে ভেতরে তীর ছোড়া যায়। কিন্তু এই শহরের বাইরে উঁচু কোন বৃক্ষই অবশিষ্ট নেই। সব কেটে ফেলা হয়েছে। যাতে মুসলমানরা গাছের সুবিধা নিতে না পারে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) এর জন্য সে অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেলো যাতে পৃথিবী বিখ্যাত বড় বড় জেনারেলরাও হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি সালারদের বলে রাখলেন হতাশার মতো পাপ মনে স্থান দিয়ো না। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই হবে।

আমর ইবনে আস (রা) তার সালারদেরকে আরেকটি কৌশল অবলম্বন করতে বললেন। এ কৌশলে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। এমনকি অর্ধেক সৈন্য খতম হয়ে যাওয়ারও আশংকা রয়েছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ বিজয় সে ক্ষেত্রে ধরা ছোয়ার মধ্যে থাকবে।

ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ এক শহরের প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য না মুকাওকিস এলেন, না আতরাবুন, না বিখ্যাত কোন জেনারেল। যে জেনারেল এর নেতৃত্বে ছিলো ইতিহাসে তার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে জেনারেল যেই থাক সে সমস্ত পদক্ষেপই নিচ্ছিলো মুকাওকিসের হুকুম অনুযায়ী।

মুকাওকিসের দেয়া সবচেয়ে বড় প্ল্যান ছিলো, অধিক ফৌজ বাইরে বের হয়ে অবরোধকারীদের ওপর হামলা করে করে তাদেরকে খতম করে দিবে। এই প্ল্যান তাদের সফলও হচ্ছিলো। অধিক পরিমাণে ফৌজ বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে হামলা চালাতো এবং চলে যেতো সামান্য কিছু আহত-নিহত হয়ে। সংখ্যায় অধিক হওয়ায় এবং মুসলমানদের নাজুক অবস্থার কারণে রোমীদের মনোবলও ছিলো বেশ চাঙ্গা।

এবার যখন মুসলমানদের চেয়ে পাঁচগুণ সৈন্য নিয়ে হামলা চালালো, আমর ইবনে আস (রা) তার সালারদের যে কৌশল বা প্ল্যান বলে দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী তারা লড়াই করার পরিবর্তে পাহাড় থেকে এমনভাবে নামতে লাগলো যেন ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে তারা। রোমীরা নিশ্চিত বিজয়ের হাতছানি দেখে মুসলমানদের ধাওয়া করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগলো।

আমর ইবনে আস (রা) তার প্ল্যান অনুযায়ী কয়েক ব্যাটালিয়ান সৈন্য ঢালের এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন।

রোমীয়রা যেই পাহাড়ের ঢালের সেই অংশে পৌছলো যেখানে আগ থেকেই কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মজুদ ছিলো, তারা বিদ্যুৎ গতিতে রোমীয়দের পেছনে চলে গেলো। অর্থাৎ রোমীয় এবং শহরের দেয়ালের মাঝখানে হলো এখন তাদের অবস্থান। বিলম্ব না করে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে রোমীয়দের ওপর হামলে পড়লো। আরেক দিক দিয়ে প্রায় এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য কেল্লার দরজা ফাঁকা পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। রোমীয়রা পড়লো এক আকস্মিক ফাঁদে।

ওদিকে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া মুজাহিদরা দ্রুত গতিতে পাহাড়ের ওপর চড়তে লাগলো এবং রোমীয়দের হত বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সামনে কচুকাটা করতে লাগলো। তাদের যখমীরা এবং নিহতদের লাশ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে হোচট খেতে খেতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এ কৌশল শুধু শহরের একদিকে নয়, আরেক দিকেও অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানকার মুজাহিদ ব্যাটালিয়ান ও রোমীয়দের ফাঁদে আটকে ফেলেছে এবং কিছু মুজাহিদ কেল্লার ভেতর চলেও যেতে সক্ষম হয়েছে।

এ অবস্থার জন্য রোমীয়রা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। ওরা নিশ্চিত বিজয় জেনে হামলা করেছে এবং তখনো সেই বিজয়ের আত্মতুষ্টির প্রভাব মুছে যায়নি। কেল্লার ভেতরে যাওয়া মুজাহিদদের তো লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে তারা শহরের বাকি দরজাগুলোও খুলে দিতে সক্ষম হলো।

রোমীয়দের তুলনায় কম হলেও মুজাহিদের প্রাণ নাশ হচ্ছে। তবে মুজাহিদরা নিজেদের ব্যক্তিগত লড়াই ভেবে লড়ছে বলে সফলতার পাল্লা আজ তাদের দিকেই ঝুকে পড়ছে ক্রমে। বেশি নিহত হচ্ছিলো বেদুইনরা। কারণ তারা কখনো এ ধরনের যুদ্ধে লড়েনি। তারপরও বেদুইনরা রোমীয়দের যথেষ্ট প্রাণনাশ ঘটিয়েছে।

রোমীয়দের অধিকাংশ ফৌজ আজ বাইরে গিয়ে হামলা করে। ফলে তারা সেখানে কচু কাটা হচ্ছিলো এবং ভেতরে সংখ্যায় স্বল্প থাকায় তাদেরকে কাবু করতে মুজাহিদদের খুব বেশি ক্ষতির শিকার হতে হলো না।

শহর মুসলমানরা এ অবস্থা জয় করলো যে, শহরের বাইরে এবং ভেতরে রক্ত বৃষ্টি আর রক্ত বন্যা চলছিলো। শহরটি ছোট ছোট কেল্লায় ভরা। কেল্লার ওপরে এত বেশি বুরুজ রয়েছে যে, সেগুলো গোলক ধাঁধার রূপ ধারণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে সিপাহসালারের নির্দেশে তল্লাশি চালানো হলো। রোমী জেনারেলের অধীনস্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অফিসারকে এক বুরুজের ভেতর লুকিয়ে ছিলো। তাকে গ্রেফতার করা হলো।

ফারমার বিজয় পূর্ণাঙ্গ হলো। এখন মালে গনীমত এক জায়গায় জমা করা হলো, সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। সালাররা সেদিকে মনোযোগ দিলেন।

✪ ✪ ✪

ফারমার বিজয় অমুসলিম ঐতিহাসিকদের কলম স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা এতই হতবাক হয়েছেন যে, তা প্রকাশ করতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

তবে মুসলমানদের কাছে এ বিজয়ে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। কারণ, ইসলামের ইতিহাস এ ধরণের অসম্ভব বিজয়ের কাহিনীতে ভরপুর।

অমুসলিম ঐতিহাসিকরা যেহেতু এ বিজয়ে বিস্তৃত। একারণে তারা বি জয়ের মনগড়া কিছু কারণ উল্লেখ করেছে। যেমন তাদের মতে, মিসরী ফৌজে রোমীদের

তুলনায় কিবতী ঈসায়ী ছিলো বেশি। যারা লড়াই তো করেইনি বরং রোমী ফৌজকে তারা মুসলমানদের হামলার সময় হত্যা করেছে। বিনিয়ামীনের হুকুমে তারা মুসলমানদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ইউরোপীয়রা লিখেছেন, হেরাকলের নিয়োগকৃত আসকফে আযম কীরাস হেরাকলের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং মুসলমনদের সঙ্গে গোপনে হাত মেলায়। এছাড়া মিসরী সমস্ত বেদুইনরাও মুসলমানদের দলে ভিড়ে যায়।

কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস মন্থন করলে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন তথ্য-বক্তব্য দ্বারাই তাদের এসব বানোয়াট তথ্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

এটা ঠিক যে, বিনিয়ামীন কিবতী ফৌজদের এ মেসেজ পাঠিয়ে দেন যে, ওরা যেন জানবাজি রেখে লড়াই না করে এবং রোমীয়দেরকে এটা বুঝতেও না দেয় যে, ওরা এ যুদ্ধে আন্তরিক নয়। ইতিহাসের অসংখ্য সূত্র দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এ যুদ্ধে কিবতী ফৌজের সংখ্যা নেহায়েতই কম ছিলো। এই সামান্য সংখ্যক ফৌজ প্রকাশ্য বিদ্রোহী হয়েও রোমী ফৌজের কিছুই যেতো আসতো না।

আর হেরাকলের আসকফে আযম কীরাসের মুসলানদের সঙ্গে কিংবা সিপাহসালার আমর (রা) এর সঙ্গে কোন ধরণের যোগাযোগের কোন প্রমানই ইতিহাসে মিলে না। কীরাস ও হেরাকলের সঙ্গে কোন ব্যপারে বিরোধ ঘটলেও তা ছিলো নিতান্তই ব্যক্তিগত মতান্তর। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উভয়ের হিংস্র মনোভাব সবসময় এক-অভিন্ন ছিলো।

মিসরী বেদুইনরা মুসলমানদের লশকরে যোগ দেয়াতে মুসলমানরা বেশ উপকৃত হয়েছে এটা ধিক। তবে মুল লড়াইয়ে তাদের অবস্থান ছিলো ভিন্নতর কারন তাদের এভাবে সেনা বিন্যাসে থেকে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিলো না। একারণে তাদের প্রাণনাশও ঘটেছে অধিক।

তবে এটা ঠিক যে রোমী ফৌজে সেসব সৈন্য অধিক ছিলো যারা শামে পরাজিত হয়ে পালিয়ে কিংবা যখমী হয়ে এসেছে। মুসলিম ভীতি তাদেরকে সবসময় সন্ত্রস্ত করে রাখে। মুকাওকিস নয়া ফৌজ তৈরি করলেও পুরনো ফৌজ তাদের মনে এ সত্য ঢুকিয়ে দেয় যে, মুসলমানরা কেমন নির্ভীকতা ও দুঃসাহস নিয়ে লড়াই করে এবং জানবাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ওদের অভিধানে পিছু হটা বলতে কোন শব্দ নেই।

ভীতি ছাড়াও রোমীয়দের মধ্যে মুসলমানদের বিনম্র ব্যবহারের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিলো। সাধারণ খ্রিস্টানরা তো মুসলমানদের আচার ব্যবহারে যথারীতি মুগ্ধ ছিলো। তারা বলতো, মুসলমানারা লড়াইয়ের সময় তো কঠোর-জালিম হয়ে যায়; কিন্তু বিজয়ের তারা বনে যায় রহমতের ফিরিশতা। এ মন্তব্য অমুসলিম ঐতিহাসিকরা এভাবে লিখেছেনে, মুসলমানারা শুধু শত্রুর দেহ ক্ষত বিক্ষত করে না, তাদের মনও জয় করে নেয় এবং বিজিত লোকেরা তাদের শিষ্য বনে যায়।

✪ ✪ ✪

মুসলমানরা যখন ফারমা শহরে প্রবেশ করে রোমীয়দের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন শহরের হাকিম ও প্রধান জেনারেল দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে এ লড়াই দেখছিলেন। তিনি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলেন রোমীয়রা এখন কেল্লা রক্ষার জন্য নয় বরং নিজেদের বাঁচানোর জন্য লড়ছে।

জেনারেলের পাশে এক সেনা অফিসার দাঁড়িয়েছিলো। অফিসার জেনারেলকে বললো, আরো কিছু মুসলমান কেল্লার বাইরে রয়েছে, তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হোক। আর আমাদের ফৌজ বাইরে থাকুক। তারপর বাইরে থেকে হামলা করে তারা মুসলমানদের খতম করে দিবে। এই সামান্য সংখ্যক মুসলমানকে কাবু করা তো কঠিন কোন বিষয় নয়।

আমি শামের রণাঙ্গণে লড়াই করে এসেছি। রোমী জেনারেল পরাজিত কণ্ঠে সামান্য হেসে বললেন, 'আমি এই মুসলমানদের লড়তে দেখেছি এবং নিজেও লড়েছি। তোমরা ওদের স্বল্প সংখ্যার কথা বলছো। এই স্বল্প সংখ্যাই ওদের অন্যতম এক শক্তি দেখতে পাচ্ছো না? এ অবস্থাতেও তারা তাদের কমান্ডারদের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। আমাদের ফৌজের অবস্থা দেখছো? শুধু নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য লড়ছে এবং পালানোর পথও খুঁজে বেড়াচ্ছে .... বেদুইনরাত আমাদের পিঠ দেখালো।

'তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম?' অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

'আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। লড়তে চাইলে লড়ো, না হয় পালিয়ে যাও রোমী।'

জেনারেল বললেন, 'এমন কুদিল মনে করবেন না আমাকে? আপনি বললেই কি আমি পালিয়ে যাবো। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনার সঙ্গ ছাড়বো না।'

অফিসার সেখানে দাঁড়িয়েই তার কাছের সিপাহীদের ডেকে বললো, মুসলমানরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। নিজেদেরকে লুকিয়ে মুসলমানদেরকে আরো নিশানা জানাও .... যে সিপাহীর কানেই ও হুকুম পৌছলো তারা ঘরেই মুসলমানদের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু করে দিলো।

শহরের ভেতর তখন কেয়ামত নেমে এসেছে। সর্বত্র থমথমে অবস্থা। কিছু ফৌজ লড়ছিলো আর কিছু শহর রক্ষার সঙ্গে মিলে পালাচ্ছিলো। মুসলমানরা ঘোষণা

করছিলো, কেউ যেন ঘর ছেড়ে না পালায়। মুসলমানরা কারো ঘরে প্রবেশ করবেনা এবং কোন নারীর ওপর হাত উঠাবে না।

'এই বদ মুসলমানরা আমাদের লোকদের ধোকা দিচ্ছে।' সেই অফিসার বললো, এরা জানে লোকেরা সোনা রূপা আর টাকা পয়সা নিয়ে পালাচ্ছে। এদের নজর তো এর ওপরেই।'

'ধোকা দিচ্ছে না,' জেনারেল বললেন, 'এটাই মুসলমানদের দুর্লভ এক গুণ। বিজিত শহরের কোন ঘরে এরা প্রবেশ করে না কোন নারীর ওপর হাত উঠায় না... এই গুণ যদি আমাদের ফৌজে থাকতো তাহলে তারা না শাম ফেরে পালিয়ে আসতো, না আজ এমন অপরাজেয় এক কেল্লা মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিতো। আমাদের ফৌজ তো নিজেদের লোকদের ঘরে ঢুকে লুটপাট চালায়।'

বলতে বলতে মুজাহিদরা দেয়ালের ওপর চলে এলো এবং অরান্দাযদের ওপর ঝুকে পড়লো যারা মুজাহিদদের ওপর তীর নিক্ষেপ করছিলো। জেনারেল পালাতে শুরু করলেন। দেয়ালের পাশে একটি গলি ছিলো তিনি গলির ভেতর ঢুকে পড়লেন। তার পোশাক আর জেনালে পরিচয়ের বড় পরিচয়। এটা এখন পাল্টানো দরকার। তিনি গলির মুখে প্রথম যে ঘরটি পড়লো তার দরজায় ধাক্কা দিলেন। জেনারেল নাম নিয়ে বললেন দরজা খুলো, দরজা সামান্য ফাঁক হলো, জেনারেল দরজা এক ধাক্কায় পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, ভেতরে কয়েকজন নারী পুরুষ রয়েছে। জেনারেল একজনকে বললেন,

'তোমাদের কারো এক জোড়া কাপড় আমাকে দাও।'

জেনারেলের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে লোকটি তার দিকে ফ্যল ফ্যল করে তাকিয়ে রইলো।

'শোননি তোমরা!' জেনারেল হুকুম আর কর্তৃত্বের সুরে বললেন, 'আমাকে তোমাদের কোন কাপড় আর একটি আলখেল্লা দাও... আমাকে কি তোমরা চিনতে পারছো না? – তোমাদের জেনালের আমি।'

'চিনি তো অবশ্যই? লোকটি বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু দরিদ্র এক লোকের কাপড়ে আপনাকে কি কেউ চিনতে পারবে?'

শাহী খান্দানের এক জেনারেল এমন বিদ্রূপের জবাব মুখে দিতে অভ্যস্ত নন। তিনি তলোয়ার বের করলেন এবং তার হুকুম পুনরাবৃত্তি করলেন। লোকটির স্ত্রী দৌড়ে এসে লোকটিকে বললো, ইনি যা বলছেন তাই করো।

জেনারেল সে লোকের মলিন কাপড়, ময়লাযুক্ত আলখেল্লা ও মাথায় দুর্গন্ধময় একটি চাদর পেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বের হওয়ার সময় সে লোক আর তার স্ত্রীকে বললেন।

'এত ভয় পেয়ো না। দরজা খোলা থাকলেও ভয় নেই। মুসলমানরা কারো ঘরে ঢুকে না এবং লুটপাটও চালায় না।'

'ঠিক আছে তুমি যাও' লোকটি বললো, 'আমাদের প্রাণ এখন মুসলমানরাই রক্ষা করবে। আমি তোমার জেনারেলকে নয় তোমার তলোয়ারকে ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের মেয়েরা তো তোমাদের ভোগ্য জিনিস ছিলো। কিন্তু নিজের মেয়ের প্রতিও যদি খেয়াল থাকতো তাহলে রড়তে লড়তে মরে যেতে ..... যাও, এখন আর তোমাকে কেউ চিনবে না।

এত আস্পর্ধা দেখিয়েও লোকটি বেঁচে গেলো। পালানোর তাড়াহুড়া না থাকলে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো অনেক আগেই। এখন শুধু উত্তপ্ত আগুন দৃষ্টি হেনেই জেনারেল সামনে পা চালালেন।

ঘরের কাছেই একটি লাঠি পেলেন। লাঠি নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাটতে লাগলেন। যেন কোন অসুস্থ ব্যক্তি প্রিয়জনদের খুঁজে বেড়োচ্ছে। শহরের অলিগলি দিয়ে নিজের ফৌজের সিপাহীদের পালায়নরত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। গলির মোড় ঘুরতে গিয়ে তার সঙ্গে কয়েক জনের গায়ে ধাক্কাও লাগলো।

দু' তিনজন মুসলমানকে দেখা গেলো ঘোষণা করছে, লোকেরা যেন ঘরের ভেতর থাকে, কারো ঘরে লুটপাট চালানো হবে না। আরেক মুসলমান বলে বেড়াচ্ছে, ঘরের বাইরে কেউ বের হবে না। বাইরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে, ঘোড়ার তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাবে .... কিন্তু এরপরও লোকদের মধ্যে পালানোর হুড়োহুড়ি বেড়েই চলেছে।

জেনারেলের মহল শহর থেকে একটু পৃথক জায়গায়, তিনি ভয়ে ধীরপদে লাঠিতে ভর দিয়ে, সেদিকে যাচ্ছেন। তার অবিবাহিত মেয়ের জন্যই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা, সবাই যদি সময় মতো পালাতে না পারে তাহলে তা গ্রেফতার হয়ে যাবে।

তিনি মহলের বাইরের ফটকে এসে দাঁড়ালেন। মুসলিম সওয়াররা মহলের ভেতর দু একজন ঘরে ঢুকছে। হতাশ চোখে তিনি মহলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একজন মুসলমান মহলের বাইরে এসে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললো, সবাই পালিয়ে গেছে। মহল একেবারে খালি। জেনারেল কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন তার পরিবারের সবাই নিরাপদ রয়েছে।

জেনারেলের দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি শুধু জেনারেল নয় এই শহরের হাকিম আর বাদশাহ ছিলেন। মানুষের ভাগ্য আর জীবিকা একমাত্র তার হাতেই নির্ধারিত হতো। আরাম আয়েশে ভরা তার মহলের জীবনের কথাও মনে পড়লো। মহলের সামনে সুদৃশ্য এক বাগান রয়েছে। সেই বাগান ও মহলে কত নিঃষ্পাপ ষোড়শী কন্যার সতীত্ব লুটে নিয়েছেন। অথচ আজ তিনি তার মেয়ের চিন্তায় অস্থির।

'সিপাহসালার আসছেন।' তার পিছন থেকে একটি আওয়াজ উঠলো।

তিনি পেছন ঘুরে দেখলেন, মুজাহিদদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) আসছেন। তার পেছনে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার মুহাফিজ। তিনি মহলের বাইরের দিকে তাকালেন। ওখানে সবসময় তার মুহাফিজ বাহিনী সশস্ত্র হয়ে উপস্থিত থাকতো।

আমর ইবনে আস (রা) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। জেনারেল নিজ মুখ লুকিয়ে রাখার জন্য নিজের মাথায় হাত রাখলেন। সিপাহসালার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না যে, এখানে কে দাঁড়িয়ে আছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন?' রোমী জেনারেলের কানে হালকা আওয়াজ পৌঁছলো।

চমকে উঠে দেখলেন, এক বৃদ্ধা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন কর্মচারীর মা, বৃদ্ধা জেনারেলের ছদ্মবেশেও চিনে ফেললো। বৃদ্ধা জানালো, তার পরিবারের সবাই শহরের গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে। শহরের এই দরজাগুলো একমাত্র শাহীখান্দানের জন্যই বানানো হয়েছিলো। সব সময় তালাবদ্ধ থাকতো। যার জন্য এই দরজা বানানো হয়েছিলো তার ব্যবহার হয়ে গেছে।

'আর আমার মেয়ে নওশী?' জেনারেল বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'সেও সঙ্গে গেছে' বৃদ্ধা বললো, 'আপনার মেয়ের বাগদত্তা ওদের সবাইকে নিয়ে গেছে। আপনি চলে যান। না হয় মুসলমানরা এক সময় আপনাকে চিনে ফেলবে।'

'ওরা কি আসবাবপত্র কিছু নিতে পেরেছে?'

'সে সময় পাবে কোথায় ওরা? শূন্য হাতে গিয়েছে সবাই।'

তার মেয়ের নওশীর বাগদত্তা একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা।

জেনারেল আবার তাকালেন মহলের দিকে। তারে কাছে মনে হলো তার প্রাণ পাখিটাই বুঝি উড়ে গেছে। তিনিই একমাত্র জানেন এই মহলে সোনাদানা হীরা জহরতের কী বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

'আপনাকে যে বড় বেদনাকাতর মনে হচ্ছে হুজুর!' বৃদ্ধা বললো, 'আপনি নিরাপদে আছেন এও তো কম নয়। খান্দানের সবাই জীবিত চলে যেতে পেরেছে। আপনিও যান। প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসুন এবং এই শহর আবার জয় করুন।'

জেনারেলের মুখে বেদনাহত হাসি ফুটে উঠলো। বৃদ্ধার এ কথা তার বড় ভালো লাগলো। কিন্তু তিনি জানেন মুসলমানদের থেকে এ শহর ফিরিয়ে নেয়া অসম্ভব কল্পনা মাত্র।

জেনারেল অনুমান করতে পারছেন, এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে বিলবীস নামে একটি শহর আছে, তার খান্দান ওখানে গিয়েছে। জেনারেল গোপন দরজা দিয়ে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। দরজার সঙ্গেই পাহাড়ের ঢাল এবং সংকীর্ণ একটি রাস্তা। যা দিয়ে শুধু একজন মানুষই যাতায়াত করতে পারে। এ দিকটায় হামলাকারীরা আসেনি। তাই জায়গাটি শান্ত।

তিনি ঢাল বেয়ে নিচে নামলেন। যখমী বা নিহত রোমীয় ঘোড়সওয়াদের অনেকগুলো ঘোড়া নিচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শহরের নিচেও চলে গেছে তিন চারটি ঘোড়া, তিনি একটির ওপর সওয়ার হয়ে বসলেন।

এই পুরো এলাকাকে সবুজের বনাঞ্চল বলা যায়। জঙ্গলে হয়ে আছে পুরো এলাকা। এর মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ও আছে বেশ কিছু। জেনারেল জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

ফারমা শহরে মুজাহিদরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। মহল থেকে ধনরত্নের বড় এক খাজানা উদ্ধার করা হয়েছে। বেদুইনদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, ওরা যাতে কারো ঘরে ঢুকে না পড়ে।

রোমী জেনারেল সন্ধ্যা গাঢ় হওয়ার পরও থামলেন না। এক জায়গায় গিয়ে তার খান্দানকে পেয়ে গেলেন। অতি মনোমুগ্ধকর এক জায়গায় ওরা যাত্রা বিরতি করেছিলো। সবার আগে তিনি তার যুবতী মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

'পাগল হয়ে গেছে। পাগলামি করতে করতে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছে।' জেনারেলের স্ত্রী বললো।

জেনারেল তো প্রথমে নির্বাক হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে গর্জে উঠলেন, তাকে সঠিক কথা কেন বলা হচ্ছে না? বৃদ্ধা জেনারেলকে বলেছিলো, তার মেয়ের বাগদত্তা তাকে নিয়ে গেছে।

জেনারেলের মেয়ে নওশী। শাহী মেজাজ–ব্যক্তিত্ববোধ সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী ও চরম আবেগী। জেনারেলের ছোট ছোট আরো দুটি মেয়ে আছে। কিন্তু এই

নওশীর প্রতি জেনারেল একটু বেশিই যত্নবান। অত্যন্ত অভিজ্ঞ উস্তাদ দ্বারা তার এই মেয়েকে শাহসওয়ারী, তীরন্দাযী, বর্শা ও তলোয়ার চালনা এবং যুদ্ধের বহু কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। অতি ক্ষিপ্র ও অভিজ্ঞ দুশমনের বিরুদ্ধেও নওশী এখন রুখে দাঁড়াতে পারবে।

রূপ-ঐশ্বর্যে নওশী ফারমা শহরের সবার কাছে এক দৃষ্টান্ত ছিলো। কিন্তু তার চলাফেরা, স্বভাব-চরিত্র লড়াকু কোন যুবকের সঙ্গেই তুলনীয়। নিজের বাপকে প্রায়ই বলতো, সে তার জীবনেই শামকে রোমী সালতানাতে ফিরিয়ে আনবে।

নওশীর জেনারেল বাবার মুসলমানদের ব্যাপারে দ্বৈত মনোভাব ছিলো। একদিকে মুসলমানদের দৃঢ় চরিত্র মাধুরীর প্রশংসা করতেন। কিন্তু নিজের সন্তানের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন যে, মুসলমানদের মতো নোংরা আর অসভ্য কোন জাতি নেই।

নওশীর বাবা যখন শাম থেকে পালিয়ে চলে এলেন, নওশীর মানসিক অবস্থা তখন এমন যে, তার সামনে যে কোন মুসলমানই পড়ুক তাকে কতল করে ফেলবে। আর এখন তো তার পুরো খান্দান মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ফারমা শহর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নওশীর অবস্থা এখন উন্মাদের চেয়ে উন্মাদতর।

জেনারেলকে বলা হলো, ফারমা থেকে বের হতেই নওশী বিগড়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, এই সামান্য কয়েকজন মুসলমান কখনো ফারমা জয় করতে পারতো না; যদি না বেদুইনরা তাদের সঙ্গে হাত মিলাতো। তার বাগদত্তারও একই কথা। বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গে না থাকলে একজন মুসলমানও জীবিত ফিরে যেতে পারতো না।

নওশীর মা জেনারেলকে যা বললো তার সারমর্ম হলো, মহলের এক মধ্যবয়স্কা কর্মচারী বেদুইন খ্রিস্টান ছিলো। নওশী তাকে খুব ভালো জানতো। নিজের বিশ্বস্ত লোক হিসেবে তাকে মনে করতো। তার যুবক ছেলে বেদুইন দলের সঙ্গে মুসলমানদের দলে চলে গেলো। বেদুইন ছেলে তার বাবাকে জানালো, বেদুইনরা কি করে মুসলমানদের কাছে গিয়েছিলো। সে এও জানালো, আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসে খোদার পয়গাম দিয়ে যান।

কিন্তু বাপ ছেলের কথায় তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। নওশীর মতোই তার মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা অটুট রইলো।

তারপর যখন ফারমা মুসলমানরা জয় করে নিলো তখন সেই বেদুইন কর্মচারী নওশীকে বললো, বেদুইনরা না থাকলে আজ মুসলমানরা খতম হয়ে যেতো। নওশী তো জ্বলে উঠলো।

জেনারেলের খান্দান শহর থেকে বের হওয়ার সময় সেই বেদুইন কর্মচারীকেও সঙ্গে নিয়ে নিলো, এরপর কোন এক সময় ওরা গায়েব হয়ে যায়।

'এই বেদুইন বেটাও গাদ্দারী করবে। সে আমার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।' সে ওকে মুসলমানদের কাছে বিক্রি করে দিবে।' জেনারেল হতাশ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন। আসলে পরে জানা যায়, ফারমা থেকে বের হয়েই নওশী বলতে থাকে, সে এখন ঐসব বেদুইনদের কাছে যাবে যারা এখনো মুসলমানদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। সে সেসব বেদুইনদের সরদার বলবে, তারা যেন গাদ্দার বেদুইনদের মুসলমানদের শিকার থেকে ফিরিয়ে আনে।

নওশী নিজেকে শাহী খান্দানের মনে করে ডাকছিলো বেদুইনরা তার প্রজার। সে যা বলবে তাই মেনে নিবে ওরা। কিন্তু তার বেদুইন কর্মচারী জানালো, বেদুইনরা কখনো এধরনের হুকুমের পরওয়া করবে না।

তার বেদুইন কর্মচারী বললো, সে তাকে এমন এক বেদুইনের কাছে নিয়ে যাবে যার কাছে গায়েবী শক্তি আছে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পাররেন। লোকেরা তাকে যাদুকর বলে। বহু দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে লোকেরা আসে। তিনি যদি হুকুম দেন। তাহলে কোন বেদুইন আর মুসলমানদের দলে ভিড়বে না এবং যা গিয়েছে তারা ফিরে আসবে।

নওশীর মা জেনারেলকে জানালো, পথ চলতে চলতে এমন একটা জায়গা পড়ে যা টিলা টক্কর অলিগলিতে ভরা ছলিা, পথও ছিলো সরু। তারা সবাই একজনের ঘোড়ার পেছনে আরেকজনের ঘোড়া নিয়ে লাইন বেঁধে চলছিলো। নওশী চেষ্টা করছিলো সবার পেছনে থাকতে। একটু দূর গিয়ে এমন এক ঘুর পেচের রাস্তা পড়লো যে, সামনের সওয়ার পেছনের সওয়ারকেও দেখতে পাচ্ছিলো না।

খোলা রাস্তায় যাওয়ার পর দেখলো সবাই নওশী ও সে বেদুইন সে দলে নেই। নওশীর বাগদত্তা বললো, সে তাদেরকে খুঁজতে যাচ্ছে। তার জন্য যেন কেউ অপেক্ষা না করে।

জেনারেল রাগে গজ গজ করতে করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন তিনিও ওদেরকে খুঁজতে যাবেন। তার স্ত্রী তাকে হাত পাকড়ে বসিয়ে বললো, এখন ওদের পেছনে যাওয়াটা বৃথা। ওরা অনেক দূর চলে গেছে। জেনারেল শান্ত হয়ে এলেন।

'তুমি ঠিকই বলছো' জেনারেল তার স্ত্রীকে বললেন, 'আমাকে দ্রুত বিলবিস পৌঁছাতে হবে। না হয় সেখানকার ফৌজের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়বে যে আমি হেরে গিয়ে কোথাও পালিয়েছি। তবে মেয়েটাও বড় দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো, সে তো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়বেই। তখন কোন আরব বেদুইন তাকে নিজের রক্ষিতা বানাবে .... ঐ বেটা বেদুইন কর্মচারী নিজেও ওকে কব্জা করে নিতে পারে।'

'আমি ভুল বলছিলাম না' জেনারেলের স্ত্রী বললো, মেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে। আমি ওকে প্রায়ই বলেছি, যুক্তির ওপর আবেগকে যারা প্রাধান্য দেয় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। অথচ মেয়ে আমার আবেগকে নিয়েই পথ চলা শুরু করে। যুক্তির ধারও ধারে না। আমরাও কখনো লক্ষ্য করিনি। ওর ঐ বেদুইন কর্মচারী আর ওর উস্তাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওকে ক্ষেপিয়ে তুলতে গিয়ে নানান আজগুবি কাহিনী শুনিয়ে মেয়ের মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে। অথচ আমরা ভাবতাম, মেয়ের মধ্যে বুঝি সালাতানাতের আত্মমর্যাদাবোধ ও দূরদর্শিতা জেগে উঠছে।

✪ ✪ ✪

নওশীর বেদুইন কর্মচারী তাকে তাদের বেদুইন কর্মচারী তাকে কাদের বেদুইন এলাকায় নিয়ে গেছে। এ বেদুইন এলাকা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এরা মরু চারী বেদুইন নয়। মুসলমানদের দলে যারা ভিড়েছে তারা তো ছিলো মরুর বেদুইন। আর এরা ঘন বন জঙ্গল আর সবুজ বনাঞ্চলের বেদুইন। এদের ধর্ম খ্রিস্টান হলেও ধর্ম বিশ্বাস ও ফেরকা ওদের নিয়ে ভিন্নতর। এদের ধর্ময়ী আচার অনুষ্টান ও অন্যান্য বেদুইন গোষ্টীর সঙ্গে মিলে না।

সূর্য ওদের মাথার ওপর চলে এসেছে। নওশী তার বেদুইন সঙ্গীর পথ দেখানোতে পথ চলছে।

পেছন থেকে ঘোড়ার খুর ধ্বনি শুনতে পেলো ওরা। পেছন ফিরে দেখলো এক ঘোড়সওয়ার ওদের দিকেই আসছে। এলাকা ঘন জঙ্গল হলেও এমন কোন টিলা টক্কর, প্রান্তর বা উঁচু কোন ঢিবি ছিলো না যে, আড়াল নিয়ে লুকানো যাবে। সওয়ার ও ওদেরকে দেখে ফেলেছে। নওশী বেদুইনকে বললো, সে যেই হোক আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কখনো বলা যাবে না। যদি দেখি ঝামেলা পাকাচ্ছে দু'জনে মিলে কতল করে ফেলবো। দু'জনের কাছেই তলোয়ার আর খঞ্জর রয়েছে।

'নওশী! দাড়াও, আমি চলে এসেছি।' ঘোড়সওয়ার ডেকে বললো।

নওশী পেছন ফিরে দেখলো সওয়ার তার বাগদত্তা।

'কোথায় যাচ্ছ নওশী!' তার বাগদত্তা জিজ্ঞেস করলো।

'রাফী তুমি? যাচ্ছি হেরাকলের আত্মমর্যাদাবোধ জাগতে' নওশী বললো, 'যদি তার অহংবোধ জেগে না উঠে তা হলে রোমের মর্যাদা চিরতরে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।'

তার বাগদত্তার নাম রাফী। রাফী বুঝতে পারলো, এ মেয়ের মাথা সত্যিই বিগড়ে গেছে। সে তার ঘোড়া নওশীর ঘোড়ার সামনে নিয়ে নওশীর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং বললো,

'আমার সঙ্গে ফিরে চলো। পাগলামি করো না।'

'আমার পথে বাঁধা হয়ো না' নওশী তলোয়ার বের করে বললো, 'আমি আশা করেছিলাম তুমি আমার সঙ্গ দিবে। এর বদলে তুমি বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছো। আমি তোমাকে মুসলমানদের চেয়ে ঘৃণ্য শত্রু মনে করবো। ... আমার পথ থেকে সরে যাও।'

'আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি, তোমার ওপর কোন জবরদস্তি চালাবো না ... আমিও তো একজন রোমী; মরে তো যাইনি। ...

'আমার অন্তরে তোমাকে ছাড়া আর কোন পুরুষের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমি আমার অন্তর থেকে সালতানাতে রোমের ভালোবাসা ছাড়াতে পারবো না। আমার প্রথম ভালোবাসা রোম। তারপর তুমি। তুমি আমার সঙ্গে না এলে আমার হাতেই তুমি শেষ হয়ে যাবে।'

'শেষ পরিণতি তো আমার মৃত্যুই' রাফী নওশীকে বললো, 'রোমের ব্যাপারে কোন মুসলমানের হাতে মরাটাই আমি অধিক পছন্দ করবো। আমি জানি, তুমি বেদুইনদের সরদারদের কাছে যাচ্ছো। কিন্তু এটা কোন নারীর কাজ নয়। এটা জেনারেলদের কাজ। বেদুইনরা তো তোমাকে ছুকরি মেয়ে বলে পাত্তাই দিবে না।'

'তুমি কোন পুরুষের কথা বলছো?' নওশী বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো, 'হেরাকলের?

মুকাওকিসের ... না আতরাবুনের কথা বলছো? যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে বাহাদুর আর বুদ্ধিমান জেনারেল বলে মনে করে? ... কোথায় ওরা? .... সবাইতো ভোগবিলাসে মত্ত। আর আমার বাপকে শত্রুর মুখের সামনে দিয়ে রেখেছো। আমার বাবা মুকাওকিস ও আতরাবুনকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন কয়েক হাজার বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং গ্রাম থেকে রসদ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। কোথায় কি হয়েছে? কেউ কি এর প্রতিকারে তেমন কোন উদ্যোগ নিয়েছে?'

'নওশী! সালতানাতে রোম বা মিসর ফারমা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। মনে করো এটাই শেষ কেল্লা যা মুসলমানরা জয় করেছে। এর আগে ওদের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের গোয়েন্দাবাহিনী খুব কাছ থেকে ওদের কর্ম তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছে।'...

'মুসলমানরা কোন সেনাসাহায্য পাচ্ছে না। ফারমা জয় করতে গিয়ে ওদের অনেক সৈন্য হারাতে হয়েছে। বেশি মরেছে বেদুইনরা। ওদের শক্তি অনেক কমে গেছে। ওদের সেনাসাহায্য পৌঁছার রাস্তা অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। আমরা এ ব্যবস্থা করে ফেলেছি যে, ওদের সেনাসাহায্য আসলে পথেই ওদেরকে খতম করে দেবো। আর খতম না করতে পারলে এতটুকু দুর্বল তো অবশ্যই করে ছাড়বো যে, ওরা বেকার হয়ে যাবে।'

'যদি তুমি জেনারেল হতে তা হলে তোমার এ কথার মূল্য ছিলো। কিন্তু তুমি তো একজন সেনা অফিসার মাত্র। শোনা কথা বলা ছাড়া আর কি জানো তুমি? আমি তো সেই দু'ধরনের কোন তৎপরতা মোটেই দেখতে পাচ্ছি না। আমি ঐ মিসরী বেদুইনদের মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, তা না পারলে এখনো হাজার হাজার বেদুইন আছে যারা মুসলমান কিংবা রোমী কারো সঙ্গেই নেই। আমি ওদেরকে আমাদের দলে ভেড়াতে চাই। ওদেরকে নিয়ে পৃথক এক ফৌজ বানাবো আমি। তারপর আমি মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বো। এটা আমার সংকল্প। এর জন্য তোমার ভালোবাসকে সহজেই বিসর্জন দিতে পারি আমি'।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, রোমীয়দের এই অবিরাম পরাজয়ের একমাত্র কারণ হলো, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাব ছিলো। তাদের এ মন্তব্য যে নিতান্তই ভুল তা প্রমাণের জন্য এই এক নওশীর ঘটনাই যথেষ্ট। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, নওশীর চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে আরো অসংখ্য মেয়ে।

যারা শাম কিংবা ইরানের জন্য নিজেদের রূপ যৌবন, ঘর-সংসার, আরাম আয়েশ সব বিসর্জন দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাজি রেখেছে প্রিয় মাতৃভূমির জন্য। আসলে রোম ও পারস্য এত বড় পরাশক্তি ছিলো, তাদের দেশের পর দেশ জয়ের কাহিনী এত দীর্ঘ ও দুর্ধর্ষ ছিলো যে, সামান্য সংখ্যক মুসলিম সেনাদের কাছে তাদের উপর্যুপরী পরাজয় স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পেরেছে খুব কম ঐতিহাসিকই। তাই তারা ইতিহাসের অনেক নির্জলা সত্যকেও অতি নিষ্ঠুর কায়দায় চেপে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু সূর্যোদয়কে যেমন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না তেমনি ইতিহাসের কণ্ঠকেও কেউ রোধ করতে পারে না।

✪ ✪ ✪

নওশীর বাগদত্তা রাফী নিশ্চিত হলো, এ মেয়েকে হাজার যুক্তি-তর্কের মাধ্যমেও ফেরানো যাবে না। কিন্তু সে এটা মানতে পারছিলো না, নওশীর মতো এমন রূপসী তেজী একটি মেয়ে অসভ্য বেদুইনদের কাছে যাবে। আবার সে নিজে তার সঙ্গে যাবে তাও তার যুক্তিতে ধরছিলো না। রাফী অর্ধবয়স্ক বেদুইন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলো, সে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

'আমি কোন অভিযোগের পাত্র নই হুজুর!' বেদুইন ভীত গলায় বললো, 'শাহজাদির সঙ্গে আপনি নিজেই তো কথা বলে দেখেছেন। তিনি আপনার কথা মানবে তো দূরের কথা তলোয়ার বের করে ফেলেছেন। তা হলে আমি কি করে তার কথা না শুনে জীবিত থাকবো?'

'কিন্তু তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছো কোথায়?' রাফী কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো।

'হামুনের কাছে।' বেদুইন আমতা আমতা করে বললো।

'উনাকে সবাই জাদুকর বলে।' তিনি জাদুকর হোক বা না হোক। আমি জানি যে, উনার কাছে গায়েবী ইলম আছে। যার দ্বারা উনি সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন। যে জবাব অন্য কোথাও থেকে পাওয়ার নয়, তা ভবিষ্যতের হলেও তিনি দিতে পারেন। বেদুইনরা তার সব কথা মান্য করে। শুধু ধর্মীয় পেশওয়াই হামুনকে পছন্দ করেন না, আর সরদারদের কিছু হামুনকে মান্য করে আর কিছু পেশওয়াকে মান্য করে। শাহজাদী সেই হামুনের কাছেই যাচ্ছে। আপনি আসাতে আরো ভালো হয়েছে। আপনি নিজেই এখন হামুনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারবেন।'

'হামুন কি করবে?' বাগদত্তা রাফী জিজ্ঞেস করলো।

'আমি এ কথা শাহজাদীকে আগেই বলেছি। সবার আগে তিনি দেখবেন শাহজাদীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে কি না। যদি না হয় তিনি সেখান থেকেই ফিরিয়ে দিবেন।'

'উনার কাছে যদি সত্যিই জাদুবিদ্যা থাকে তহলে নিশ্চয় তিনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করে দেবেন'। নওশী বললো।

রাফী বেদুইন কর্মচারীকে আরো কিছু কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো। এতে সে বুঝতে পারলো, এই বেদুইন কল্পনার পূজারী। এ লোকের কাছে নওশীর যাওয়াটা

মোটেই উচিত নয়। আর এ ধরনের লোকেরা ভেল্কিবাজ হয়ে থাকে অধিকাংশই। অথচ লোকেরা ওদেরকে খোদার দূত বলে মনে করে। রাফী তাই আরেকবার নওশীকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নওশী সে কথা শোনার পাত্রী নয়।

বাগদত্তা রাফী নওশীর ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘুরাতে চেষ্টা করলো। নওশী এক লাফে ঘোড়া থেকে নামলো এবং তলোয়ার দুলিয়ে দুলিয়ে রাফীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লো, সেও যেন ঘোড়া থেকে নেমে আসে। রাফী ঘোড়া থেকে আস্তে ধীরে নেমে নওশীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নওশী তলোয়ার ডানে বায়ে ঘুরাতে ঘুরাতে রাফীর বুকে ঠেকিয়ে বললো,

'তলোয়ার বের করো। আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।'

'তলোয়ার আমার বুকে গেঁথে দাও। তারপর যেখানে খুশি চলে যেয়ো। আমি জীবিত থাকতে তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।' রাফী গম্ভীর গলায় বললো।

বেদুইন ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো এবং নওশীর তলোয়ারের বাট ধরে ফেললো। এ সুযোগে রাফী নওশীকে কাবু করার সুযোগ পেয়ে গেলো। সে পিছিয়ে এসে নওশীর কোমরে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলো। নওশী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ছটফট করতে লাগলো।

'একটি আওয়াজ গর্জে উঠলো এ সময়,

'ছেড়ে দাও ওকে।'

আকস্মিক এ আওয়াজে তিনজনই নিঃসাড় হয়ে গেলো। যে যেদিকে ছিলো সেদিকেই রইলো। তারপর ধীরে ধীরে সোজা হয়ে সেদিকে তাকাতে লাগলো যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছে।

✪ ✪ ✪

ত্রিশ পয়ত্রিশ বছরের এক সুঠামদেহী সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। মুখের সুবিন্যস্ত দাড়ি তার মধ্যে অন্যরকম ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। তার পোশাক বেদুইন সরদারদের মতো বৈচিত্রপূর্ণ। তার অভিব্যক্তি এমন যে, যে কেউ ওকে দেখবে আকর্ষিত না হয়ে পারবে না।

এর মধ্যেই নওশী ও রাফীর মধ্যে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। নওশী তলোয়ার নিচে নামিয়ে নিলো। রাফী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। আর বেদুইন বেচারা পেছনে সরে গেলো।

ঘোড়াসওয়ার ওদের কাছে এলো। নিঃশব্দে ওদেরকে একটা চক্কর দিলো। তারপর নওশীকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কে?

নওশী যেন আচমকা জেগে উঠলো। গর্ব ভরে জানালো সে এক জেনারেলের মেয়ে। শাহী খান্দানের সঙ্গে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

'এ আমার বাগদত্তা।' নওশী ওদেরও পরিচয় দিলো, 'সে এক ফৌজি কর্মকর্তা। আর এ আমাদের কর্মচারী।'

'তোমাদের ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়' ঘোড়সওয়ার বললো, 'কিন্তু আমি অন্যকিছু দেখেছিলাম। আমি এজন্য হস্তক্ষেপ করছি যে, তোমরা আমার এলাকায় রয়েছো এবং আমার কর্তব্য হলো বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ... এই মেয়ে! তুমি শাহী খান্দানের মেয়ে হও বা কোন গরিব ঘরের মেয়ে হও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি দেখেছি, এরা দু'জন তোমার প্রতি জবরদস্তি করছিলো। আমার সাহায্যের কি প্রয়োজন আছে তোমার?'

'হয়তো বা তুমি আমাকে কিছু সাহায্য করতেও পারো' নওশী বললো, 'এরা দু'জন আমাকে সে রকম কোন জোরজবরদস্তি করেনি যেমন তুমি মনে করছো। ও আমাকে আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এ আমার দুশমন নয়।'

'আচ্ছা আগে বলো তুমি কে'? নওশীর বাগদত্তা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে?... আমি মনে করি তুমি একজন সম্মানিত লোক। আর আমি তোমার এ মনোভাবকেও প্রশংসা করি যে, তুমি একটি মেয়েকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছো।'

'চলো আগে কোথাও বসা যাক। তারপর কথা বলা যাবে। সওয়ার ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো।

তিনজন তাদের ঘোড়া ছেড়ে একটি গাছের নিচে গিয়ে বসলো।

'আমার নাম সাইলী নওশ'। লোকটি নিজের পরিচয় দিলো। 'আমি আসলে মিসরী বেদুইন। খ্রিষ্ট আমার ধর্ম। গোত্রের সরদার তো নই, কিন্তু গোত্রের সবাই আমাকে এমনই ইজ্জত করে যেন আমি সবার সরদার।'

'তুমি কার অনুগত; বেদুইনদের না শাহে রোমের'? নওশী জিজ্ঞেস করলো।

'শাহে রোমকে আমি আমার বাদশাহ মনে করি'। সাইলী নওশ বললো. 'তুমি শাহী খান্দানের মেয়ে বলে আমি একথা বলছি এটা মনে করো না। আমি শাহে রোম হেরাকল ও তার সরকারি ঈসায়িয়াতও মানি।'

'আমি মানি না'; নওশী বললো, 'তুমি শাহে রোমের এত অনুগত হলে তোমার গোত্রের জোয়ানরা তো রোমী ফৌজে যোগ দেতো। তুমি কি জানো মুসলমানরা

আরীশের পর ফারমা শহরও কবজা করে নিয়েছে... ফারমা ফৌজের নেতৃত্ব ছিলো আমার বাবার হাতে। এটাও জেনে নাও, আমি আমার বাবা ও বাগদত্তাকে বুযদিল মনে করি'।

'আমি আমার নিজের আনুগত্যের কথা বলছি'। সাইলী বললো, 'বেদুইন গোত্রগুলোর ব্যাপার নির্ভর করে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ওপর। বহু আগে ওদেরকে ফৌজে যোগ দিতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু বেদুইনরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ওরা স্বাধীন চেতা। কারো হুকুম মানে না। ওদেরকে তোমার মতে চালাতে চাইলে ওদের মন মর্জি বোঝে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে ওরা তোমাকে পছন্দ করে। ওদেরকে যদি প্রজা মনে করে জীবজন্তুর মতো হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে চাও ওরা তোমাকে হাকিয়ে দিবে'।

'তুমি কি জানো, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বেদুইন মুসলমানদের দলে যোগ দিয়েছে?...

'হ্যাঁ জানি, সাইলী নওশীর কথা কেটে বললো, এমন কোন লোককে বের কর মুসলমানদের মতো কথা বলতে পারে এবং তার ভাব ভঙ্গি ও মুসলমানদের মতো হয়। ... আগে বলো তুমি আসলে কি চাইছো? তোমার এই বাগদত্তা কথা বলছে না কেন?'

'কথা সেও বলবে আমি কি চাই তা আগে শুনে নাও... আমি বেদুইনদের একটি ফৌজ বানাতে চাই। আমার এই কর্মচারী আমাকে নিয়ে এসেছে। সেও এক বেদুইন। সে আমাকে হামুন নামের এক জাদুগরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বেদুইনরা নাকি তার খুব ভক্ত। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু করতে পারবে?'

'আমি হামুনকে চিনি। বললে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি। আমি এজন্য তোমাদের সঙ্গে যাবো যে. আমার আনুগত্যের ব্যাপার রোমীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।'

নওশী সাইলী নওশকে ফারমা থেকে এখানে আসা অবধি যা যা ঘটেছে এবং এখানে কিভাবে লুকিয়ে ছাপিয়ে এসেছে সব জানালো।

'এরা তো আমাকে পাগল মনে করছে', নওশী তার বাগদত্তা ও মা-বাবা সম্পর্কে বললো। 'এই বেচারা তো আমার কর্মচারী এজন্য সে আমার সঙ্গে এসেছে। আর এই রাফী আমার বাগদত্তা, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। সালতানাতে রোমের জন্য শুধু আমার ভালোবাসাই নয়, আমার প্রাণও বিসর্জন দেবো হাসিমুখে। তুমি ভেবে দেখো, শাম মুসলমানরা ছিনিয়ে নিয়েছে। মিসরের আরেকটি বড় শহর দখল করে বসেছে। যত দিন আমরা দেশ ও জাতির প্রেমে পাগল আর উন্মাদ না হবো ততদিন এই মুসলমান– যারা মূলতঃ আরবের বুদ্ধু তাদেরকে পিছু হটাতে পারবো না। শামও আবার আমরা ফিরিয়ে নেবো এক দিন।'

'আফরী! চমৎকার'! সাইলীর কণ্ঠে আন্তরিক মুগ্ধতা ঝরে পড়লো। 'তোমার এই জজবা ও অমূল্য চেতনার কদর একমাত্র আমিই করতে পারবো। আশা করি বেদুইনদের একটি ফৌজ তৈরি করা যাবে। তবে হামুনের সঙ্গে আগে আলাপ হয়ে যাক।'

'আমি আগে জোরজবরদস্তির কথা পরিষ্কার করে নিই; নওশী বললো, 'ওর বাধা দেয়ার কারণে আমি তলোয়ার বের করে ফেলি। তখন তুমি না এলে আমি বা রাফী দু'জনের একজন কতল হয়ে যেতো। আমার কাছ থেকে তলোয়ার নেয়ার জন্য ওরা আমাকে ধরেছিলো। তখনই তুমি এসে গেলে'।

'দেখো শাহজাদী, তোমার প্রতি ওদের বাধঁদান ভুল ছিলো না'। সাইলী নওশ বললো' যে কাজের জন্য তুমি এসেছো তা তোমার মতো শুধু একটি মেয়ের পক্ষে সে কাজে সফল হতে পারবে না। তোমার বয়স, তোমার রূপ এমন, যে কোন ধর্মীয় গুরু বা বুযুর্গের নিয়তও খারাপ করে দিতে পারে। কোন গোত্র সরদার আসমান থেকে নেমে আসা ফেরেশতা নয়---- এখন তোমার বাগদত্তা এসে গেছে. আমি ও এসেছি। আমি তো অন্য কোন কাজে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার মধ্যেও সেই জজবা-চেতনা আছে যা তোমাকে পাগল করে ফেলেছে। আমি তোমার সঙ্গে আছি'।

'আমাদের কাজ দুটি'; নওশী বললো, 'বেদুইনদেরকে রোমী ফৌজে শামিল করা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো যেসব বেদুইন মুসলমানদের দলে চলে গেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করে ফিরিয়ে আনা।'

'এই দ্বিতীয় কাজটি সহজ নয়', সেইলী বললো, 'ওদের কাছে আমাদের কিছু লোক পাঠাতে হবে যারা এটা প্রকাশ করবে যে, তারা মুসলিম লশকরে যোগ দিতে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের ব্যাপারে অত্যন্ত মুগ্ধ, কিন্তু পর্দার অন্তরালে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, যাতে করে সেসব বেদুনের মনে কুধারণার জন্ম নিবে।'

তারপর সাইলী নওশ এমন বুদ্ধিদীপ্ত কিছু কথা বললো যে, নওশী ও তার বাগদত্তা তার প্রতি একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গেলো। বাগদত্তা রাফী তো নওশীকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টাও ত্যাগ করলো এবং সাইলী নওশের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলো।

'তুমি তো ফৌজের একজন অফিসার এবং শাহীখান্দানেরও সদস্য', সাইলী নওশ রাফীকে বললো, 'তোমার এমন বিষয়ও জানার কথা, ফৌজের বড় বড় অফিসাররাও যা জানে না। আমি তোমার কাছে কিছু জানতে চাই। আমি হয়রান হচ্ছি যে, আরীশের পর মুসলমানরা ফারমার মতো শহরও জয় করে নিলো। যে শহরের ব্যাপারে জনশ্রুতি রয়েছে যে, কোন শক্তিই এ শহর জয় করতে পারবে না। কারণ এটা পাহাড়ের ওপর আবাদ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মজবুত কেল্লায় পরিবেষ্টিত। শুনেছি, মুসলমানদের সংখ্যাও নাকি ছিলো অতি কম। দুই তিন হাজার বেদুইন ওদের দলে যোগ দেয়ার পরও রোমীরা সংখ্যায় এত বেশি ছিলো যে, রোমী ফৌজের ছায়ার নিচেই ওরা হারিয়ে যাবে।'

'এই পরাজয়ের কারণ হলো', রাফী বলতে শুরু করলো, 'মুকাওকিস ও আতরাবুনের পরিকল্পনা ছিলো মুসলমানদেরকে সহজেই এগিয়ে আসতে দেয়া হবে। এতে হামলাকারীরা এই আত্মতুষ্টিতে থাকবে যে, মিসর জয় করা কঠিন কাজ নয়'...।

রাফী পরাজয়ের আরো অনেক কারণ উল্লেখ করলো। এও বললো, রোমী ফৌজকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, ওরা যেন কিবতী ইসায়ীদের ওপর নজর রাখে। এভাবে সমস্ত ফৌজ সারা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যা কি না সামরিক দুর্বলতার লক্ষণ।

'এরপরে বিলবিস নামে আরেকটি বড় শহর আছে' সাইলী নওশ জিজ্ঞেস করলো, 'এ শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কি দুর্বল রাখা হবে যাতে মুলমানরা আরো এগিয়ে যেতে পারে?'

'সম্ভবত না,' রাফী বললো, 'যতটুকু আমি জানি, বিলবিস মুসলমানদের জন্য একটি ফাঁদ হবে। যে ফাঁদ থেকে ওরা আর বের হতে পারবে না- সমূলে খতম হয়ে যাবে। সেখানে ফৌজের নেতৃত্ব দিবেন মুকাওকিস বা আতরাবুন।... ওদিকে মুসলমানদের সেনাসাহায্যও আসছে না। আমরা মদীনা পর্যন্ত গুপ্তচর বিস্তার করে রেখেছি। যারা ওখানকার সৃষ্ট দুর্বলতা আমাদেরকে অবহিত করবে।'

নওশীর বাগদত্তা রাফী সাইলী নওশের প্রতি এতই মুগ্ধ হয়ে গেলো যে, ফৌজের অনেক গভীরের কথাও উগড়ে দিলো।

'চলো, এবার হামুনের কাছে যাওয়া যাক।' সাইলী নওশ বললো।

এখন বেদুইন কর্মচারীর প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু হামুনের ঠিকানা ওরই ভালো জানা।

✪ ✪ ✪

হামুনের আস্তানায় পৌছুতে পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। জঙ্গলে কোন বড় প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরী তাঁবু দেখা গেলো। সাধারণ তাঁবুর চেয়ে দ্বিগুণ প্রশস্ত। তাঁবুর বাইরে এক লোক বসে আছে। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। চোখ দুটো লাল। দাঁতগুলো থকথকে হলুদ। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি আর অশুভ ছায়া। মাথায় ময়লাযুক্ত একটি কাপড় বাঁধা। দুই লোক তার পা টিপে দিচ্ছে।

সাইলী নওশ, রাফী, নওশী ও বেদুইন কর্মচারী তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বেদুইন নুয়ে পড়ে তাকে সালাম করলো। হামুন তাদের দিকে এমনভাবে তাকলো যেন ওরা অতি নিকৃষ্ট প্রাণী।

'হে হামুন!' সাইলী নওশ বললো, 'মেহমান নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। এরা সাধারণ লোক নয়, শাহী খান্দানের লোক। এ মেয়ে শাহজাদী, আর এ তার বাগদত্তা এবং ফৌজি অফিসার এবং এ বেদুইন শাহজাদীর কর্মচারী।'

হামুন তাচ্ছিল্যভরে ওদেরকে মেঝেতে বসে পড়তে বললো। চারজনই মাটিতে বসে পড়লো।

'বাদশাহ হও আর ভিখিরী হও এখানে এসে সব এক হয়ে যায়।' হামুন ঢুলুঢুলু আওয়াজে বললো, 'হেরাকল বাদশাহ ছিলো। কিন্তু রোমী বাদশাহীর রস মরুর বালি পাথর চুষে নিয়েছে। কোথায় হেরাকল? ... তিনি তার শাহজাদী কেন পাঠিয়েছেন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করো হামুন!' সাইলী নওশ বললো, 'এটাই জানতে এসেছি। রোমী বাদশাহী তো বালিয়াড়ি চুষে নিয়েছে। আর যা অবশিষ্ট আছে তা কি নীল দরিয়ায় ডুবে যাবে?'

'আরব থেকে শুরু হওয়া যে বালিয়াড়ির ঝড় ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিক তা নীল দরিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে।' হামুন বললো, রহস্যভরা গলায়। 'হেরাকল বযনতিয়ায় বসে হুকুম চলাচ্ছেন। মুকাওকিস ও আতরাবুন ইস্কান্দারিয়ায় বসে নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন দেখছেন। তা হলে এ ঝড় কে রুখবে?'

'তুমি রুখবে হামুন!' সাইলী বললো, 'তোমার কাছে আমরা এ ফরিয়াদ নিয়েই এসেছি... তুমি যে বলেছো সবাই দূরে বসে ধ্বংসের আয়োজন দেখছে এটাই শাহজাদীর অন্তর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সে নিজে একটি ফৌজ তৈরি করতে চায় এবং তার ফৌজের সৈনিক হবে এ এলাকার বেদুইনরা। ... গায়েবের পর্দা তুলে একটু উঁকি দাও। শাহজাদী এতে সফল হবে কি না। দেখো সালতানাতে রোমের জন্য কালো পর্দার পেছনে কি রয়েছে!'

'আমি যা জানি তা তুমি জানো না' হামুন মাদুকে গলায় বললো, 'কখনো তো আমার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, যা জানতে চাই তার কোন হদিসও মেলে না। জমিনও চুপ। আসমানও চুপ। কখনো দেখা দেয় সাদা পর্দা। উঠাও। দেখবে সব কালো আর কালোর রাজত্ব। কখনো আবার দেখা দেয়, কুচকুচে কালো পর্দা। পর্দা সরাও, তো সব উজালা। দুধের চেয়ে সাদা... চলো ভেতরে চলো।'

হামুন উঠে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়লো। ওরা চারজনও ভেতর ঢুকলো। সবাইকে মেঝেতেই বসতে বলা হলো। সবাই বসে পড়লো। চারজনের চোখ পুরো তাঁবুতে ঘুরতে লাগলো। তাদের কাছে মনে হলো, বড় রহস্যময় ও ভয়ংকর এক গজতে ওরা প্রবেশ করেছে। বাইরের দুনিয়ার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। যেন এ তাঁবু কোন শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

তাঁবুর একদিকে চার পাঁচটি মানুষের খুঁপড়ি ঝুলে আছে। তাঁবুর আরেক দিকে হামুনের বসার গদি পাতা। মানুষের দুটি খুপড়ি ও ডানার দুটি হাড় সেখানে পড়ে আছে। আরো কিছু জিনিস আছে যা ওরা খুব কমই দেখেছে। সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস হলো, একটি কালো নাগ ছোট একটি খোলা বাক্স থেকে বের হয়ে আসছিলো।

হামুন তার গদিতে বসে পড়লো। সাপটা হামুনের কোলে উঠে এলো এবং ফণা তুলে ফণা দুলাতে লাগলো। হামুনের ডান দিকে একটি কালো পর্দা ঝুলে আছে। একটি ছড়ি দিয়ে হামুন পর্দাটি সরিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে নওশীর মুখ থেকে ছোট একটি চিৎকার বেরিয়ে এলো। সেখানে রয়েছে একটি পূর্ণ মানব কঙ্কাল।

'ভয় পেয়ো না, শাহজাদী!' হামুন বললো, 'তোমার এ রূপে ভরা দেহও একদিন এ অবস্থা হয়ে যাবে। তখন কেউ দেখলে চিন্তায় পড়ে যাবে এ কঙ্কাল কোন হতভাগার?... কঙ্কালটি আমাকে দিয়েছে আমার উস্তাদ। আমার উস্তাদকে দিয়েছে তার উস্তাদ, তার উস্তাদকে... এভাবে অসংখ্য মহা পুরুষের হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে। এ ছিলো প্রাচীন কালের এক মিসরীয় সম্রাজ্ঞী। তার প্রিয় কাজ ছিলো, মানুষ হত্যা করিয়ে তার ছটফটে থরথরে কম্পমান রক্তাক্ত দেহ দেখে তার শেষ নিঃশ্বাসের দৃশ্য দেখা। প্রতিদিন একজন করে গোলামকে সারা রাত তার সঙ্গে রাখতো। সকালে তাকে খঞ্জর দিয়ে বলতো সে যেন তার পেট এমনভাবে ফেঁড়ে দেয় যে, পেটের নাড়িভূড়ি বের হয়ে আসে। গোলাম সানন্দে তার হুকুম পালন করতো। আর সম্রাজ্ঞী বড় আনন্দে সে দৃশ্য উপভোগ করতো।...

'এভাবে একদিন গোলামকে সারা রাত পার হওয়ার পর বললো, সেও যেন তার নিজের পেট চিড়ে ফেলে। গোলাম খঞ্জর নিয়ে সোজা তার সম্রাজ্ঞীর পেটে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর সম্রাজ্ঞীর পেট চিড়া শেষ হলে নিজেও আত্মহত্যা করলো... দেখে নাও সেই সম্রাজ্ঞীর পরিণাম... বহু কষ্টে তার আত্মার সন্ধান পেয়েছি আমি। কখনো কখনো তার আত্মাকে আমি ডেকেও থাকি।'

হামুনের সামনে বসা চার শ্রোতার মনে হলো, কঙ্কালটি এতক্ষণ জীবিত ছিলো এই মাত্র তার আত্মা বের হয়ে চলে গেছে। হামুনের বলার ধরনও এমন গভীর রহস্যভরা ও ভীতিপ্রদ যে, চারজনই ভীষণভাবে চমকে উঠলো।

'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো হামুন!' নওশী তার মনকে শক্ত করে বললো। 'এ সম্রাজ্ঞীর আত্মার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়?'

'বহু কথা হয়... বড় দীর্ঘকথা।' হামুন বললো, 'কিন্তু এক মৃত আত্মার কথা শোনা বা বোঝার মতো যোগ্যতা এখনো তোমার হয়নি। তোমাকে শোনাবো অবশ্যই... তোমার কাছে আসবে। তুমি যদি শাহজাদী হও তা হলে একদিন সম্রাজ্ঞীও হতে পারবে। এ সম্রাজ্ঞীর আত্মা আমাকে বলেছে, সে এতই সুন্দরী ছিলো যে, তার হুকুমে যে নিজের পেট

চিড়ে আত্মহত্যা করতো সে নিজে গর্ব অনুভব করতো এ কারণে যে, সে সম্রাজ্ঞীর হুকুম পালন করছে। সম্রাজ্ঞী মনে হয় তোমার মতোই রূপসী ছিলো। এমন সুন্দরী মেয়ে যখন সম্রাজ্ঞী হয় তখন তো সে খোদাকে ভুলে যায়। কিন্তু খোদা তার কোন বান্দাকে ভুলেন না। তিনি তার সে বান্দাকেও জানেন যে তার নিজের কাছেই নিজের অপকর্ম লুকায়। আজকের হেরাকল কাল হাড়ের কঙ্কালে পরিণত হবে... লম্বা কথা... অনেক লম্বা কথা.... তোমাদের সব কথা খুলে বলো।'

✪ ✪ ✪

সাপটি বেশ লম্বা। এতক্ষণে হামুনের গলা পেচিয়ে ধরেছে। মুখটি এক কানের পাশ দিয়ে বের করে রেখেছে। হামুন কি ইংগিত করলো। সাপটি সঙ্গে সঙ্গে তার ফণা ছড়িয়ে দিলো। হামুনের মুখের সমান এর ফণা। এখন তো হামুনকে আরো ভয়ংকর লাগছে। সাপের বাকি অংশ হামুনের কোলে কুণ্ডলী পাকিয়ে লিক লিক করছে।

হামুন হাত বাড়িয়ে দু' ফুট লম্বা দুই কি আড়াই ইঞ্চি মোটা একটা লাঠি নিলো। লাঠিতে নানান ধরনের নানান রঙের কাপড় পেচানো রয়েছে। আর এক দিকের মাথায় বিভিন্ন জাতের পাখির রঙবেরঙের পালক বাঁধা রয়েছে। হামুন ওপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরই তার দেহ কাঁপতে লাগলো। লাঠিটি উপরে উঠালো। লাঠিও কাঁপতে শুরু করলো। কম্পন ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আর হামুন উঠে দাঁড়াতে শুরু করলো।

উঠে যখন দাঁড়ালো তখন এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যেন এ লোক পড়েই যাবে বা এখনই তার মৃত্যু ঘটবে। তার মুখ পুরোপুরি আকাশের দিকে ঠাঁয় হয়ে রইলো। সাপটি তখনও গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে।

হামুনের কম্পন আরো বেড়ে গেলো। এ অবস্থাতেই হামুন এক হাতে নাগের শরীর তার গলা থেকে পৃথক করতে লাগলো। সাপটি দূরে একটি কালো কাপড়ের পেছনে রেখে দিলো। আবার ফণা তুললো।

'হটিয়ে দে পর্দা'... হামুন তার মুখ আরো উর্ধ্বমুখী করে বললো, 'যাই আছে দেখিয়ে দে... হটিয়ে দে পর্দা।'

হামুনের দেহ এবার এত বেশি থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো, মনে হচ্ছিলো তার গোশতগুলো খুলে খুলে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা পুরো শক্তিতে কখনো ডানে কখনো বামে আবার কখনো সামনে-পেছনে ঝাকাতে লাগলো। হামুন বিড়বিড় করে বিচিত্র ভাষায় কি যেন আরো বললো। এখন তো মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোন শক্তি হামুনের

দেহে ভর করেছে। এ শক্তি তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। দর্শক ক্রমেই এ দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে উঠবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর হামুনের দেহের কম্পন কমতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে দেহ স্থির হয়ে গেলো।

তার চেহারা ও নড়াচড়া দেখে বুঝা যাচ্ছে, এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। তার চোখে এমন দিশাহারা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে যেন সে দূরের কোন কিছু দেখার চেষ্টা করছে। হাতের লাঠিটি এমনভাবে দোলাতে লাগলো যেন কাউকে মারছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে সে পিছেনে ফিরলো।

সাপটির দিকে ফিরলো। এবার হামুন সবার দিকে পিঠ করে রইলো। আবার লাঠিটি এমনভাবে ওপর-নিচ করলো যেন নাগটিকে মারছে। সাপ ফণা তুলে ফোস ফোস করছে।

'বল, তুই কি দেখেছিস'? হামুন নাগকে জিজ্ঞেস করলো, 'তাড়াতাড়ি... ঠিক করে বল্।'

'সব অন্ধকার'। এটা হামুনের গলা নয়। কোন ছোট বাচ্চা বা বুড়ির মিহি গলার আওয়াজ।

সাইলী নওশ, নওশী, রাফী, বেদুইন কর্মচারী একে অপরের দিকে সবিস্ময়ে তাকাতে লাগলো।

'আবার দেখ'। হামুন নাগকে বললো, 'আমি পর্দা উঠিয়ে দিয়েছি। তুই যা দেখতে পাবি আমি তা দেখতে পাবো না... আবার দেখ!'

লাঠির যেদিকে পাখির পালক বাধা সেদিকটি দিয়ে জোরে জোরে লাঠি ঝাকাচ্ছে। নাগও ডানে বামে ফণা দোলাচ্ছে।

'অন্ধকারে অস্পষ্ট একটি আলো দেখা যাচ্ছে।' বাচ্চা বা কোন বুড়ির আওয়াজ শোনা গেলো আবার।

হামুন আরো কয়েকবার এ ধরনের প্রশ্ন করলো নাগটিকে এবং একই গলায় রহস্যময় জবাব শোনা গেলো। হামুন উঠে দাঁড়ালো এবং লাঠিটি দিয়ে বাতাসে কয়েক ঘা বসিয়ে নিজে লাফাতে লাগলো পাগলের মতো।

তারপর ঝপ করে বসে পড়লো সবার দিকে মুখ করে। মাথাটি কিছুক্ষণ অবনত রেখে মাথা উঠালো এবং নওশীর চেহারার ওপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তারপর উঠে নওশীর মাথা থেকে একটি চুল নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। সামনে পড়ে থাকা একটি মানব খুপড়ির মধ্যে চুলটি রেখে দিয়ে সেটা সামনে নিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন পড়লো।

'তোমাদের দু' তিন দিন এখানে থাকতে হবে।' হামুন তাদেরকে বললো, 'হতে পারে দু' একদিন বেশি থাকা লাগতে পারে। পুরো জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাবে। সফলতার আভাস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।... আমি কিছু না কিছু করবোই।... তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করা আছে। মেহমানদের জন্য আমি তাঁবু লাগিয়ে রেখেছি। খাবার-দাবার ও আরামের সব ব্যবস্থাই করা আছে। তবে শাহী মহলের আরাম তো পাবে না। মেঝেতে শুতে হবে।... বাইরে দু'জন লোক আছে। ওরা তোমাদের মেহমানখানায় পৌঁছে দিবে।'

হামুনের তাঁবুর প্রায় একশ' কদম দূরে একটি সবুজ টিলা রয়েছে। টিলার সঙ্গে তিন চারটি তাঁবু রয়েছে। ওদেরকে দু'জন লোক ওখানে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলো। চারজনের মন থেকে তখনো ভয়ের ছায়া মিলিয়ে যায়নি।

✪ ✪ ✪

পরদিন সকালে ওদের চারজনকে হামুন তার তাঁবুতে ডাকালো। তারপর আগের দিনের মতো সবকিছু করলো। সেদিন তো হামুন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো আর বুঝি কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। এ অস্থায় সে কালনাগকে কিছু প্রশ্ন করলো এবং বাচ্চা বা কোন বৃদ্ধার গলায় এর জবাব শোনা গেলো। একবার তো ক্রুদ্ধ অবস্থায় কালনাগের ঘাড় চেপে ধরে নিজের মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে কয়েকবার ঝাকালো। তারপর আবার তার মুখ থেকে বের করে দিলো।

দুই আড়াই ঘন্টা পর ওদেরকে বিদায় করে দিয়ে বলে দিলো সূর্যাস্তের পর আবার আসতে।

সন্ধ্যার পর ওরা হামুনের তাঁবুতে হাজির হলো। আজ সন্ধ্যায় তাঁবুতে দু'টো নয় চারটি প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। হামুন সেই লাঠিটি উঠালো যার মধ্যে বিভিন্ন রঙের কাপড় ও নানান ধরনের পাখির রঙবেরঙের পালক বাঁধা রয়েছে। লাঠিটি উঠাতেই প্রদীপ চারটি দপ করে নিভে গেলো।

হামুন আজগুবি ভাষায় বড় ক্রুদ্ধ হয়ে কি যেন বলে লাঠিটি দিয়ে মাটিতে একটি আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। আবার আগের মতো বিড় বিড় করে কি যেন বলে লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলো এবং আরেকটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। এভাবে একে একে সব কটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। তারপর হামুন আজ সকালেও কাল রাতে যা করেছিলো তাই করলো। তবে আজকের লাফালাফিতে একটু ভিন্নতা ছিলো।

হামুন একবার ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, নওশী এখানেই বসে থাকবে আর তো মরা তিনজন বাইরে চলে যাও। তিজন তাঁবুর বাইরে চলে গেলো এবং তাঁবুর পর্দা নেমে এলো।

একটু পরই তাঁবুর ভেতরে তিনজনের ডাক পড়লো। তিনজন ভেতরে ঢুকলো।

'এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এ মেয়ের' হামুন বললো, 'আমি ইশারাও পেয়ে গেছি। আমার উস্তাদের আত্মাও বলেছেন, ব্যাপার এমন নয় যে, এই মেয়ে যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে যাবে। হবে ধীরে ধীরে। আমি এ কাজ আমার দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছি। তবে যে সাধনা করা হবে তাতে এ মেয়েকেও লাগবে। তোমাদের উপস্থিতিতেও তা করতে পারবো। কিন্তু তা নিষেধ। কারণ, তোমরা এ মেয়েকে এমন অবস্থায় দেখবে যে, মনে করবে এ নিশ্চিত পাগল হয়ে গেছে। হতে পারে তার বাগদত্তা ওকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলো। তখন ওর কিছু না হলেও এ কালনাগটি আমাকে ও এ মেয়েকে মেরে ফেলবে।

'হামুন, তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে।' সাইলী নওশ বললো, 'আমাদের কেউ তোমার সাধানায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক কাজটি হওয়া চাই। এ মেয়ে ও তার বাগদত্তা শাহী খান্দান থেকে এসেছে। যে পুরস্কার চাইবে তাই পাবে।'

'আমি কিছুই চাই না' হামুন আশ্বাস ভরা গলায় বললো, 'আমার এ জগৎ যা তোমরা দেখছো তা আবাদ থাকতে দিলেই আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি হবে।'

নওশী এমনিতেই চপলা ও বাকপটু মেয়ে। কিন্তু সে রাতে তার সঙ্গীরা অনুভব করলো, নওশী যেন অনেকটা গম্ভীর হয়ে গেছে। সবাই ভাবলো, দেশ ও জাতির চিন্তায় নওশী বুঝি আজ অনেক বেশি মর্মাহত।

✪ ✪ ✪

আরো এক রাত ও একদিন কেটে গেলো হামুনের আতিথেয়তায়। দিন গিয়ে রাত এলো। অর্ধরাত কেটে গেলো। চাঁদের মায়াবী আলো এ রহস্য ঘেরা জাদুপল্লীকে যেন আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

সাইলী নওশ তার তাঁবুতে ঘুমুচ্ছিলো। হঠাৎ তার চোখ খুলে গেলো। কি কারণে তার সে বুঝতে পারলো না। মনটা কেন জানি খুঁত খুঁত করছে। ভাবলো বাইরে থেকে একটু মুক্ত বাতাস গায়ে লাগিয়ে এলে ভারমুক্ত হয়ে যাবে। বাইরে বের হওয়ার পর চাঁদের আলোয় সামান্য দূরের একটি বৃক্ষের মধ্যে দৃষ্টি আটকে গেলো। মনে হলো কেউ

যেন বসে আছে। একবার ভাবলো ঘুমের ঘোরে হয়তো এমনটা দেখছে। ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলো আবার। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, কেউ না কেউ বসে আছে।

পা টিপে টিপে সেই বৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে দেখলো, এক নারী মূর্তি। নওশী গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। আচমকা সাইলী নওশকে দেখেও চমকে উঠলো না নওশী। বরং আরো নিশ্চিন্ত বোধ করলো। সাইলী নওশকে তার পাশে বসতে বললো। সাইলী জিজ্ঞেস করলো, এত রাতে সে এখানে বসে কি করছে?'

'আমি জানি না তুমি কেমন লোক', নওশী বললো চিন্তিত গলায়; 'আমার জন্য আসলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, তোমাকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারবো কি না'...

'দেখো নওশী'! সাইলী নওশ বললো, 'আমার কপালে তো ভালো মন্দ কিছুই লেখা নেই। তবে এতটুকু তো ভেবে দেখতে পারো, আমি যাচ্ছিলাম অন্য কোন কাজে। তোমাকে বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং পরে তোমার কথা শুনে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। আমার ঘরের সবাই আমাকে হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার ব্যাপারে আমার সামান্যতম মোহ নেই। হয়তো তা অনুভবও করতে পেরেছো কিছুটা। এখন তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বিশ্বাস করতেও পারো... তা ছাড়া তুমি তো তোমার বাগদত্তাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'না, নওশী কঠিন সুরে বললো, 'ওর ওপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে গেছে। এখন আমি একা। এখন আমার ঘোড়ায় চেপে এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

'নওশী!' সাইলী নওশ সত্যিই চমকে উঠে বললো, 'এখন তো আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো যে, এমন কি ঘটেছে যার কারণে তোমার বাগদত্তার ব্যাপারেও বিরূপ ধারণা জন্মালো?'

'তা হলে ওয়াদা করো, তোমার সঙ্গে আমার যে কথাই হবে তা আমার বাগদত্তা রাফীকেও জানাবে না এবং আমার বেদুইন কর্মচারীরও জানানো উচিত নয়।'

সাইলী নওশ নিশ্চয়তা দিলো ওকে, সে যা শুনবে এখানেই তার মনে চিরতরে দাফন করে দিবে।

'আমাকে এ হামুন জাদুগরের হাত থেকে বাঁচাও', নওশী জরুরী গলায় বললো, 'সে আমাকে তার কাছে একা বসিয়ে তোমাদের তিনজনকে বের করে দিয়েছিলো না? তখন যেন তার হাবভাবই পাল্টে গিয়েছিলো। এতটুকু সময়ের মধ্যে সে একবার আমার চেহারা মাথা তার দু' হাতের মাঝখানে নিয়ে আমার চোখের দিকে চোখ রাখলো। একবার তার মুখ আমার মুখের এত কাছাকাছি নিয়ে এলো যে, ওর কপাল আমার কপালের সঙ্গে লেগে গেলো। মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয়ে আমার নাকে আঘাত করলো যে, আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস প্রশ্বাস এত উত্তপ্ত মনে হচ্ছিলো যেন আমার

চেহারা বুঝি জ্বলে যাবে। তারপর এমন আরো কিছু করলো যার অর্থ আমি মোটেই বুঝলাম না।'...

'তারপর সে নাগের কাছে গিয়ে বসলো এবং তার পিঠ ফিরিয়ে দিলো আমাকে। নাগের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর শুরু করলো। এক সময় নাগ কম্পিত ও মিহি কণ্ঠে বললো, এ মেয়ে যদি একটু ত্যাগ স্বীকার করে তা হলে সে সম্রাজ্ঞী হতে পারবে এবং যা চাইবে তাই পাবে...

'নাগের সঙ্গে আরো কিছু কথাবার্তা বলে আমার দিকে ফিরলো এবং আমাকে তার কাছে থেকে নিয়ে গেলো। একেবারে তার কাছে বসালো আমাকে। প্রথমে রহস্যময় কিছু কথা বললো। তারপর বললো, তার সঙ্গে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় এক রাত কাটালে আমার চাওয়া পূরণ হবে। একথা বলে বললো, তোমার দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তি যার কব্জায় আমি রয়েছি তার হুকুম হলো, আমাদের দু'জনের দেহ এক হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আত্মা ওপরে চলে যাবে। তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং যা হওয়ার নয় তাও হবে।'...

'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি এ লোক কি চায়' সাইলী নওশ বললো, 'এখন তুমি বলো তোমার কি ইচ্ছে?'

'তুমি তো জানো আমার সংকল্প কি? আমি সালতানাতে রোমের জন্য আমার প্রাণ দিয়ে দিবো। কিন্তু সাইলী নওশ! আমার সতীত্ব বিসর্জন দিবো না। আমি আমার ইজ্জতকে আমার হবু স্বামী বাগদত্তা রাফীর আমানত মনে করি। আমার ধর্ম আমাকে এ অনুমতি দেয় না যে, আমার অতি প্রিয়জনকেও অবৈধভাবে আমার ইজ্জত দিয়ে দেবো।'

'তুমি কি রাফীকে বলো নি সব?'

'বলেছি। কিন্তু সে একটা আত্মমর্যাদাহীন লোভী কাপুরুষ। সে বললো, এতে কোন পাপ নেই। একটি রাত মাত্র এ লোকের সঙ্গে কাটিয়ে দাও। তারপর তুমি হবে সম্রাজ্ঞী আর আমি সম্রাট। আমি রাফীকে এও বলেছি যে, আমাকে হামুন বলেছে, হেরাকল আমাকে মিসরের অনেক বড় অংশ দিয়ে দিবে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আমার বাদশাহী। সে একথা শোনার পর আমার পেছনে উঠে-পড়ে লেগেছে, আমি যেন হামুনের ইচ্ছে পূরণ করে দিই। আজ সন্ধ্যায় যখন আমি হামুনের তাঁবু থেকে এখানে এলাম তখন তো ওর সঙ্গে আমার লড়াই বেঁধে গেলো। সবার কাছ থেকে আমাদের দু'জনের তাঁবু একটু দূরে স্থাপন করাই। যাতে দু'জনের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা গাঢ় হয়ে উঠে। কিন্তু ঘটলো সম্পূর্ণ বিপরীত... বলো সাইলী নওশ! আমি পালিয়ে যাবো না আত্মহত্যা করবো?'

'কেন? আত্মহত্যার চিন্তা আসবে কেন? এই এক বাগদত্তা রাফীই দুনিয়ার সর্বশেষ পুরুষ নয়। এখন আমি তোমাকে বলছি তা আমি দু'দিন আগে অনুভব করেছি। আমিও

ওর ভাওতাবাজিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি, হামুনের দৃষ্টি সব সময় তোমার ওপরই লেগে থাকে। আর তুমিও এত রূপসী যে, পাদ্রী পুরোহিতও তোমাকে দেখার পর ঠিক থাকতে পারবে না। আমি নিশ্চিত এই বেটা হামুন ভণ্ড এক লোক। প্রদীপগুলো নিভে গিয়ে যে আবার জ্বলে উঠলো এও একটা ভেল্কিবাজি। তুমি ওর সবকিছু ফাস করে দিলে। তুমি বলেছো তোমাকে হামুন থেকে বাঁচাতে। আমি তোমাকে বাঁচাবো।'

'কি করবে তুমি?' নওশী জিজ্ঞেস করলো।

'এটা জিজ্ঞেস করো না' সাইলী নওশ বললো, 'শুধু এতটুকু বলছি যে, তুমি নিজের নয় হামুনের জান কেড়ে নিবে। কিভাবে কি করবে তা আমি তোমাকে বলে দিবো।'

'আমাকে কি করতে হবে তা এখনই বলে দাও।' নওশী ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, 'তুমি হয়তো বুঝতে পরছো না আমি কেমন পেরেশানীতে ফেঁসে গেছি। আমি তো রাফীর মানসিক অবস্থা তোমাকে বলিনি। সে তো মরতেও প্রস্তুত। যে করেই হোক আমাকে এখন হামুনের কাছে পাঠাবেই।'

'হ্যা, তোমাকে এটাই করতে হবে। কাল রাতে তুমি হামুনের তাঁবুতে যাবে। তবে ওকে বুঝতে দিবে না যে, তুমি রাজী নও।'

'আমাকে আর মুশকিলে ফেলো না সাইলী নওশ! সে তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিবস্ত্র হতে বলবে। সে আমাকে নিয়ে কি করবে তা প্রথমেই আমাকে বলে দিয়েছে।'

'সে বললেও বিবস্ত্র হবে না। তোমার কাপড় খোলার জন্য জোরজবরদস্তি করবে সে ঠিক; কিন্তু তোমার দেহ বিবস্ত্র হবে না।' সাইলী নওশের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো আত্মবিশ্বাসের সুর!'

যে নওশী চরম দুঃসাহসী হয়ে শুধু একজন কর্মচারী নিয়ে এ অপরিচিত বেদুইন এলাকায় চলে এলো সেই এখন ভীত-সন্ত্রস্ত। একজন শুভার্থী ও সাহায্যকারী খুঁজছিলো সে মনে-প্রাণে। পেয়ে গেছে সে। কিন্তু সাইলী নওশকেও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে করছে না। শুধু মনে করছে ডুবন্ত মানুষের জন্য পাওয়া কোন খড়কুটার মতো। যার ওপর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই আসে যায় না।

নওশী সেখান থেকে উঠে তার তাঁবুর দিকে হাঁটা দিলো। নওশী ও রাফীর তাঁবু সাইলী নওশের তাঁবুর কাছেই। কিন্তু নওশী একটু ঘুরে তার তাঁবুর দিকে যাচ্ছে। সাইলী নওশ সোজা তার তাঁবুর কাছে পৌছে গেছে।

নওশী অর্ধেক পথ মাত্র গিয়েছে আচমকা তার বাগদত্তা রাফী তার সামনে এসে উপস্থিত হলো। রাফীরও ঘুম ভেঙে যাওয়াতে উঠে দেখে রাফীর খাট খালি। সঙ্গে সঙ্গে নওশীকে খুঁজতে বেরিয়ে যায়। চাঁদের আলোয় সে নওশীকে সাইলী নওশের সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফেলে।

'এই মাঝরাতে ঐ বৃদ্ধর কাছে কেন গিয়েছিলে?' রাফী নওশীর কাছে হুকুমের সুরে কৈফিয়ত চাইলো।

নওশী তাকে সত্যি কথাই বললো এবং জানালো সে তার সতীত্ব বিসর্জন দিতে পারবে না।

'দিনের বেলায়ও তো তুমি ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করতে পারতে?' রাফী কর্কশ সুরে বললো, 'তুমি বুঝি ঐ বৃদ্ধর সম্রাজ্ঞী হতে চাও। এজন্য বুঝি ঐ সাইলী নওশ বৃদ্ধকেই তোমার উপযুক্ত মনে হলো!'

নওশীর মন তো এমনিই বিগড়ে আছে। রাফীর মুখে একথা শুনে ওর প্রতি তার মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। সেভাবেই নওশী বললো,

'আমি যেখানেই যাবো সেখানে শাহজাদী আর সম্রাজ্ঞীই থাকবো। শাহে হেরাকলের খান্দানের লোকেরাও আমাকে ভালো করে চিনে। ঐ খান্দানের সঙ্গে তো তোমার অনেক দূরের সম্পর্ক। চাইলে তোমাকে এখনই আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি। কিন্তু আমি চাই তুমি সভ্য-ভদ্র হও এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না।'

উভয়ে এত উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে যে, কেউ এটা চিন্তা করলো না যে, নিজের ভুল বুঝাবুঝি শুধরে আপস-রফা করে ফেলি। নওশীর কথা শুনে রাফী তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং এমন হুমকিও দিলো যে, সে সাইলী নওশকে হত্যা করে ফেলবে।

নওশী তো এ হুমকিকে চ্যালেঞ্জ মনে করে বললো, সে যদি সাইলী নওশকে হত্যা করতে যায় তা হলে নিজেই কতল হয়ে যাবে।

নওশী রাফীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত তার তাঁবুর দিকে হাঁটা দিলো। সাইলী নওশ রাফী ও নওশীর মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে মনে করে তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। নওশীকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে। নওশী সব বলে দিলো।

'তুমি আসলে দু'টি ভারী পাথরের মাঝখানে পড়ে গেছো নওশী!' সাইলী নওশ বললো, 'নিজেকে নিজে একা মনে করো না। কাল রাতে হামুনের তাঁবুতে চলে যেয়ো। বাকি কাজ আমার।'

ওরা কথা বলছিলো। এ সময় রাফী সেখানে উদয় হলো। নওশীকে হুকুম করলো, তার তাঁবুতে আসতে।'

'আমি তোমার হুকুমের গোলাম নই!' নওশী শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললো, 'নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো সাহস ও বুদ্ধি আমার আছে। আমি তোমার তাঁবুতে যাবো না। আমি সাইলী নওশের তাঁবুতে যাচ্ছি।'

'না নওশী!' সাইলী নওশ বললো, 'আমি এটা মেনে নিবো না।' তারপর রাফীর দিকে ফিরে বললো, 'ভুল বুঝো না শাহজাদা! আগে এটা দেখো, তুমি কোথায় এবং এখানে কেন এসেছো? নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভেবে দেখো। এতো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে উত্তেজিত হওয়ার মতো স্থানও নয়। সময়ও নয়।'

'চুপ থাক বুদ্ধু কোথাকার!' রাফী গলায় শাহী মেজাজ ফুটিয়ে বললো, 'ওকে তোর সঙ্গে রেখে দেখ। তারপর দেখবি পরিণাম কি হয়!'

'এসো নওশী! সাইলী নওশ নওশীর বাহু ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললো, 'এ ছেলের মাথা ঠিক নেই। তুমি ঠিক আছো। তোমরা এখন এক সঙ্গে থাকলে দু'জনেই পাগল হয়ে যাবে।'

নওশী সাইলীর সঙ্গে তার তাঁবুতে চলে গেলো। রাফী বিদ্বেষের আগুনে পুড়তে পুড়তে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো।

'আমি আর এখন ঐ লোককে আমার বাগদত্তা মনে করি না।' তাঁবুতে গিয়ে নওশী সাইলী নওশকে বললো, 'সালতানাতে রোমের হারানো গৌরব আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। আর চাই মুসলমানদের খতম করে তাদের নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে দিতে। এ রাফী তো আমার বাগদত্তা হয়েছিলো শুধু আমার রূপ যৌবনের লোভে। আমি তো কখনো ভাবিনি যে, আমি কতটা রূপসী ও আকর্ষণীয়। নিজের এ দেহ নিয়ে আমার কোনই আগ্রহ নেই।'

পরদিন হামুনের তাঁবুতে কিছু সময় কাটলো ওদের। হামুনের সেই লম্ফ-ঝম্পের কাণ্ড-কীর্তি দেখতে হলো ওদের। সাইলী নওশ, নওশী ও রাফীকে মিলিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু রাফী আরো বেশি ক্ষিপ্ত ছিলো। আর নওশী সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। আজ রাতে সে হামুনের তাঁবুতে থাকবে। এটা শুনে রাফী কিছুটা ঠাণ্ডা হলো।

✪ ✪ ✪

রাত গভীর হতেই নওশী হামুনের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। হামুন সবাইকে বলে দিয়েছে শুধু নওশী তার কছে আসবে। আর সবাই যার যার তাঁবুতে থাকবে।

হামুন নওশীকে তার সামনে বসালো এমনভাবে যে, দু'জনের হাটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে রয়েছে। হামুন নওশীর মুখটি তার দু' হাতে ধরে একেবারে নিজের মুখের কাছে নিয়ে গেলো। নওশী মুক্ত হওয়ার সামান্যতম চেষ্টা করলো না। তবে ঘৃণায় তার শরীর রিরি করে উঠলো।

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিলো, হামুন নেশায় ডুবে আছে। সে তার বিশেষ লাঠিটি নিয়ে কিছুক্ষণ লম্ফ-ঝম্ফ করলো। তারপর নওশীকে দাঁড়াতে বললো। নওশী উঠে দাঁড়ালো।

'তোমার দেহের কাপড়গুলো তুলে রাখো।' হামুন নওশীকে হুকুম করলো। 'এমনভাবে বিবস্ত্র হও যেভাবে তুমি দুনিয়ায় এসেছিলে... এ দেহ কিছুই নয়... আমার প্রয়োজন তোমার আত্মা। তোমার আত্মা আমাকে দিয়ে দাও।... খোলো কাপড়'...

'না', নওশী দৃঢ় গলায় বললো, 'যদি শুধু আমার আত্মা চাও তুমি তা হলে আমাকে উলঙ্গ না করেও তা নিয়ে নিতে পারো। কাপড় আমি খুলবো না।'

হামুন নওশীর ওপর তার কারামতি জাহির করার জন্য আরো কিছু কাণ্ড-কীর্তি করলো এবং ভেল্কিও দেখালো। কিন্তু নওশী কাপড় খুলতে পরিষ্কার অস্বীকার করলো।

হামুন আবার লাঠি নিয়ে নাচানাচি লাফালাফি শুরু করে দিলো। আজব ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো। নওশী দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। নাচতে নাচতে হামুন নওশীর কাছে চলে গেলো এবং আচমকা নওশীর কাপড় ধরে সজোরে টান দিলো। নওশীর কাপড় অনেক খানি ছিড়ে গেলো। হামুন যেন এবার নওশীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। নওশী নিজেকে যতই বাঁচাতে চেষ্টা করলো হামুন তাকে ততই চেপে ধরলো।

নওশী অনেকখানি বিবস্ত্র হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হঠাৎ হামুন মেঝেতে আছড়ে পড়লো। সে তাকিয়ে দেখলো, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাইলী নওশ। সাইলী নওশ আচমকা তাঁবুতে ঢুকে হামুনকে তুলে আছড়ে ফেলে মাটিতে।

সাইলী নওশের পা উঠে গেলো হামুনের পেটে এবং পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার বেরিয়ে এলো তার হাতে। তলোয়ারের অগ্রভাগ তার শাহ রগে রেখে জোরে চাপ দিলো। হামুন সাইলী নওশকে হুমকি-দমকি দিতে লাগলো, তার পালিত জিন ভূতেরা তাকে ছিড়ে ফেড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সাইলী নওশ তার হুমকিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো।

'ওরা এসেই তোমাকে আমার হাতে থেকে বাঁচাবে।'

সাইলী নওশ তার পা দিয়ে হামুনের পেটে চাপ প্রয়োগ করলো এবং তলোয়ারের খোঁচাও বাড়িয়ে দিলো। হামুন ছটফট করতে লাগলো।

'এখন দেখ কে কার হাতে কতল হয়।' সাইলী নওশ বললো, 'নিজের আসল পরিচয় বল, মুখোশ খুলে দে, তা হলেই বাঁচতে পারবি। নিজের মুখে স্বীকার কর এ সবকিছু ধোঁকা আর ভেল্কিবাজি।'

হামুন আবার ভয়ংকর ভয়ংকর কথা বলে সাইলী নওশকে হুমকি দিলো। জবাবে সাইলী নওশ জোরে একটা তলোয়ারের খোঁচা দিলো। হামুনের চামড়া চিড়ে কয়েক ফোটা তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো।

'নিজের গায়েবী শক্তি দেখা', সাইলী নওশ বললো, 'তোর হাতে সত্যিই যদি কোন গায়েবী শক্তি থাকতো তা হলে এতক্ষণ আমি মরে ভূত হয়ে যেতাম। তুই তো আসলে মেয়ে খেকো লম্পট। এ মেয়ের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলি।'

হামুন নিজের রক্ত দেখে ভড়কে গেলো। কাকুতি মিনতি করে বললো,

'তলোয়ার আগে সরিয়ে নাও। ওয়াদা করো জীবনে কখনো কাউকে বলবে না। এ মেয়েরও মুখ বন্ধ রাখবে।'

সাইলী নওশ সেখান থেকে তলোয়ার উঠিয়ে নিলো। কিন্তু সরালো না। তার এক পা হামুনের পেটেই রইলো, তবে চাপ কমিয়ে দিলো। সাইলী নওশ তাকে নিশ্চয়তা দিলো, কেউ জানতে পারবে না। আর এ মেয়ে তো এখান থেকে চলেই যাবে। তবে মিথ্যা বললে পার পাবি না তুই। তোর অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে আমাদের। মিথ্যা বলবি তো এক কোপে দেহ থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

'তুমি ঠিকই বলেছো।' হামুন বললো, 'আমি শুধু জাদু দেখানোর অঙ্গ ভঙ্গিই করতে পারি এবং এসব কেবল ভেল্কিবাজি। আমি যে লাফালাফি করি এর অর্থ হলো, লোকে যাতে আমার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আমি বিনিময়ে কি পাই?... গোত্রের সরদাররা আমার পায়ের তলায় এসে বসে... ভোগ-বিলাসের মত কিছু লোভনীয় জিনিস আমার জন্য সরবরাহ করে। আমি যখন কোন নারী দেহের প্রয়োজন অনুভব করি তখন যে কোন সরদার অনেক বাছাই করে অতি সুন্দরী একটি মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

'তুই কালনাগকে প্রশ্ন করতি। আসলে কি কালগান জাবাব দেয়। চিকন মিহি গলাটা আসলে কার?'

'সেটা আমারই গলা'। হামুন বললো, 'আমি আরো অনেক গলা করতে পারি। এটা কেউ লক্ষ্যই করতো না যে, আমার পিঠ থাকে তখন তাঁবুতে বসে থাকা লোকদের দিকে। আর মুখ থাকে নাগের দিকে। কেউ কোন দিন কল্পনাও করেনি এ মিহি আওয়াজ আমার।'

'আর প্রদীপগুলো নিভে যে আপনা অপনি জ্বলে উঠলো?'

'এটাও ভেল্কিবাজি। যার একটু বুদ্ধি আছে সেই এটা শিখতে পারবে। অথচ আসলে আমি সুন্দরী নারীর শিকারী। আর এ মেয়ে এতই সুন্দরী যে, ওকে দেখে আমি সবকিছুই যেন ভুলে গেলাম। ওকে পাওয়ার পণ করে বসলাম। তুমি না এলে আমার পণ পুরো হয়ে যেতো।'

'তুমি ভুল ভাবছো হামুন!' সাইলী নওশ বললো, 'এ মেয়ে আমাকে সব বলে দিয়েছে, তুমি আসলে কি চাও। সে আমার কাছে সাহায্য চায়। তারপর আমরা পরিকল্পনা করি এবং পরিকল্পনা মতেই আজ সবকিছু ঘটছে।'

'কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি। তুমি কেন এ কাজ করতে এলে?' হামুন বললো, 'ওর হবু স্বামী কেন এলো না? ওর ইজ্জত-আবরুর রক্ষক তো তারই হওয়ার কথা। অথচ সে সেদিন একা একা আমার কাছে এসে বলে, নওশীকে এক রাত নয় দুই রাত তোমার কাছে রাখো। কিন্তু নিজের ওয়াদা পূরণ করো। তুমি ওয়াদা করেছো ওকে সম্রাজ্ঞী আর আমাকে সম্রাট বানিয়ে দিবে। আর শাহেনশাহ হেরাকল মিসরের কিছু অংশ আমাকে দিয়ে দিবে। যেখানে আমাদের বাদশাহী হবে।'

সাইলী নওশ নওশীর দিকে এবং নওশী সাইলী নওশের দিকে ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।'

'হামুন! তোমার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই'

সাইলী নওশ খুনে গলায় বললো, 'তুমি সরলমনা কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছো তার তো কোন হিসাবই নেই। বেঁচে থাকলে আরো হাজারো মেয়ের সতীত্ব তোমার হাতে বলি হবে।'

সাইলী নওশ তলোয়ারের অগ্রভাগ হামুনের শাহরগে চেপে ধরলো এবং পরমুহূর্তে তার ঘাড়ের অর্ধেক কেটে গেলো। সাইলী নওশ হামুনের ঘাড়ে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। এবার হামুনের ধর তার গলার সঙ্গে সামান্য মাত্র ঝুলে রইলো।

হামুন বিদ্যুৎ বেগে ছটফট করছে। চারদিকে যেন রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে। জবাই করা বকরীর মতো তড়পাতে লাগলো হামুন।

নওশী চরম ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে হামুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'চলো নওশী! ওকে ছটফট করতে করতে মরতে দাও।' এর চেয়ে কঠিন শাস্তি দিতে পারলে তাও আমি দিতে কসুর করতাম না।'

ওরা হামুনের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

'আমি রাফীর কাছে যেতে চাই না।' বাইরে এসে নওশী বললো, 'তুমি বলো আমি কি করবো?... তুমি তো জানোই আমি এখানে কেন এসেছিলাম?... তুমি তো আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না। বৃদ্ধ কর্মচারীও আমার কোন সাহায্যে আসবে না। আর রাফীর পরিচয় তো আমি পেয়েই গেছি। লোভ আর লাম্পট্য ছাড়া ওর অস্তিত্বে আর কিছু নেই। সে আমাকে নষ্টই করতে পারবে। সাহায্য করতে পারবে না।'

'আমার কথা শোন নওশী! সাইলী নওশ গম্ভীর গলায় বললো, 'তুমি যে জন্য এসেছো তা কখনো সফল হবে না, মুসলমানদের দলে যেসব বেদুইন যোগ দিয়েছে তারা ভিন্ন ধরনের লোক। এরাও ভিন্ন ধরনের। এদের থেকে দূরে থাকলেই ভালো করবে। তুমি ফিরে যাও।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে!' নওশীর গলায় অনুনয় ঝরে পড়রো; 'আমি এতই ভয় পেয়ে গেছি যে, একলা আমার কদমই উঠবে না। তুমি চলো। তোমাকে এতো এণাম (পুরস্কার) দেবো যে, তুমি হয়রান হয়ে যাবে।'

'কোন লোভ বা মোহে পড়ে ঐ শয়তানের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাইনি আমি।' সাইলী নওশ বললো, 'এটা আমার স্বভাবজাত কর্তব্য... কর্তব্য মনে করেই আমি তা করেছি। তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে পৌছালেও আমি কর্তব্য মনে করেই সে দায়িত্ব পালন করবো।'

'তা হলে চলো, আমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাই।' নওশী বললো তাড়া দিয়ে। রাফী আর বেদুইন কর্মচারী যেন টের না পায়। আমি টিলাগুলোর ওপাশে চলে যাই। তুমি আমার ও তোমার ঘোড়া নিয়ে এসো।'

সাইলী নওশ হামুনের তাঁবুতে গেলো আবার। জানে হামুন মরে গেছে। তবু চোখের নিশ্চয়তার জন্য গেলো আবার। হামুন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। চরম ঘৃণায় তার অপবিত্র রক্তের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

একটু পর দুই গোড়সওয়ার সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

রাফী ও নওশীর বেদুইন কর্মচারী তখন গভীর ঘুমে অচেতন। তারা জানে না তাদের ঘুম ভাঙার পর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কত বড় চমক!

✪ ✪ ✪

নওশী তাড়া দিয়ে বললো, 'কথা বলো সাইলি নওশ! চুপ করে থেকো না। তোমার নীরবতা আমাকে ভীত করে তুলছে।'

সাইলি নওশ বললো, 'আমি তো তোমাকে খুব সাহসী ও নির্ভীক মেয়ে মনে করেছিলাম। যাকে নিয়ে তোমার ভয় ছিলো তাকে তো তোমার সামনেই কতল করে এসেছি। অথচ সেখানে তোমার বাগদত্তা ছিলো। তোমার দুশমন ছিলো না। আর তোমার বাগদত্তাকে তো তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়। সে যে পর্যন্ত জানতে পারবে তোমার লাপাত্তা হওয়ার কথা ততক্ষণে আমরা অনেক দূর চলে যাবো। অবশ্য সে এ সন্দেহও করতে পারে যে, আমি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছি।'

'প্রথমে তো আমার বাগদত্তা যাবে হামুনের তাঁবুতে।' নাওশী বললো, 'রক্তে ডুবন্ত হামুনের লাশ দেখে সে সন্দিহান নয়, নিশ্চিত হবে যে, তুমি হামুনকে কতল করে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এসেছো।'

সাইলি নওশ ভিন্ন মত দিলো, 'সে আমাদের পিছু নিবে না। এ ছাড়াও ওকে ভয়ের কিছু নেই। বাকি আছি আমি। আমাকেও তোমার ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে তোমার মনের ভয় আমি দূর করবো। এ ভয় তোমার তখনই দূর হবে যখন তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবো।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, নওশী বললো, 'আবারও বলছি, আমাকে আমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিলে অগাধ টাকা পয়সার মালিক হয়ে যাবে। তবে একটা কাজ করতে হবে। আমার মা-বাবাকে পুরো ঘটনা শোনাবে। আমার মুখে শুনলে বিশ্বাস নাও করতে পারে। আমার হবু স্বামী রাফীর কথা বলবে সে কি ধরনের মানুষ এবং তার মনোভাব সে কিভাবে প্রকাশ করেছে।'

এতো বলবোই আমি। কিন্তু বার বার পুরস্কার' ধনসম্পদ এসবের নাম নিবে না। আমি আমার পুরস্কার পেয়ে গেছি'।...

'কি বললে?' নওশী সাইলী নওশের কথা কেটে ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠে বললো, 'তোমার একথার অর্থ তো এই নয় যে, আমাকেই তুমি তোমার পুরস্কার হিসেবে উসুল করে নিয়েছো। তুমি কি আমাকে আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে যাবে না?'

'বোকা মেয়ে' সাইলী নওশ বললো, 'আমার পুরো কথা আগে শুনে নাও... আমি বেদুইন নই নওশী! আর আমি খ্রিস্টানও নই'...

'মুসলমান।' 'সাইলী নওশ বললো, 'আমি মিসরী নই আরবী। আর আমার নাম সাইলী নওশ নয়, আব্বাস ইবনে তালহা আমার নাম। তোমার মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় পূর্ণ। আমি যখন তোমাকে তোমার ঠিকানায় পৌঁছে দেবো তখন তুমিই বলবে মুসলমান কেমন হয় এবং কেমন তাদের চাল-চরিত্র। এটা মনে করো না, আমিই একজন ভালো মুসলমান। আমার স্থলে আরেকজন মুসলমান হলেও আমি আজ যা করেছি সেও তা করতো। এটা আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ। যাকে আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম বলে থাকি।'

নওশী এমন হতভম্ব হয়ে গেলো যে, তার ঘোড়া সে দাঁড় করিয়ে ফেললো। আর আব্বাস ইবনে তালহাকে এমন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো যেন সে ভিনগ্রহের কোন অচিন প্রাণী। আব্বাসের ঘোড়া এগিয়ে গিয়েছিলো। দেখলো নওশী সঙ্গে আসছে না।

ঘুরে দেখলো, নওশী ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। আব্বাস তো ভেবেছে, তার মুসলমান পরিচয় পেয়ে নওশী বলে উঠবে, মুসলমানেরা তো অনেক ভালো মানুষ।

'থেমে পড়লে কেন নওশী? আব্বাস তার ঘোড়া নওশীর দিকে ফিরিয়ে বললো, 'আমি মুসলমান বলে তো এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর মুসলমান নিজের চেয়ে অন্যের নিরাপত্তাই সবার আগে নিশ্চিত করে।'

আব্বাস দেখলো, নওশীর ঘোড়া ধীরে ধীরে পিছু হটছে। তারপর নওশীর ঘোড়া এক দিকে রুখ করলো।

আব্বাস বুঝে গেলো, মেয়েটি পালাতে চাচ্ছে। সেও তার ঘোড়া ছুটিয়ে কয়েক মুহূর্তেই নওশীর ঘোড়া ধরে ফেললো। বাধা পেয়ে নওশী তার দিকে তাকালো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

'তুই আমার রাস্তা থেকে সরে যা বুদ্ধু! নওশী দাঁতে দাত পিষে বললো, 'আমি তোর সঙ্গে কখনো যাবো না।'

'বেহুশ হয়ো না নওশী! কী ভেবেছো তুমি?' আব্বাস বোঝাতে চেষ্টা করলো।

'দূরে থাক ধোঁকাবাজ'! নওশী তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললো, 'তুই হয়তো ভাবতে পারিস যে শাহী খান্দানের শাহজাদী। সুখের বশে তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তলোয়ার বের করে আমাকে হত্যা করো। তারপর আমার লাশ নিয়ে যা খুশি করো। কিন্তু সহজে আমাকে হত্যা করতে পারবে না'।

'আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি না নওশী!'

'আমি তোমার ধোঁকায় পড়বোও না বুদ্দু!' নওশী উত্তপ্ত দৃষ্টি হেনে বললো, 'আমি কখনো এটা মানতে পারবো না। বিশ্বাসও করবো না মুসলমানরা কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রাণী হতে পারে... মুসলমান মানেই হিংস্র-মাংসাসী কোন জন্তু। ভয়ংকর কোন প্রাণী...। তুমি আসলে মুসলমানও নও, খ্রিস্টানও নও... কোন ধর্মের লোক নও তুমি... তুমি আরবের মরু দস্যু... তলোয়ার বের করো... তোমার যেন আফসোস না থাকে আমি তোমাকে লড়াইয়ের সুযোগ দেয়নি।'

'তোমার ব্যাপারে আমার সামান্যতম আগ্রহও নেই'। আব্বাস নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো, 'তোমাকে আমি এখানে একা রেখেও চলে যেতে পারবো। কিন্তু একজন মুসলমান এক যুবতী মেয়েকে একা এ মরু বিয়ানে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করে কোথাও যেতে পারবে না। এতে আমার আসল দায়িত্ব উপেক্ষিত হলেও এটাও আমার

উপর আরোপিত কঠিন দায়িত্ব যে, নিঃসঙ্গ অসহায় একটি মেয়েকে পূর্ণ হেফাজত করা। ভয়ংকর ভয়ংকর জীব জন্তু ছাড়াও এখানে পথের প্রতিটি মোড়ে উৎ পেতে আছে মরু দস্যু। তারা তোমার সঙ্গে কী আচরণ করবে তা আমার চেয়ে তুমিও কম জানো না!'

নওশী এতই উত্তেজিত হয়েছিলো যে, আব্বাসের ব্যপারে মোটেও নমনীয় হচ্ছিলো না। তাকে তলোয়ার উচিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছিলো। অবশেষে আব্বাস তার তলোয়ার বের করে তার ঘোড়ার পায়ের কাছে ছুড়ে দিলো। কোমর থেকে খঞ্জর বের করে সেটাও ফেলে দিলো। তারপর এমন কয়েকটা কথা বললো, নওশীর রাগ কমে এলো।

'আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর দিবে?' নওশী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখানে কেন এসেছিলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তুমি যে বলেছো, পুরস্কার পেয়ে গেছো সেটা কি?'

'আমি একজন গুপ্তচর।' আব্বাস জবাব দিলো, 'এজন্য আমি অনেক আগেই এসেছি এসব এলাকায়। এখন ফিরে যাচ্ছি আমাদের সেনাদলে।... পুরস্কার যেটা পেয়েছি সেটা হলো, তোমার কাছ থেকে ও তোমার বাগদত্তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি আমি। তোমাদের ফৌজ কেন পিছু হটছে এতো আমরা আগ থেকেই জানতাম। এখন তোমরা সেটা স্বীকার করায় আমাদের কাজ আরো সহজ হয়ে গেলো। এছাড়াও তোমাদের কাছ থেকে নতুন কয়েকটি তথ্যও পেয়েছি। এগুলো আমার ও আমার ফৌজের জন্য অনেক বড় পুরস্কার মনে করছি আমি'।...

'তারপর হামুন জাদুঘরের মতো এমন ভয়ংকর লোককে হত্যা করাও অনেক বড় পুরস্কার আমার জন্য। কল্প কথা ও কোন মানুষের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী নই আমরা। ভবিতব্যের কথা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনিই পথহারাকে পথ দেখান। হামুন সরলমনা অজ্ঞ লোকদেরকে প্রতারণার জালে ফাঁসিয়ে তার ভক্ত করে রেখেছিলো। তোমার ব্যাপারে আমার আগ্রহ কেবল এতটুকুই ছিলো যে, এক মূর্খ ও ভণ্ড জাদুগর তোমাকে ধোকা দিয়ে তোমার ইজ্জত লুটছিলো। এ কারণে মুসলমান হিসেবে তোমাকে বাঁচানো আমার জন্য ফরয ছিলো।'

'তুমি আমাকে আমার বাবা পর্যন্ত পৌছে দাও' নওশী বললো, 'তুমি নিশ্চয় তোমার আসল পরিচয় আমার বাবাকে দিবে না। আমিও ওয়াদা করছি, তোমার প্রকৃত পরিচয় আমার বাবার কাছে গোপন রাখবো। এটা কি পুরস্কার হবে না? না হলে তো আমার বাবা তোমাকে গ্রেফতার করবেন। কতলও করে দিতে পারেন। আমি তা হতে দেবো না।'

'নওশী!' আমি তোমার বাবা পর্যন্ত পৌছবোই না।' আব্বাস বললো, 'আমাকে কোন লোভ বা ভয় দেখিয়ো না। তোমাকে বিলবীস শহরের বাইরে পৌছে দিয়ে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো। তোমার বাবার কাছে তুমি পৌছতে পৌছতে আমি বহু দুর চলে যাবো।...

তোমাকে আবারও বলছি, নিজের বিবেককে কাজে লাগাও। তোমার অহেতুক সন্দেহ আমাদের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যেন তুমি আমার কবল থেকে পালাতে চাও, আর আমি তোমাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যেতে যাচ্ছি। এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে না পারলে তুমি তোমার পথ দেখো। আমি আমার পথ দেখছি।'

জবাবে নওশী কিছু বলতে পারলো না। যেন সে সন্দেহমুক্ত হতে চেষ্টা করছিলো।

'ঘোড়া থেকে নামো। আমার তলোয়ার ও খঞ্জর তোমার হাতে উঠিয়ে নাও। তারপর আমার সঙ্গে চলো।' আব্বাস বললো।

নওশী গভীর চোখে কিছুক্ষণ আব্বাসের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ঘোড়া থেকে নামলো। তলোয়ার ও খঞ্জর উঠিয়ে আব্বাসের কাছে এগিয়ে এলো। সেগুলো আব্বাসের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। আব্বাস সেগুলোকে নওশীর কাছে রাখতে বললো। কিন্তু নওশী মাথা হেলিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো, সে তার কাছেই রাখবে না। আব্বাকে তাই নওশীর হাত থেকে তলোয়ার ও খঞ্জর নিতে হলো।

নওশীর ঘোড়ায় চড়ে বসলো। তারপর দু'জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলা শুরু করলো।

✪ ✪ ✪

'তোমাদের শাহী খান্দানে শারীনা নামে একটি মেয়ে ছিলো, তুমি কি ওকে চেনো?' আব্বাস জিজ্ঞেস করলো।

'অবশ্যই চিনি। হেরাকলের মেয়ে'। নওশীর বললো, কিন্তু সে তো হারিয়ে গেছে, অনেক দিন তার কোন খোঁজ নেই। তুমি কি করে চেনো ওকে?'

' সে এখন মুসলিম সেনাদলে রয়েছে', আব্বাস উত্তর দিলো। 'না, আমাদের কেউ ওকে অপহরণ করে নিয়ে আসেনি। সে স্বেচ্ছায় নিজের অন্তরের তাগিদে আমার বন্ধুর সঙ্গে এসেছে। এখন শারীনা তার স্ত্রী। আমার এ বন্ধু আমার মতোই গুপ্তচর। সে গ্রেফতার হয়ে হেরাকলের দরবারে চালান হয়। সেখানে শারীনা তাকে দেখে এবং কয়েদখানা থেকে তাকে মুক্ত করে মুসলিম ফৌজে চলে আসে শারীনা।'

'আমি তখন কিশোরী ছিলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো আমার ওর সঙ্গে! তোমাদের ওখানে কি সে সুখ-স্বচ্ছন্দ অনুভব করে?'

'আমি তোমাকে বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। নিজে গিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে সে কতটা সুখী... এমনিতেও শারীনা অতি ভালো মেয়ে। আমাদের ওখানকার

পরিবেশটাই এমন সরল-সুন্দর, যেখানে কোন ধরনের প্রতারণার কালিমা নেই। আছে কেবল ভালোবাসা, সম্প্রীতি, নিষ্ঠা আর উদারতা।'

চলতে চলতে ওদের মধ্যে শারীনার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। নওশী বড় আগ্রহ নিয়ে মুসলিম মেয়েদের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা জিজ্ঞেস করছে। আব্বাস এর উত্তর দিয়ে চলেছে।

'জানি না কেন এখন আমার মনে এসব কথা আসছে'। নওশীর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'মনে এমন ইচ্ছাও জাগছে, তোমার সঙ্গেই চলে যাই... আবার এও মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমি অনুতাপে মরে যাবো। ঐ লোভী বাগদত্তা আমার মনটা একেবারে পিষে দিয়েছে। এজন্য অমি এখন অশুভ চিন্তাভাবনা, করছি। কখনো এ দ্বৈত ভাবনাও আসে যে, শাহী খান্দানের সেই প্রাচূর্যময় মর্যাদার সিংহাসন আজ মাটিতে ভূলুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অন্য দিকে শাহী খান্দানে অশ্লীলতার সবরকম চর্চাই এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তুমি দেখছোই নিজের আবরু রক্ষার জন্য ঐ বুদ্ধু জাদুগরদেরকে তোমার হাতে হত্যা করিয়েছি। আর এখন তোমার বিরুদ্ধেই আমি তলোয়ার উচিয়ে ধরেছি।'

'তোমার ব্যাপারে আমি এমন কিছু ভাবিনি। আর আমি এমন কিছু ভাবতেও চাই না। তুমি তোমার মতো ভাবতে পারো। আমি আমার দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করবো না।'

'আমার মনে আরেকটি ভাবনাও এসেছে। তোমার সঙ্গে তো আমি যাচ্ছি, কিন্তু জানি না তোমার খান্দান-বংশমর্যাদা কী?... আসলে আমি বলতে চাই'...

'তুমি কি বলতে চাও তা আমি বুঝে গেছি,' আব্বাস মাঝপথে বলে উঠলো, 'তুমি জানতে চাচ্ছো, আমিও কি তোমার মতো শাহী খান্দানের কেউ কিনা অথবা আমার বংশীয় মর্যাদা কী? যদি বলি, আমি অনেক বড় বংশের লোক তাহলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে রাজি, আর না হয় রাজি নয়।'

নওশীর হেসে উঠলো। তার হাসির মধ্যে স্পষ্ট সারল্য ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আব্বাস আরো বলতে উৎসাহ পেলো।

'তুমি শুনে হয়রান হয়ে যাবে নওশী! ইসলামে কোন শাহী খান্দান নেই। আমরা যাদেরকে শাসনকর্তা বানাই তিনিও শাহী খান্দানের কেউ হন না। আমাদের সবাই এক। সকলের অধিকার– অবস্থান সমান। সমতার এক নির্মল চিত্র। আমাদের খলীফা আমাদের সেনাদল পরিদর্শনে আসলে তুমি দেখে মোটেও বিশ্বাস করবে না যে, তিনি বিশ্বজয়ী এক জাতির কর্ণধার। তুমি বলবে ইনি তো সাধারণ একজন মানুষ। ইসলামে রাজা আর প্রজার

কোন কাল্পনিক চিত্রায়ণও নেই। মানুষকে ভালোবাসা আর সম্প্রীতির একই সুতোয় গাঁথা আমাদের ঈমানের পরিচায়ক। তোমাকে ঐ শয়তান থেকে এজন্য বাঁচাইনি যে, তুমি শাহী খান্দানের অতি এক সুন্দরী এক মেয়ে। বরং এজন্য যে তুমি অসহায়, অক্ষম একটি মেয়ে। যে আবেগের বশে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে'।

'তাহলে মুসমলমানদের ব্যাপারে যা কিছু শুনে আসছি তা কি ভুল? নওশীর জিজ্ঞেস করলো, 'শুনেছি মুসলমানরা নাকি লুটেরা আর জঙ্গলী লোক।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করো না,' আব্বাস বললো, মিসরের দু'টি বড় শহর আরীশ ও ফারমা আমরা জয় করেছি। এ দু' শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় ও আশেপাশে অসংখ্য গ্রাম রয়েছে। সেখানে গিয়ে স্থানীয় খ্রিস্টানদের জিজ্ঞেস করে দেখো, বিজয়ী মুসলমানরা ওদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে। তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তুমিও শাহী খান্দানেরই সদস্য। তুমি যদি আমাকে তোমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও তবুও আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো না। কারণ, তুমি আমার কাছে একটি আমানত। তোমার মা বাবার আমানত। ইসলামের নির্দেশ হলো, আমানত তার মালিকের কাছে পৌঁছে দাও।'

✪ ✪ ✪
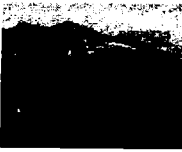
'দাঁড়াও'। আব্বাস ঘোড়ার লাগাম টেনে বললো, 'ঘোড়ার ক্ষুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছো?'

নওশীও ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। তার কান দুটো সজাগ হয়ে গেলো। দূর থেকে ঘোড়ার ছুটন্ত আওয়াজ আসছে। দু'জনেই আশংকা করছে, নওশীর বাগদত্তা যখন জানতে পারবে নওশী ও সাইলী নওশ (আব্বাস) গায়েব হয়ে গিয়েছে তখন সে অবশ্যই পিছু ধাওয়া করতে বেরিয়ে পড়বে। ঘোরসওয়ার নওশীর বাগদত্তাও হতে পারে, আবার কোন বেদুঈনও হতে পারে। কারণ, হামুনের অনেক বেদুইন শিষ্য রয়েছে।

চাঁদনী রাত। চাঁদ এখনও ওদের মাথার ওপর ভাসছে। ওরা ধীর গতিতে চলছে আর পেছন ফিরে ফিরে দেখছে। ঘোড় সওয়ার ছুটে আসছে তীব্র বেগে। দেখতে দেখতে সওয়ার কাছে এসে গেলো।

'নওশী!' ঘোড় সওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লো, 'এত সহজে পালাতে পারবে না। তলোয়ার বের কর বুদ্ধ! তারপর যেন বলতে না পারিস আমি তোকে লড়ার সুযোগ দেয়নি।'

হ্যাঁ, এ নওশীর বাগদত্তাই। বাগদত্তার ঘোড়া নওশী ও আব্বাসের ঘোড়ার মাঝখানে ছুটাছুটি করছে।

'আয় রোমী! আমিও তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি' আব্বাস ইবনে তালহা বললো, 'এ মেয়েকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না। ওকে নিয়ে যাচ্ছি ওর মা বাবার কাছে।'

'মিথ্যাবাদী তুই বুদ্ধু! আমি জানি তুই ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?'

নওশী আব্বাসকে তলোয়ার বের করতে বললো। নিজেও তার তলোয়ার কোষমুক্ত করলো। নওশীর বাগদত্তা এমন অশ্লীল কথাবার্তা বলতে লাগলো যে, আব্বাস তলোয়ার বের করতে বাধ্য হলো। আব্বাস চাচ্ছিলো ব্যাপারটি লড়াই পর্যন্ত যেন না গড়ায়। কিন্তু বাগাদত্তা উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলো আর আব্বাসের সামনে তলোয়ার হেলিয়ে হেলিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছিলো।

অবশেষে ঘোড়ার ওপরে থেকেই দু'জনের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেলো। দু'জনেই জি নিজ ঘোড়া ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে দিক বদল করে করে একজন আরেকজনের ওপর আক্রমণ করছে। আক্রমণ প্রহিতও করছে।

নওশী ও তার বাগদত্তার ওপর হামলা উদ্যত্ত হলো। কিন্তু আব্বাস তাকে ধমকিয়ে সরিয়ে দিলো এবং বললো, এক লড়াইয়ে দু'জন এক সঙ্গে যোগ দেয়ার অর্থ হলো কাপুরুষকতা। ক্রমেই লড়াই তীব্রতর আকার ধারণ করলো। নওশী রাগে এতই ফুলে ফেঁপে রয়েছে যে, লড়াই থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না। বার বার সে দু'জনের মাঝখানে এসে যাচ্ছে। কিন্তু আব্বাস তাকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

'ওকে আগে আসতে দে', বাগদত্তা ক্রুদ্ধ গলায় বললো, 'আমার তলোয়ারেই ওর মৃত্যু লেখা রয়েছে। তোমরা দু'জনের কেউ আজ বাঁচতে পারবে না।'

'তুমি পেছনে সরে যাও আব্বাস'! নওশী রাগিনী গলায় বললো, 'সে আমার হাতেই মরবে।'

'নওশী! এগিয়ো না এ দিকে' আব্বাস বললো, 'আমি একে জীবিত রাখতে চাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমার তলোয়ার মুসলমানের খুনেরই পিয়াসী।' বাগদত্তা বিদ্রূপ করে বললো।

সঙ্গে সঙ্গে বাগদত্তা আব্বাসের ওপর কঠিন ক্রোধে হামলা চলালো। কিন্তু ততক্ষণে আব্বাসের তলোয়ার বাগদত্তার পাজরে বিঁধে গেছে। আব্বাস তলোয়ার টেনে নিয়ে তার ঘাড়ে এত জোরে আঘাত হানলো যে, বাগদত্তার অর্ধেক ধড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। বাগদত্তা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো।

'চলো নওশীর!' আব্বাস বললো, 'আমি ওকে জীবিত থাকতে অনেক সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু এটাই ছিলো ওর পরিণতি।'

নওশীর পক্ষ থেকে আব্বাস কোন জবাব পেলো না। যেন নওশী সেখানে নেই। আব্বাস সেদিকে ঘুরে দেখলো যেদিকে নওশীর থাকার কথা ছিলো। কিন্তু সেখানে শুধু নওশীর ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে আছে। নওশী ঘোড়ার পিঠে নেই। নওশী মাটিতে পড়ে আছে। আব্বাস ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে নওশীর দিকে দৌড়ে গেলো, নওশীর কাপড় রক্তে লাল হয়ে আছে।

আব্বাস নওশীর কাছে বসে পড়লো। আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কি করে হলো। নওশী কাতর স্বরে শুধু এতটুকু বলতে পারলো, ঐ শয়তান ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে আমার বুকে লক্ষ্য করে তলোয়ার ছুড়ে মেরেছিলো এই ছিলো নওশীর শেষ বাক্য। এক দিকে তার মাথাটি ঢলে পড়লো।

আব্বাস তো টেরই পেলো না নওশীরকে তার বাগদত্তা কখন এবং কিভাবে তলোয়ার মেরেছিলো। এজন্যই আব্বাস বার বার নওশীরকে ওদের লড়াই থেকে দূরে থাকতে বলছিলো। কিন্তু নওশীর অবাধ্যতাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

লাশ দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আব্বাস। তারপর উঠে পড়লো। ওদের ঘোড়ার লাগাম নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিলো। আব্বাস এত উন্নত জাতের ঘোড়া দু'টো হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলো না।

এমন সুন্দরী একটি মেয়ের মৃত্যু আব্বাসকে মোটেও ভাবিত করলো না। নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া একটি দায়িত্ব থেকে এত দ্রুত মুক্তি পেয়ে বরং সে বেশ নিশ্চিতবোধ করলো।

আব্বাসের ঘোড়া মাত্র খানিক দূর গিয়েছে। তখনই সে ছুটন্ত ঘোড়ার দূরবর্তী শব্দ শুনতে পেলো। আব্বাস কোথাও লোকানোর চেষ্টা করলো না। সে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে আগন্তুক সওয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পর চাঁদের পরিষ্কার আলোতে একজন সওয়ারের অবয়ব দৃষ্টি সীমায় ধরা পড়লো। তার হাতে কোন তলোয়ার নেই। কিন্তু আব্বাস তার তলোয়ার প্রস্তুত রাখলো। কারণ, এ কোন ধূর্ত বেদুইনও হতে পারে। ঘোড়সওয়ার নওশী ও তার বাগদত্তার লাশের কাছে থেমে পড়লো। ঘোড়া থেকে নামলো এবং লাশ দুটোর সামনে হাটু মুড়ে বসে পড়লো। চাঁদের পরিস্কার আলোতেও এত দূর থেকে সওয়ারের মুখটি চেনা যাচ্ছিলো না।

আব্বাস সেদিকে এগিয়ে গেলো। তখনই চিনতে পারলো, এ নওশীর বেদুইন মুলাযেম (কর্মচারী)। আব্বাসকে তার দিকে আসতে দেখে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালো। আব্বাস ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে চলে গেলো। মুলাযেমের পক্ষ থেকে আব্বাস কোন কিছুই আশংকা করছিলো না।

'এসব কী হয়ে গেলো?' মুলায়েম বিস্ফোরিত চোখে অবিশ্বাস্য গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'মৃত্যু এই হতভাগাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে'। আব্বাস বললো, 'তোমার এ শাহজাদীকে হত্যা করেছে তার বাগদত্তা। তার বাগদত্তা মরেছে আমার তলোয়ারের আঘাতে। তুমি কি ওর পেছন পেছন এসেছো?'

'আমি শাহজাদীর খোঁজে এসেছি'। মুলায়েম বললো ভারী গলায়, 'বড় ভালো ছিলো শাহজাদী। আমাকে কখনো মুলায়েম মনে করেননি'...

মুলযেম ঢুকের কেঁদে উঠলো। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

'আপনি যখন তাঁবু থেকে ঘোড়ার জিন নিয়ে বের হলেন তখনই আমার চোখ খুলে যায়। পরে উঠে নিঃশব্দে আপনাকে অনুসরণ করতে থাকি। আপনাকে কিছু বলবো সে সাহস আমার ছিলো না। তারপর আপনাকে ও নওশীকে ঘোড়ায় সওয়ার হতে দেখলাম। কোন দিকে আপনারা যাচ্ছেন তাও দেখলাম। কিন্তু আমার এ সাহস ছিলো না, নওশীর বাগদত্তাকে গিয়ে বলবো, আব্বাস ও নওশী পালিয়ে যাচ্ছে।...

'তখনই নওশীর বাগদত্তাকে দেখলাম হামুন জাদুগরের তাঁবুর দিকে যাচ্ছে। তারপর হামুনের তাঁবুতে ঢুকে পড়লো এবং পরক্ষণেই তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। আমিও তার দিকে এগিয়ে গেলাম। অমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে দৌড় এলো কেন? সে বললো, হামুনকে খুন করা হয়েছে। আর ঐ বুদ্ধু (আব্বাস) ও নওশীরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'সে আমাকে বললো,

'তুমি নিশ্চয় জানো, বুদ্ধু হামুনকে কতল করে নওশীরকে তার এলাকাতেই নিয়ে যাবে। আমাকে তুমি ঐ বুদ্ধুর সরদারদের কাছে নিয়ে চলো।'

আমি বললাম, সাইলী নওশ ফারমা বা বিলবীসের দিকে যেতে পারে। নিজেদের এলাকায় যাবে না। নওশীর বাগদত্তা রাগে ফেটে পড়ে বললো, এই বুদ্ধু সাইলী নওশ নিজের কবীলা ছাড়া অন্য কোন দিকে যাবে না। তুমি বলো ঐ বুদ্ধুর কবীলা কোন দিকে?'

আমি বললাম, সোজা গিয়ে অনেক দুরে যাওয়ার পর দু' দিকে দুটি পথ ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকের পথে অনেক দূর যাওয়ার পর একটি এলাকা আসবে। সেখানে বেদুইনদের দুটি গোত্র থাকে...

'বাদগত্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি সাইলী নওশকে চিনি কি না। আর সে কোন গোত্রে থাকে। আমি বললাম, না, ওকে এই প্রথমবার দেখেছি। তবে আমার সন্দেহ হয় সে বেদুইন নয়।

বাগদত্তা বললো, 'আমারও এ ধরনেরই সন্দেহ হয়। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

আমি কাকুতি মিনতি করে বললাম, আমি দ্রুত ঘোড়া ছুটাতে পারি না। আর কোথাও লড়াইয়ের প্রয়োজন হলে আমি লড়তেও পারবো না। নওশীর বাগদত্তা এত ক্রুদ্ধ ও অস্থির ছিলো যে, আমাকে আর তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করলো না। নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু আমিও সেখানে বেশি সময় থাকতে পারলাম না। একবার চিন্তা করলাম, আর বিলবীস যাবো না, ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু আবার মনে হলো। নওশী আমাকে না পেয়ে আমার গোত্রে ফৌজ পাঠিয়েও আমাকে গ্রেফতার করে আনাতে পারে। তাই আমি বিলবীসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। তারপর পথে এসে এখানে নওশী ও তার বাগদত্তার লাশ পেলাম। এখন আমি কি করবো?

'তুমি তোমার শাহজাদীর খোঁজে বেরিয়ে ছিলে এবং তুমি দায়িত্বও পালন করেছো। এখন তোমার পথে তুমি চলে যাও। তবে তোমার নিজ গোত্রে গেলেই ভালো করবে।' একথা বলে আব্বাস তার ঘোড়া ফারমার দিকে রুখ করলো

✪ ✪ ✪

আব্বাস প্রায় দেড় দিন সফর করে ফারমা পৌছলো এবং সরাসরি সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে গেলো। আব্বাস আমর (র) এর গুপ্তচর বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। এক মাস পর আব্বাস মিসরের মিশন শেষ করে আমর (রা) এর সাক্ষাতে গেলো।

'নতুন কোন খবর এনেছো?' আমর (রা) আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন।

আব্বাস তার গুপ্তচর বৃত্তির পূর্ণ রিপোর্ট সিপাহসালারের সামনে পেশ করলো। নওশীর ও হামুনের ঘটনাও শোনালো। সেখানে যা ঘটেছে তার কোন কথাই গোপন করলো না। সিপাহসালার তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন, অযথা কেন এ ধরণের ঝুকিপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লো? সে তো নওশীর বাগদত্তার হাতে কতলও হতে পারতো।

'এতে আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিলো না সিপাহসালার!' আব্বাস বললো, 'আমি মেয়েটির মুখে শুনলাম, সে বেদুইন গোত্রগুলোকে রোমী ফৌজ ভিড়াতে এসেছে এবং মুসলমানদের ফৌজে যে বেদুইন ব্যাটালিয়ান আছে তাদেরকে যে করে হোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে হবে। তখনই আমি ছদ্মবেশ ধারণ করে

ওদের দলে ভিড়ে যাই। তাদের কর্মকাণ্ড ও এর ফলাফল দেখা তো আমার জন্য তখন জরুরী হয়ে পড়ে। ব্যাপারটি আমাদের জন্য স্পর্শকাতরও...

'হামুন জাদুঘরকে হত্যা করার একটি কারণ হলো, সে এমন মেয়ের আবরু বিনষ্ট করতে যাচ্ছিলো, যে এতে সম্মত নয় এবং তাকে ঘৃণা করতো। আরেকটি কারণ হলো, বেদুইন সরদারদের ওপর হামুনের যে প্রভাব রয়েছে এতে তারা হামুনের ইংগিতকেও অনেক গুরুত্ব দেয়। সে ঐ মেয়েকে সন্তুষ্ট করার জন্য সরদারদের বলতো, তারা লশকর প্রস্তুত করে যেন রোমী ফৌজকে দিয়ে দেয়। হামুনকে হত্যার মাধ্যমে এ শংকা খতম করে দিলাম। আর নওশী ও তার বাগদত্তাও মারা পড়েছে।'...

'আর তাদের দু'জনের কাছ থেকে যে মূল্যবান তথ্য পেয়েছি সেটাও নিশ্চয় গুরুত্ব দেবেন মহামান্য সিপাহসালার! কিছু তথ্যের সত্যতা তো ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মুকাওকিস ও আতরাবুনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। মুকাওকিস সতর্ক, প্রতিরোধের পক্ষে। আর আতরাবুন আক্রমণাত্মক মনোভাবের। হেরাকল তাদের দু'জনকে পূর্ণ অধিকার দিয়ে রেখেছেন। তবে কিবতী খ্রিস্টানরা যাতে বিদ্রোহ করতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।'...

'মেয়েটি শাহী খান্দানের ছিলো বলে তার প্রতিটি কথাই নির্ভরযোগ্য মনে করেছি। হেরাকলের বিরুদ্ধে সে ঘৃণাও প্রকাশ করেছে কয়েকবার। সে বলতো, হেরাকলের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছে। শামের পরাজয় তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই তিনি মিসর থেকে দূরে থাকতে চান, পরাজয়ের আরেকটি কলঙ্ক যেন তার কপালে লেপন না হয়।'

'বেদুইনরা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে যাবে না।' আমর ইবনে আস (রা) বললেন, 'তাদেরকে আমরা মুসলমানদের সমপরিমাণ মালে গণীমত দিয়েছি। তাই ওরা বেশ খুশিও।'

'ফয়সালা তো আপনিই করবেন সিপাহসালার!' আব্বাস পরামর্শ দেয়ার সুরে বললো, 'আমি যে অবস্থা দেখে এসেছি এর ভিত্তিতে আমর পরামর্শ হলো, সেনা-সাহায্যের অপেক্ষা করা উচিত হবে না এখন আমাদের। অনতিবিলম্বে বিলবীসের দিকে কোচ করা উচিত। রোমীয়দের সামলে নেয়ার ও নতুন করে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। এমনকি ওদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশটুকুও দেয়া যাবে না।'

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, সিপাহসালার আমর (রা) সেনা সাহায্যের প্রতীক্ষায় কালক্ষেপন করার পক্ষে ছিলেন না কখনো। তিনি আগ থেকেই সৈন্যদলকে প্রস্তুত করে রাখেন। সালার ও কমাণ্ডারকে বলে দিয়েছেন। দুশমনের পিছু ধাওয়া অব্যহত রাখতে হবে।

✪ ✪ ✪

মদীনায় হযরত উমর (রা) একদিন নামাযের পর আলোচনায় বসলেন। সেখানে তার পরিষদ বর্গের সবাই রয়েছেন। এর মধ্যে মিসর অভিযানের বিরোধী পক্ষ্যও রয়েছেন। উমর (রা) সেনা সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা উঠালেন। সেনা সাহায্য নিয়ে সবাই পেরেশান। পূর্বের বিরোধী পক্ষের সাহাবীগণও বেশি উদ্বিগ্ন। উমর (রা) অত্যন্ত মনোগ্রাহী সুরে কথা বলতেন। শ্রোতার মনে দাগ কেটে যেতো। তিনি একথা বললেন না, যারা একদিন মিসর অভিযানের ব্যাপারে ঘোর বিরোধী ছিলেন তারাও আজ, সেনা সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে জোর দিচ্ছেন। তিনি শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ তাআলা সৎ নিয়তের অনেক বড় প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

তারপর তিনি সেনা সাহায্য বিলম্বের কারণও উল্লেখ করলেন। মুসলিম সৈন্যদল এখন সুবিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিসরায়ে ইরান এখন পরাজিত পরাশক্তি হলেও আহত বাঘের মতো সর্বশেষ আঘাত হানার শত ভাগ আংশকা রয়েছে এখনো। এজন্য ইরাক ইরান থেকে সৈন্য হ্রাস করাটাও ঝুকিপূর্ণ।

এদিকে শামের পুরো সাম্রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মহামারীর ধ্বংসলীলা মুজাহিদীনে ইসলামের প্রায় এক তৃতীয়াংশকে গ্রাস করে নিয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত অনেক সালার সিপাহসালার মুজাহিদরা হারিয়েছে। সে সকল মহাত্মগণের শূন্যস্থান পূরণ করাই তো দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উমর (রা) আরেকটি দিক উল্লেখ করলেন যে, তিনি নিশ্চিত, আমর ইবনে আস (রা) এতক্ষণে আরীশ শহর জয় করে ফেলেছেন। আর সম্ভবতঃ সেনা সাহায্যের আশায় থেকে ফরমা শহরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

মুসলিম সেনা দলে বেদুইনদের একটি লশকর যোগ দেয়ার সংবাদ আমর ইবনে আস (রা) হযরত উমর (রা) কে পয়গাম মাধ্যমে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। উমর (রা) এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। সবাই এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন যে, অবিশ্বাস্যভাবে আল্লাহ তাআলা বেদুইনদেরকে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিয়েছেন এবং মুজাহিদদের রসদের অভাবও দূর করে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে ফরমা বিজয়ের সংবাদও এসে গেলো। মসজিদে নববীতে উপস্থিত সবাই নিশ্চিত হলেন, আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য মুসলমানদের সঙ্গে আছে। উমর (রা) বললেন, ফারমা জয় করলেও আমর ইবনে আস (রা) এখন আর সেনা সাহায্য ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না।

✪ ✪ ✪

এর কয়েকদিন পরই ফারমা থেকে আমর ইবনে আস (রা) এর আরেকটি পয়গাম এলো উমর (রা) এর কাছে। এর পূর্বে পয়গামে কেবল ফারমা বিজয়ের সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছিলো। এ পয়গামে বিস্তারিত সব জানানো হয়েছে। কি পরিমাণ প্রাণহানি ঘটেছে। বেদুঈনরা কতজন মারা গেছে। এমন অনেক যখমীও হয়েছে যারা চিরদিনের জন্য কিংবা দীর্ঘ দিনের জন্য আর অস্ত্র হাতে নিতে পারবে না। এখন মুজাহিদদের সংখ্যা এতই কমে গেছে যে, দূর থেকেও তাদেরকে গোনা যায়। সেনা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তাই এখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

আমর ইবনে আস (রা) এও লিখলেন যে, পর দিন সকালেই তিনি বিলবীসের অভিমুখে রওয়ানা করবেন।... এ সংবাদটা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) কে পেরেশান করে তুললো। তিনি ভালো করেই বুঝতে পারছিলেন, এ সামান্য সৈন্য নিয়ে বিলবীস অবরোধ করা কত বড় ঝুকিপূর্ণ কাজ এবং আত্মঘাতী। আমর ইবনে আস (রা) এত দ্রুত এ পদক্ষেপ নেয়ার অনিবার্য কারণও লিখেছেন। সেটা হলো, রোমীয়দেরকে সামলে উঠার ও চিন্তা ভাবনার সুযোগ দেয়া যাবে না। তারা যেন এটা অনুভব না করে যে, মুসলমানরা দূর্বল হয়ে পড়েছে।

হযরত উমর (রা)ও এটা খুব ভালো করে জানতেন। রোমীয়দের চালও ছিলো তাই যে, মুসলমানরা মিসরের আরো ভিতরে ঢুকে পড়ুক। তারপর তাদেরকে ঘিরে ফেলা হবে। পেছন থেকে তাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। শত্রুর চাল জানাই যথেষ্ট নয়, তা ব্যর্থ করার জন্য নতুন চালও দিতে হয়।

আমর ইবনে আস (রা) শত্রুর এই চাল বুঝতে পেরেই ফারমা থেকে কোচ করছিলেন। চাচ্ছিলেন, দ্রুত ফারমা থেকে বিলবীস পৌঁছে শহর অবরোধ করা হবে। কিন্তু তার সঙ্গে যে সংখ্যক মুজাহিদ আছে তাদেরকে নিয়ে বিলবীস জয় করা কি সম্ভব ? বেদুইনদেরসহ মুসলমানদের সংখ্যা সর্বমোট পাঁচ হাজারের কিছু বেশি হবে।

এ কারণে হযরত উমর (রা) তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন, যে করেই হোক আমর ইবনে আস (রা) এর জন্য মিসরে সেনা সাহায্য পাঠাতে হবে। উমর (রা) মসজিদে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, মিসরের জন্য কমপক্ষে চার হাজার সৈন্য পাঠাতে হবে। আগ্রহীদের এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সেনা ক্যাম্পে যোগ দিতে হবে অতি সত্বর।

প্রত্যাখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল হাকাম লিখেছেন, আগ থেকেই হযরত উমর (রা) এর দৃষ্টিতে বিশিষ্ট সাহাবী যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) এর বিশেষ এক স্থান ছিলো। যুদ্ধ ও রণাঙ্গনের নেতৃত্বের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত ভাই।

হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) নিজেও কয়েকবার উমর (রা) এর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাকে মিসরে আমর ইবনে আস (রা) এর সৈন্যদলে পাঠানো হোক। কিন্তু উমর (রা) তাকে চরম সংকট মুহূর্তের জন্য তার হাতে রেখে দিয়েছিলেন। যেখানেই কোন বড় ধরনের সংকট ও শূন্যতা দেখা দিবে সেখানেই তাকে পাঠানো হবে। তাই তিনি এ মুহূর্তে তাকে ডেকে পাঠালেন।

'আবু আবদুল্লাহ!' আমীরুল মুমিনীন যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) এর অন্য নামে ডেকে বললেন, 'তুমি কি মিসরের নেতৃত্বের আকাংখী?'

'না, আমীরুল মুমিনীন!' যোবায়ের (রা) বললেন, 'আমার নেতৃত্বের প্রয়োজনও নেই এবং আমি এর আকাংখীও নই। আপনি যদি কোন ময়দানে আমাকে পাঠাতে চান তাহলে আমি জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য যাবো। আমি জানি, আপনি আমাকে মিসর পাঠাতে চান। মিসরের জন্য সেনা সাহায্য প্রস্তুত হচ্ছে তাও শুনেছি। আমি অবশ্যই যাবো আমর ইবনে আস (রা) যদি মিসর জয় করে নেন তাহলে তার কোন কাজে তো আমি হস্তক্ষেপ করবোই না। বরং তাকে মিসরের শাসনকর্তার পদকে অলংকৃত করতে দেখে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবো।'

আরবের কাব্য জগতে হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) এর প্রসিদ্ধ এক কবি হিসেবে খ্যাতি ছিলো। তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবল ফুফাত ভাই ছিলেন না। মর্যাদার প্রশ্নে তার স্থান ছিলো আরো উঁচুতে। তিনি ষোল বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ার উভয় হিজরতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মদীনার হিজরতকালেও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তিনি প্রতিটি যুদ্ধে ছিলেন এবং জানবাজি রেখে লড়াই করেন। এ মর্যাদা একমাত্র তিনিই অর্জন করেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়েন এবং দুশমনের কলিজার ভেতর ঢুকে অতি মূল্যবান তথ্য নিয়ে অক্ষত ফিরে আসেন।একাধিকবার তিনি এ বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'প্রত্যেক নবীরই একজন হাওয়ারী (একান্ত সহচর) থাকে। আমার সহচর হলো যোবায়ের ইবনুল আওয়াম।'

প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা) ও আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) তার প্রতি সবিশেষ মহব্বত রাখতেন।

তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে, কেউ একবার তার সঙ্গে পরিচিত হলে তার ভক্ত বনে যেতো এবং সেনাদলের নেতৃত্ব তার হাতে দেয়া হতো। তাই তার ইংগিতে নির্দ্বিধায় জান কুরবান করে দিতো।

এই যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)-কেই হযরত উমর (রা) মিসরের জন্য সাহাযাকারী সেনাদল প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিলেন। যোবায়ের (রা) রাত দিন একাকার করে অবিরত পরিশ্রম করে একটা সেনদাল প্রস্তুত করলেন। যার সংখ্যা চার হাজার ছিলো। হযরত উমর (রা) এই দলকে চার ব্যাটিলিয়নে ভাগ করলেন এবং চারজন সালার নিযুক্ত করলেন। প্রত্যেক সালারের অধীনের রইলো এক হাজার মুজাহিদ।

এই সালারদের অগ্রগণ্য হলেন হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)। অন্যরা হলেন উবাদা ইবনে সামিত (রা), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ সুলামী (রা) ও খারিজা ইবনে হুযাফা (রা)। এই সালারগণের সিপাহসালার নিযুক্ত হলেন যোবায়ের (রা)।

এই সেনাদলের সঙ্গে তিনি আমর ইবনে আস (রা) এর কাছে লিখিত এক পয়গাম পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল,

তোমাদের জন্য আমি চার হাজার মুজাহিদ পাঠাচ্ছি। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন চারজন সালার যাদের অভিজ্ঞতা ও দীপ্ত ঈমান এত আকাশ চুম্বী যে, এক একজন সালার এক হাজার মুজাহিদের সমান। ধরে নাও, তোমাদেরকে আমি বার হাজার মুজাহিদ দিচ্ছি। আমি পূর্ণ আশাবাদী বার হাজার জানবাজ কখনো শত্রুর কাছে পরাজিত হবে না। শত্রুর সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন।

যেদিন এ সেনাদল ফজর নামাযের পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলো সেদিন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা) প্রমুখসহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিলেন। তারপর এক স্থানে এই সেনাদলকে সবাই জানালেন আলবিদা।

✪ ✪ ✪

অবশেষে একদিন আমর ইবনে আস (রা) সেনা সাহায্যের অপেক্ষা বাদ দিয়ে তার সেনাদলকে বিলবীসের দিকে কোচ করার হুকুম দিলেন। ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ কোচ করা শুরু হয়।

এর একদিন পরে অবশ্য তিনি মদীনায় পয়গাম পাঠিয়ে দেন, তিনি তার বাহিনী নিয়ে বিলবীসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। তাই এখন সেনা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

সেদিনই কাসেদকে মদীনার পথে বিদায় দিয়ে তার সেনাদলের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে ভাষণ দিলেন,

'ইসলামী সেনাদল! আল্লাহর পথের মুজাহিদ গণ! তোমরা আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর পথে যাচ্ছো। তোমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। এটা আমাদের ঈমান। আমাদের দুশমন আমাদেরকে পরাজিত করে এটা প্রমাণ করতে চায় যে, আমাদের ঈমান ভ্রান্ত এবং আমরা ভ্রান্ত দ্বীনের অনুসারী। আমাদের সঙ্গে সে দ্বীনের পয়গামই নিয়ে এসেছি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পৌছে দিয়ে গেছেন। আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর হুকুম হলো, এ দ্বীনের বাণী আল্লাহর প্রতিটি বান্দার কাছে পৌছানো আমাদের জন্য ফরয। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের যে সমূদ্রের বুক চিড়তে হবে। পাহাড়ের কঠিন শিলা করতে হবে বিদীর্ণ। সমস্ত ভয় ও আধিপত্যকে পিষতে হবে আমাদের পদভারে।

তারপর আমর ইবনে আস (রা) সৈন্যদলকে তাদের বিভাগ - বিন্যাসের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবগত করলেন। অগ্রসরমান সেনাদলকে যেভাবে বিন্যাস করেন সেটা ছিলো এমন যে, সেনাদলের রক্ষবুহ্য ছিলো সবার আগে। অবশ্য এরও অনেক আগে কয়েকজন মুজাহিদকে স্থানীয় কৃষক ও শ্রমিকের বেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। ওরা ছিলো গুপ্তচর।

রক্ষবৃহ্যের পেছনে যাচ্ছিলো আরো কয়েকটি ছোট ছোট ব্যাটিলিয়ন। ডানে ও বামে বিশেষ দূরত্ব বজায় রেখে এক একটি ব্যাটিলিয়ন যাচ্ছে। পুরো লশকরই এমনভাবে যাচ্ছে যেন নিরিহ এক কাফেলা যাচ্ছে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) জানতেন, রোমী জেনারেলরা তাদেরকে যেকোন সময় বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে চার দিক থেকে আক্রমন করতে পারে। গোয়েন্দা

মাধ্যমে আমর (রা) আগেই জানতে পেরেছেন, রোমীয়রা মুজাহিদদেরকে মিসরের আরো ভেতরে গিয়ে তারপর ঘেরাও করে সমূলে খতম করতে চায়। শত্রুর গোপন চাল ও কলা কৌশল সম্পর্কে আমর ইবনে আস (রা) আগ থেকেই উপলব্ধি করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গেই এর সতর্ক প্রতিকারের দক্ষতাও তার সহজাত ছিলো।

ফারমা থেকে বিলবীসের দূরত্ব যতই হোক পথ ছিলো অতি ভয়ংকর। নীলদরিয়া এ এলাকার এসে কয়েক শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু শাখা তো বিশাল উত্তাল নদীর রূপ নিয়েছে। এ কারণে চার দিকের এলাকা পিচ্ছিল ও অসমতল ভূমিতে ভরা।

নদী সিক্ত সবুজ বৃক্ষের ঘনত্ব পথ আরো সংকীর্ণ করে তুলেছে। আরো আছে কিছু এলাকা পাহাড়ি ও অত্যন্ত অসমতল। নীলনদের এসব শাখা নদীগুলো অতিক্রম করাও কঠিন ব্যপার। সব চেয়ে বড় বিপদ মুসলিম সেনাদলকে যেটা তাড়া করছিলো, তা হলো, রোমী ফৌজে ইচ্ছে করলেই তাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে কোনঠাসা করে খতম করে দিতে পারে।

বিলবীসের এ পথে মাজদাল নামে বড় একটি মফস্বল গ্রাম রয়েছে। সেখানে গিয়ে তদন্ত চালানোর পর জানা গেলো, এখানে কোন রোমী ফৌজ নেই এবং এখানে কখনো কোন রোমী ফৌজ আসেনি। সেখানকার নেতৃস্থানীয় সরদারদের ডাকালেন আমর ইবনে আস (রা)। তারা তাকে এ নিশ্চয়তা দিলো যে, রোমী ফৌজ তাদের সহযোগিতা চাইলে তারা অস্বীকার করতে তো পারবে না। কিন্তু সহযোগিতাও করবে না।

আমর ইবনে আস (রা) সরদারদের বলে দিলেন, এলাকার কোন লোক যেন গ্রাম থেকে বের না হয়। বিলবীসের পথে কাউকে দেখলেই তাকে তীরের নিশানা বানানো হবে। আর তারা যেন লোকদেরকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, জনগণ যেন এখন নিজেদেরকে মুসলমানদের নিরাপত্তাধীন মনে করে। তাদের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর হেফাজতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে। সেনাবাহিনীর কেউ কারো ঘরে প্রবেশ করবে না।

আমর ইবনে আস (রা) মাজদালের কাছেই সাময়িক তাঁবু ফেললেন। মাজদাল থেকে বহুদূরে 'কানতারা' নামে একটি শহর আছে। সেখানে গুপ্তচররা গিয়ে জানতে পারে, শহরে কিছু রোমী ফৌজ আছে। সংখ্যা মুসলিম ফৌজের প্রায় সমান। সেখান থেকে এক গুপ্তচর এসে রক্ষবুহ্যের সালারকে তা জানালো। রক্ষবুহ্যের সালার সিপাহসালারকে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে, তিনি সেই শহর বা বসতিকে ঘেরাও করতে যাচ্ছেন। আমর ইবনে আস (রা) এ সংবাদ পেয়ে মধ্য ভাগের এক ব্যটিলিয়নকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

কানতারা শহর কেল্লাবেষ্টিত শহর ছিলো না। রোমী ফৌজ শহরের বাইরে এসে হামলা করলো। মুজাহিদরা হামলা রুখে পাল্টা হামলা যখন চালালো রোমীদের তখন ত্রাহি

ত্রাহি দশা। কিছু তো সেখানেই মারা পড়লো আর বাকিরা বসতির ভেতর গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। মুজাহিদরা সবগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করে খতম করে দিলো।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) কোচ করা অব্যহত রাখলেন। তিনি তার সালারদের মনে করিয়ে দিলেন,

'সামনের চেয়ে তোমাদের দৃষ্টি যেন পেছন দিকে আরো অধিক তীক্ষ্ম থাকে। রোমীয়রা এতো নির্বোধ নয় যে, শহরে শহরে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। পেছন থেকে ওরা নিশ্চিত হামলা চালাবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বিলবীসের রোমী ফৌজ ফারমার মতো আমাদের সঙ্গে লড়বে না। বিলবীস আমাদের মৃত্যুফাঁদে পণিত হতে পারে।'

সেদিন সন্ধ্যাতেই আমর ইবনে আস (রা) বিলবীস উপকণ্ঠে পৌছে গেলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। পরে তিনি যখন শহরের আশে পাশে অবরোধকারীদের অবস্থান পরিদর্শন করছিলেন তখন প্রত্যেক সালার, কর্মকর্তা ও কমাণ্ডারকে বলছিলেন, 'এটা ভুলে যেয়োনা, এখন তোমাদের লড়াই রোমের অনেক বড় চতুর ও দূরদর্শী এবং ভয়ংকর জেনারেল আতরাবুনের সঙ্গে।

✪ ✪ ✪

আমর ইবনে আস (রা) গুপ্তচর মাধ্যমে জানতে পারেন, আতরাবুন বিলবীস কেল্লায় নেই। বিলবীসে দু' জন জেনারেল রয়েছেন। এর মধ্যে একজন নওশীর বাবা। যিনি ফারমার জেনারেল ছিলেন। ফারমা থেকে পালিয়ে এসেছেন।

আতরাবুন তখন মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিসের সঙ্গে অন্য কোথাও ছিলেন। বিলবীস অবরোধের সংবাদ যখন তারা পেলেন তখন উভয়ে চমকে উঠলেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তারা মুসলমানদের ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে বিনাশ করার পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলেন।

আসলে এ ছিলো এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, মুসলমানরা এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে এত দ্রুত বিলবীস শহরে পৌছে গেছে।

'আমরা এখনো প্রস্তুত নই' মুকাওকিস বললেন, 'আমাদের আরো সময় অর্জনের জন্য কোন চাল চালতে হবে। আর মুসলমানদেরকে বিলবীসের বাইরেই আটকে রাখতে হবে।'

'আমরা সম্পূর্ণ তৈরী'। আতরাবুন কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এখন আর আমরা এ ঝুঁকি নিতে পারবো না যে, মুসলমানরা বিলবীসও দখল করে নিবে। আমি আর ওদেরকে অধিক সুযোগ দেয়ার পক্ষে নই'।

'আরীশ ও ফারমার পর যেকোন মূল্যে আমি বিলবীস হাতছাড়া করতে রাজি নই। মুকাওকিস বললেন, 'কিন্তু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে তোমাকে এই ফলাফলেই পৌছতে হবে। আমাদেরকে কিছু সময় অর্জন করতে হবে।'

দু'জনের কথায় তাদের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কেউ কারো মতে একমত হতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু মুকাওকিস যেহেতু মিসরের শাসনকর্তা তাই তার কথাই মানতে হলো। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, পাদ্রীদের এক প্রতিনিধি দল মুসলিম সিপাহসালারের কাছে যাবে। তারা তাকে অনুরোধ করবে, মুসলমানরা যেন মিসর ছেড়ে চলে যায় এবং এজন্য যেমন শর্ত ইচ্ছা তারা আরোপ করতে পারে।

জেনারেল আতরাবুন বললেন, 'মুসলমানরা যদি এই শর্তারোপ করে যে, মিসরের যে ক'টা শহর জয় করেছে তাতে মুসলমানদের শাসন চলবে, এর বিনিময়ে তারা আর সামনে অগ্রসর হবে না। তাহলে কি আমরা মেনে নিবো? মুসলমানরা এ শর্তারোপও করতে পারে যে, বিলবীস তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে বিনা রক্তপাতে।'

'আমি ওদেরকে মিসরের এক খন্ড জমিও দেবো না।' মুকাওকিস বললেন, 'ওদেরকে আমি একটা জালে জড়াতে চাই। পাদ্রীদেরকে আগে ওদের কাছে পাঠাতে দাও। তুমি ফৌজ তৈরী করো। আত্‌রাবুন! ঐ কিবতী ঈসায়ীদের কথা ভুলে যেয়ো না। আমি ওদের আসকাফ বিনিইয়ামীনকেও আমাদের জালে ফাসাতে আরো জাল বিস্তার করছি।'

মুকাওকিসের ঐতিহাসিক একটা তাৎপর্য আছে। ইসলামের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ইসলামের প্রচারকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিসের উদ্দেশ্যে ও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠি বহন করেন হযরত হাতিব (রা)। মুকাওকিস সে চিঠির জবাব আশাতীতভাবে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রেরণ করেন।

মুকাওকিস রাসূলুল্লাহ সাল্লামকে উপহারস্বরূপ দু'জন যুবতী বাদীও উপঢৌকন দেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হারত মারিয়া কিবতী। পরবর্তীতে যিনি তাঁর (স) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো বলতেন, কিবতীদের সঙ্গে আমাদের সব সময় সদাচারণা করা উচিত। কারণ, তাদের সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

✪ ✪ ✪
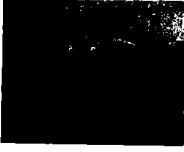
অবরোধের সপ্তম কি অষ্টম দিনে সিপাহ্‌লাসার আমর (রা) কে সংবাদ দেয়া হলো, মিসর থেকে পাদ্রীদের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাতে এসেছে। তখনই তিনি তাদেরকে তার তাঁবুতে নিয়ে আসতে বললেন এবং আন্তরিকভাবে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানালেন। মানবজাতির শান্তি, নিরাপত্তা, সম্প্রীতি আর ভালোবাসা নিয়ে প্রাদ্রীরা আলাপ আলোচনা করলেন।

আমর ইবনে আস (রা) অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে তাদের কথা শুনলেন এবং বললেন ইসলামও মানবতার সর্বোচ্চ শিক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের আগমনের উদ্দেশ্য যেন বলে ফেলেন। পাদ্রীর মুকাওকিসের প্রস্তাব শোনালেন। অর্থাৎ মুসলমানরা যেন এখান থেকে চলে যায় এবং তাদের কোন শর্ত থাকলে তা আরোপ করতে পারে।

'আমার ব্যক্তিগত কোন শর্ত নেই'। আমর ইবনে আস (রা) বললেন, 'আমাদের ধর্ম যা বলবে আমরা শুধু তাই মেনে থাকি। তাই আমি সে শর্তই বলবো, যা ইসলাম বলেছে ----- ইসলামের নীতি হলো, আমি আপনাদেরকে ও আপনাদের শাসক বর্গকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য- ভেদাভেদ থাকবে না। ইসলাম মানুষের মধ্যে সমতা-সম্প্রীতি রক্ষার হুকুম দিয়েছে। ইসলামে কোন বাদশাহ্‌ নেই। আর জনগণকে প্রজা বলা যাবে না। আপনাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা জিযিয়া– কর উসুল করবো। তবে মুসলমানদের সঙ্গে যেমন তাদের সঙ্গেও তেমনি সদ্ব্যবহার করা হবে। অমুসলিমদেরও জান মাল ইজ্জত আবরুর হেফাজতের দায়িত্ব আমাদের থাকবে। তাদের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সব ধরনের অধিকার আমরা সুনিশ্চিত করবো।'

বলাবাহুল্য, আমর ইবনে আস (রা) নিশ্চিতভাবেই জানতেন, এসব শর্ত পাদ্রী তো দূরের কথা খ্রিস্টান ধর্মের সাধারণ লোকেরাও মানবে না। তাই তিনি একটু কৌতুক করে পাদ্রীদেরকে বললেন, মিসরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। তাই আবরদের হক রয়েছে মিসরের ওপর।

পাদ্রীরা বুঝে গেলো সিপাহ্‌সালার কোন দিকে ইংগিত করছেন। সেটা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) মিসর দিয়ে পথ অতিক্রমের সময় মিসরের তদানিন্তন বাদশাহ্‌ তাকে

একটি ষোড়ষী কন্যা উপহার দেন। তিনি ছিলেন হযরত হাজেরা (আ)। যার ঔরষে পৃথিবীতে আগমন হযরত ইসমাঈল (আ)। আর তারই বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে আগমন করেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাকেও মিসর রাজ্যের পক্ষ থেকে দু'জন ষোড়ষী মেয়েকে উপঢৌকন দেয়া হয়।

'আত্মীয়তার এই অমূল্য বন্ধন আমরাও ভুলতে পারবো না। প্রতিধিনি দলের বয়োজেষ্ঠ পাদ্রী স্মিত হাস্যে বললেন, 'কিন্তু এ ধরনের বন্ধনকে কোন নবীই আবার জীবন্ত করতে পারবে না।'

'আমরা কি আসলে পরস্পরের সময় নষ্ট করছি না?' আমর (রা) বললেন, 'আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা কোন শর্তেই মিসর ত্যাগ করবো না। মুসলমানরা ফিরে যাওয়ার জন্য আসেনি। এক পয়গাম নিয়ে এসেছে। তা গ্রহণ করে নিলে তো ভালো, না হয় এর ফয়সালা হবে জিহাদের ময়দানে।'

আমর ইবনে আস (রা) অতিরিক্ত আর কোন আলোচনা শুনতে অস্বীকার করে দিলেন। মুকাওকিস পাদ্রীদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যে করেই হোক মুসলমানদের থেকে কিছু সময় নিতে হবে। যাতে এসময় ফৌজ প্রস্তুত করে মুসলমানদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নেয়া যায়।

'আমাদেরকে কিছু সময় দিন' প্রতিনিধি দলের প্রধান বললেন, 'আমি মিসর রাজের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জবাব দিতে আসবো।'

'এটাও তাহলে মনে রাখবেন, আমাকে ধোকা দিতে পারবেন না।' আমর (রা) বললেন, 'আমাকে ধোকা দিতে পারনবে না। আমি শুধু তিন দিনের সময় দিচ্ছি। ইসলামের শর্ত অনুযায়ী আমি জবাব না পেলে সেই রক্তপাতই ঘটবে যা বন্ধ করার দাবী আপনারা তুলেছেন।'

কিন্তু পাদ্রীরা আরো অধিক সময়ের আবেদন জানালেন। আমার ইবনে আস (রা) তিন দিনের স্থলে পাঁচ দিন সময় দিলেন। পাদ্রীরা আবার ফিরে আসার ওয়াদা করে চলে গেলো।

মুকাওকিস পাঁচ দিনের কথা শুনে বেশ হতাশ হলেন। কারণ, তিনি আরো অধিক সময় পাবেন বলে আশা করছিলেন।

'আমার জন্য পাঁচ দিনই অনেক'। আত্‌রাবুন বড় জোশেলা কণ্ঠে বললেন, 'আমি এই পাঁচ দিনেই উপযুক্ত ফৌজ তৈরী করে নিবো এবং মুসলমানদের ওপর হামলা করবো। আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, মুসলমানদেরকে খতম করেই তবে আমি ক্ষান্ত হবো।'

মুকাওকিসের কাছে বিলবীসে অবরুদ্ধ লোকদের সম্পর্কে সংবাদ পৌছলো যে, কেল্লার ভেতরের লোকেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধির দাবী উঠিয়েছে।

অরীশ ও ফারমা থেকে পালিয়ে আসা লোকেরাই মূলতঃ মুসলমানদের ব্যপারে আতংক ছড়িয়েছে। বিলবীসের লোকদের তারা বলতো, তাদের ফৌজকে যেন লড়াই থেকে বিরত রাখা হয়। কারণ, লড়তে গেলে নিশ্চিত কতগুলো প্রাণ মারা পড়বে। তারপরও তারা লড়তে চাইলে শহরবাসী যেন তাদের সঙ্গ না দেয়। সে অবস্থায় মুসলমানরা শহর নিয়ে নিলে শহরবাসীর কোন ভয় নেই। মুসলমানরা তখন তাদের আবরু ইজ্জতের হেফাজতকারী বনে যাবে। কিন্তু শহরবাসী যদি তাদের ফৌজদের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে মুসলমানদের আচরণ হবে অতি ভয়ংকর।

মুকাওকিস দু' জন পাদ্রীকে বিলবীসে পাঠিয়ে দিলেন। তারা শহরবাসীকে ভিন্ন কৌশলে অভয় দিবে। তাদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলবে। পাদ্রী দু'জন সিপাহসালার আমর (রা) এর কাছে দিয়ে শহরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। আমর ইবনে আস (রা) ভেতরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, তারা লোকদেরকে বলবে, ইসলাম গ্রহণ করলেই তারা সব রকম শংকা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং তাদের ফৌজও নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে।

আমর (রা) তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। দুই পাদ্রীর জন্য শহরের একটি দরজার সামান্য খোলা হলো। দুজনে দরজার ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

পাদ্রীরা ভেবেছিলো, তারা লোকদের সংকল্পবদ্ধ করে তুলতে পারলে তারা ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহর রক্ষার জন্য লড়াই করবে।

শহরবাসীকে এক জায়গায় একত্রিত করে যখন তারা কথা বলতে শুরু করলো, তখন লোকজন চিৎকার চেচামেচি শুরু করলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেন লড়াই না করা হয়। কয়েকটি এমন আওয়াজ উঠলো, যার মধ্যে রোমী ফৌজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রুপ ছিলো।

তারা বলছিলো, রোমী ফৌজের এখন আর আছেইটা বা কী। যারা পুরো শামই মুসলমানদের দিয়ে এসেছে। আর এখন মিসরের দুটি শহর ও তাদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে।

পাদ্রীরা ফিরে গিয়ে মুকাওকিস ও আতরাবুনকে জানালো, বিলবীস শহরের লোকদের বিদ্রোহী মনোভাবের কথা। আতরাবুন তা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, তিনি কখনো নিজেদের ফৌজকে নিজেদের লোকদের হাতে অপদস্থ হওয়াকে মেনে নিবেন না।

মুকাওকিস আতরাবুনকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন, মুসলমানদের ফিরে যাওয়ার কোন না কোন পথ নিশ্চয় বের হয়ে আসবে। আতরাবুন কোন উত্তর না দিয়া সেখান থেকে চলে গেলেন।

আতরাবুন গোপনে গোপনে বার হাজার সৈন্য প্রস্তুত করলেন এবং মুকাওকিসের হুকুম ছাড়াই একদিন বিলবীসের দিকে কোচ করলেন। মুকাওকিস ঘটনা জানার পরও আতরাবুনকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলেন না। বিলবীস সেখান থেকে খুব দূরে ছিলো না।

✪ ✪ ✪

এক ভোরের কথা। ফজরের আযান হয়ে গিয়েছে। মুজাহিদরা জামাআত নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সময় হাজারো ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনির ঝড়ো শব্দ ভেসে এলো। এছিলো আতরাবুনের বার হাজার ঘোড়সওয়ার ফৌজ। যারা মুজাহিদদের পেছনে থেকে হামলার জন্য এসেছে।

আতরাবুন জানতেন এ সময় মুসলমানরা নামাযরত থাকে বা নামাজের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। তাই মুসলমানরা হামলা রোখার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। আর যে সময় তারা প্রস্তুতি নিবে ততক্ষণে নিজেদের রক্তে হাবুডুবু খেতে থাকবে। আতরাবুন চমৎকার এবং মোক্ষম এক সময় বেছে নিয়েছেন।

আতরাবুন শ্রেষ্ঠ চালটাই দিলেন। কিন্তু তার জানা ছিলো না, সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) তার সালার ও ফৌজি কমান্ডারদের পূর্বেই বলে রেখেছিলেন; যেকোন দিক থেকে তাদের ওপর হামলা হতে পারে। তাই সর্বাবস্থায় যেন তারা প্রস্তুত থাকে। আতরাবুন তো জানতেন না, মুজাহিদদেরকে বিশেষ করে এ হুকুম দেয়া হয়েছে, নামাযের সময় তলোয়ার, বর্শা, তীর ধনুক প্রস্তুত অবস্থায় নিজেদের কাছে যেন রাখে। ঘোড়াও সব সময় প্রস্তুত রাখে।

আমর ইবনে আস (রা) সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভাষ্য হলো, তিনি বাতাসের গন্ধ শুঁকে শত্রুর দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পারতেন।

মুজাহিদদের সৈন্য সংখ্যা হাজার পাঁচেক। সংখ্যা স্বল্পতার দিকে আমর (রা) ভ্রুক্ষেপও করলেন না। এমনকি শত্রু সেনা সংখ্যায় কত তাও জানার প্রয়াজনীয়তা অনুভব করলেন না। তার এখন ভাবনার বিষয় ছিলো, রোমীয় ফৌজের পুরোভাগই ঘোড় সওয়ার।

এ ধরনের আচমকা হামলার মুহূর্তে সেনা বিন্যাস কেমন হবে, কোন ব্যাটালিয়ন আক্রমণ ভাগে থাকবে এবং কোন ব্যাটালিয়ন রক্ষিত থাকবে ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্বেই চূড়ান্ত করে রাখেন।

এখন সেই আচমকা হামলাই এসেছে। কিন্তু মুজাহিদদের জন্য তা অপ্রত্যাশিত ছিলো না। প্রত্যেকে চোখের পলকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেলো। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো এবং যথারীতি নির্দেশিত বিন্যাসে হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আমর ইবনে আস (রা) এ সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেছিলেন যে, পেছন থেকে শত্রুর হামলা হলে শহরের ভেতরের ফৌজও বাইরে এসে যেতে পারে। তখন মুজাহিদরা রোমীদের দু' দিকের ফৌজের বেষ্টনীতে পড়ে যাবে। যা থেকে বের হওয়া তাদের পক্ষে অতি দুষ্কার হয়ে পড়বে। তাই তিনি রক্ষিত বাহিনীকে এ নির্দেশ দিয়ে রাখেন যে, যদি অবস্থা সেদিকে মোড় নেয় তাহলে স্পেশাল ব্যাটালিয়নের অর্ধেক ফৌজ শহরের ভেতর চলে যাবে।

মুজাহিদদের কিছু অংশও যদি শহরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় তাহলে শহরে চরম আতংক ছড়িয়ে পড়বে। যার প্রভাব পড়বে রোমী ফৌজের ওপর। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা তখন লড়াইয়ের অযোগ্য হয়ে যাবে।

আতরাবুনের বার হাজার ফৌজ যখন মুজাহিদদের ওপর হামলের পড়লো তখনো ভোরেও প্রচ্ছন্ন অন্ধকার রয়ে গেছে। তাই তারা দেখতে পেলো, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদ ডান দিকে ও বাম দিকে বের হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে লড়াই বেঁধে গেলো এবং যুদ্ধ প্রচন্ডরূপ ধারণ করলো।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো, দ্বিগুণের চেয়ে অধিক সৈন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে মুজাহিদদেরকে খড়কুটার মধ্যে কেটে টুকরো টুকরো করে দিবে। কিন্তু আতরাবুনের ঘোড় সওয়ারের ডান ও বাম বুহ্যের ওপর এক যোগে হামলা শুরু হলো। এতে রোমীয়দের হামলার প্রচণ্ডতা ক্রমেই মিইয়ে এলো।

সংখ্যার বিচারে মুজাহিদদের পরাজয় তো সময়ের ব্যপার ছিলো মাত্র। কিন্তু মুজাহিদদের মধ্যে যে জজবা-জোশের আকাশসম উচ্চতা ছিলো তার ছিটেফোটাও রোমীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো না। মুজাহিদরা জানতো, তাদের সংখ্যার স্বল্পতা জজবা ও কঠিন মনোবল এবং ঈমানের প্রদীপ্ত শক্তি দিয়ে পূরণ করতে হবে।

আমর ইবনে আস (রা) ও তার সালররা পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন এবং দৃঢ়পদ হয়ে গেলেন। ক্ষণে ক্ষণে মুজাহিদদের ধ্বনিত শ্লোগান এতই জোশ ও আবেগ দীপ্ত হয়ে উঠছিলো যে, রোমী সওয়ারদের মনোবলে চিড় ধরতে লাগলো। দিনের অর্ধেক অতিক্রম হওয়ার আগেই রোমীরা পিছু হটতে শুরু করলো।

আমর (রা) তৎক্ষণাৎ সালারদেরকে পয়গাম পাঠিয়ে দিলেন, পিছু হটতে থাকা রোমীদের পিছু ধাওয়া করার দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আতরাবুনের ফৌজ অসংখ্যা লাশ ও যখমীদের ফেলে রেখে পিছু হটে গেলো।

✪ ✪ ✪
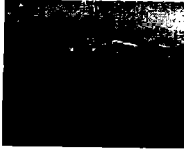
অবশিষ্ট দিন শহীদদের লাশ ও যখমী উদ্ধারে কেটে গেলো। আমর ইবনে আস (রা) গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন, আতরাবুনের ফৌজি শিবির কোথায় স্থাপন করা হয়েছে এটা জানার জন্য।

সন্ধার পর গোয়েন্দারা জানালো, মাইল তিনেক দূরে আতরাবুন শিবির স্থাপন করেছেন। আমর ইবনে আস (রা) নৈশ হামলার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ জনের একটি গেরিলা দল প্রস্তুত করলেন।

মাঝরাত। সারা দিনের লড়াইয়ের ক্লান্তি নিয়ে রোমীয়রা তাদের তাঁবুতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ করেই তাদের ওপর আগুন বর্ষিত হতে লাগলো। নৈশ হামলাকারী মুজাহিদরা ছুটন্ত ঘোড়া থেকে রোমীয়দের তাঁবুর উপর জলন্ত মশাল ছুড়ে মারতে লাগলো। রোমীয়রা তাদের ঘোড়াকে শুকনো ঘাস খাওয়াতো। এক জানাবায মুজাহিদ ঘাসের বিশাল স্তুপের উপর একটি মশাল ছুড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধাউ ধাউ করে আশেপাশে ছড়াতে শুরু করলো।

ঘাসের স্তুপের পাশে বেঁধে রাখা ঘোড়ার পাল কেয়ামতের বিভীষিকা নামিয়ে দিলো এবং বাধন ছিড়ে পালাতে লাগলো ঘোড়াগুলো। জ্বলছিলো তো কয়েকটি তাঁবু মাত্র। কিন্তু পুরো সৈন্যদলে মৃত্যুর আতংক ছড়িয়ে পড়লো। তারপর শুরু হয়ে গেলো নৈশ হামলাকারীদের তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা সরাসরি আক্রমন।

গেরিলা মুজাহিদরা ছুটন্ত ঘোড়া থেকেই দু' তিন জন করে রোমীয়কে নিকেষ করে করে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যেতে লাগলো। এভাবে রোমীয়দের অপূরণীয় ক্ষতি করে গেরিলা বাহিনী ফিরে এলো।

পর দিন আর আতরাবুন হামলার সাহস করলেন না। কারণ, রাতের গেরিলা হামলায় রোমীয়দের যতটা প্রাণ নাশ ঘটেছে এর চেয়ে বেশি রোমীয়দের মধ্যে মুসলমানদের ভীতি বদ্ধমূল হয়ে গেলো। যে কারণে আতরাবুন সে দিনের হামলা স্থগিত রাখলেন।

অবরোধ অব্যহত রাখলেন আমর ইবনে আস (রা)। আজও তিনি আশা করছিলেন শহরের দরজা খুলে ভিতরের রোমীয় ফৌজ হামলা করে বসবে। কিন্তু এমন কিছুই

ঘটলো না। তবে তিনিও শহরের উপর হামলার কোন পদক্ষেপ নিলেন না। কারণ, মুসলমানদের সঙ্গে এখন সরাসরি লড়াই চলছে আতরাবুনের। শহরের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করা নিষ্প্রয়োজন।

আতরাবুনের ফৌজি ক্যাম্পে নৈশ হামলা প্রতি রাতেই চলতে থাকলো। রোমীদের সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের এসব গেরিলা হামলা রোখা যাচ্ছিল না। এভাবে রোমীদের যথেষ্ট ক্ষতি হতে থাকলো। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, রোমীয় সওয়ারদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।

মদীনা থেকে সেনা সাহায্য রওয়ানা হয়ে গেলেও বিলবীসে লড়াই পর্যন্ত তাদের পৌছা অসম্ভব ব্যপার। মদীনা থেকে পৌছতে মাস খানেক সময়ও লাগতে পারতো। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা) এরই প্রতীক্ষায় লড়াই অব্যহত রাখেন। কারণ, এই দীর্ঘ লড়াইয়ে শহীদ ও বন্দীদের সংখ্যা যেমন বাড়ছিলো মুজাহিদদের সংখ্যাও তেমনি কমছিলো অতি দ্রুত। উপরন্ত মুজাহিদদের সেনা সাহায্য যত দূর সীমানায় ছিলো রোমীয়দের সেনা সাহায্য ছিলো ততই হাতের নাগালে।

অবশেষে আতরাবুন চূড়ান্ত হামলা করলেন একদিন। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা) লক্ষ্য করলেন, এ হামলায় সেই তীব্রতা নেই যেমন ছিলো প্রথম দিনের হামলায়।

গেরিলা হামলাকারী দলের চার জানবায আতরাবুনের ঝান্ডা দেখে ফেলে। আতরাবুন তখন তার ঘোড়সওয়ার মুহাফিজ দ্বারা পরিবেষ্টিত। চার জানাবায শপথ করে, তারা আজ যে করেই হোক আতরাবুনকে খতম করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার ঝাণ্ডাটি যে করেই হোক মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে।

চার জানবায লড়তে লড়তে আতরাবুনের মুহাফিজ বাহিনীর পরিবেষ্টন পর্যন্ত পৌছলো এবং মুহাফিজদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। জানাবাজি রেখে লড়তে লড়তে তিন জানবায শহীদ হয়ে গেলো। চতুর্থজন যখমী হয়েও আতরাবুন পর্যন্ত পৌছে গেলো এবং এক আঘাতেই আতরাবুনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ঘোড়া থেকে গড়িয়েদ পড়লো এবং শহীদ হয়ে গেলো।

ও দিকে বিলবীস শহরের দু' তিনটি দরজা খুলে গেছে। এই সুযোগে ভেতরের ফৌজ বাইরে আসতে লাগলো। এর সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে আতরাবুনের ফৌজে একটি আওয়াজ উচ্চকিত হলো - 'আতরাবুন মারা গেছে... আতরাবুনের ঝান্ডা পড়ে গেছে'।

রোমী ফৌজ সম্ভবত এ আওয়াজের অপেক্ষাতেই ছিলো। আতরাবুনের নিহত হওয়ার সংবাদ তাদের পা টলিয়ে দিলো চরমভাবে। তারা পিছু হটতে শুরু করলো। ওদিকে আতরাবুনের নিহত হওয়ার সংবাদ বিলবীসের বাইরে আসা ফৌজের কানেও গেলো।

স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়লো। আর মুজাহিদদের মনোবল এতই ঈমানদীপ্ত হয়ে উঠলো যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ছে। তাদের একেক জনের হাতে চার পাঁচজন করে রোমী নিহত হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত হতে লাগলো তাকবীর ধ্বনি ও বিজয়ের শ্লোগান।

আমর ইবনে আস (রা) তার রক্ষিত বাহিনীকে পূর্বেই হুকুম দিয়ে রেখে ছিলেন, শহরের দরজা খুলতেই এ বাহিনী দরজার উপর টুটে পড়বে। তারা তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করলো এবং মুজাহিদদের উল্লোযোগ্য একটি অংশ লড়তে লড়তে শহরে ঢুকে পড়লো।

রোমী সওয়ারদের এরপর পালানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। বিলবীসের ফৌজ এ অবস্থা দেখে শহরের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়ার বদলে চরমভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়লো এবং আতরাবুনের ফৌজের পেছনে পেছনে পালাতে শুরু করলো।

আমর ইবনে আস (রা) এর পুরো মুজাহিদ দল শহরের প্রবেশ করলো এবং শহরের ভেতর তিন হাজার অক্ষত রোমী অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলো।

মুজাহিদরা শহরবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়লো। শহরবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের ব্যপারে যে ভীতি ছিলো অতি তাড়াতাড়ি দূর করে দিলো।

✪ ✪ ✪

মুসলমানদের বিলবীস বিজয়ের খবর এত দ্রুত হেরাকলের কাছে পৌছা সম্ভবপর ছিলো না। কারণ, হেরাকল তখন হাজারো মাইল দূরে বানতিয়ায় ছিলেন। কিছু দিন আগে তার কাছে ফারমা বিজয়ের খবর পৌছেছে মাত্র। এ খবর শুনে তিনি উত্তপ্ত আগুনের মতো ক্রোধে ফেটে পড়েন। উত্তেজক ভাষায় মুকাওকিস ও আতরাবুনের নামে পয়গাম প্রেরণ করেন। পয়গামটি ছিলো এ রকম,

'যদি তোমরা ফয়সালা করে থাকো যে, মুলমানদেরকে মিসর দিয়ে দেবে তাহলে দিয়ে দাও। নিজেদের ফৌজকে ধ্বংস করছো তোমরা। তোমরা পরাজয় মেনে নিয়েছো। তাই এই বৃথা রক্তপাত বন্ধ করো। তোমরা হয়তো জানো তোমাদের ওখানে আমার গুপ্তচররা রয়েছে যারা আমাকেও খানকার সবকিছুর সংবাদ জানিয়ে যাচ্ছে...

তোমরা এটা ভেবে বসে আছো যে, মুসলমানরা আরো এগিয়ে আসুক তখন তোমরা তাদেরকে কোনঠাসা করে খতম করে দিবে। অথচ মুসলমানরা কেল্লার পর কেল্লা জয়

করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তারপর ওরা মিসরের বেদুইনদের নিজেদের দলে ভেড়াতেও সক্ষম হয়েছে। এটা তোমাদের অযোগ্যতা। তোমাদের অপরিনামদর্শিতা...

'তোমাদের সঙ্গে আছে আতরাবুন ও থিয়োডরের মতো পৃথিবী বিখ্যাত জেনারেল। সাহস ও মনোবল হারানো তোমাদের পক্ষে শোভনীয় নয়। কিন্তু তোমাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে বিরোধ। আতরাবুন চায় লড়াই চালিয়ে যেতে। আর তুমি মুকাওকিস চাও মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি সমঝোতা করে চলতে'...

'কীরাসের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি তাকে 'আসকাফে আজম' বানিয়ে ছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে সে আমাকে ধোকা দিচ্ছে। আমি চাই তুমি তোমার মনোবল ও চিন্তা ভাবনা বদলে ফেলো। তোমার পক্ষ থেকে যদি আমি এব্যপারে নিশ্চিন্ত না হতে পারি তাহলে আমি মিসর এসে যাবো। তখন আর তোমাকে তোমার সাফাই গাওয়ার সুযোগ দিব না। আতরাবুনের পথে কোন বাধা দাঁড় করিয়ো না। তাকে তার মতো করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে দাও। এখন থেকে আমি ভালো কোন খবরের প্রতীক্ষায় থাকবো।

✪ ✪ ✪
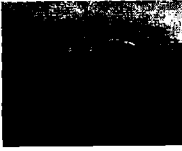
হেরাকলের এ পয়গাম তখনই মুকাওকিসের কাছে পৌছলো যখন তার সামনে পড়া ছিলো আতরাবুনের লাশ। কিছুক্ষণ আগে মাত্র এ লাশ এখানে পৌছেছে। মুকাওকিস তখন ছিলেন বিলবীসের পরের কেল্লা ব্যবিলনে। কেল্লাটি যেমন বিশাল তেমনি অজেয় এবং শক্তিশালী।

রোমী সেনাদলের মধ্যে একটা প্রচলিত প্রথা ছিলো। তা হলো, যুদ্ধের ময়দানে কোন জেনারেলের লাশ পড়ে থাকলে পুরো সালতানাতের জন্য অপমানজনক মনে করা হয়। মুকাওকিসও তার পরাজিত সৈনিকদেরকে এ হুকুম দেন নি, আতরাবুনের লাশ উঠিয়ে নিয়ে আসো। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে যারা ছুটে পালাচ্ছিলো তারা আবার কখন তাদের নিহত জেনারেলের লাশ উঠিয়ে নিয়ে আসবে? তাহলে আতরাবুনের এই লাশ মুকাওকিসের কাছে কি করে এলো? সন্দেহ নেই এ হলো মুসলমানদের মহানুভবতার পরম নিদর্শন।

রোমীয়রা ময়দান ছেড়ে পালানোর পর মুসলিম শিবিরের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা শহীদ ও যখমীদের লাশ উদ্ধারে পুরো ময়দানে যা ছড়িয়ে পড়ে। এ কাজে মুজাহিদদের স্ত্রীরাই

সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এবারও তারা নেকাবে আবৃত হয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে রয়েছে শারীনাও।

শারীনা শহীদ ও যখমী মুজাহিদদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। খুঁজতে খুঁজতে এক রোমীর লাশ চেনা চেনা ঠেকলো। তার ইউনিফর্ম দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো, এ নিশ্চয় কোন রোমী জেনারেলের লাশ। তার চেহারা রক্ত ও ধূলি কণায় মাখামাখি হয়ে ছিলো। শারীনা লাশের কাছে গিয়ে তীক্ষ্ম চোখে তাকাতেই চমকে উঠলো। শারীনার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এই রোমীও মারা যেতে পারে। এ ছিলো আতরাবুনের লাশ।

শাহী খান্দানে আতরাবুনের এত গভীর প্রভাব ছিলো যে, তাকে প্রতিটি লোক ঘনিষ্ঠভাবে চিনতো। এমনকি হেরাকলও তাকে সমীহ করতেন প্রকাশ্যে।

আতরাবুনের বিলাসমত্ত ও নারীপ্রিয় স্বভাবের কথাও জানতো সবাই। সুন্দরী মেয়ে মাত্রেই আতরাবুন বেশ দুর্বল ছিলেন। শারীনার মনে আছে, তার মার প্রতিও আতরাবুন বেশ দুর্বলতার মনোভাব দেখাতো। তবে পরোক্ষ কু দৃষ্টি ছিলো শারীনার ওপর। কিন্তু শারীনা তাকে নর্দমার কীটের চেয়ে ঘৃণা করতো।

আজ সেই আতরাবুনের রক্ত কাঁদায় মাখামাখি লাশ পড়ে আছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সালতানাতে রোমের গর্ভের ধন যে জেনারেল, তাকে তার সিপাহীরাই পায়ে পিষে তার লাশ জুতিয়ে ছুটে পালিয়েছে।

শারীনা এদিক ওদিক তাকালো। একটু দূরে দেখতে পেলো ঈনীকে।এক যখমীকে পানি পান করাচ্ছে। শারীনার দিকে ঈনীর চোখ পড়লো তখনই। শারীনা তাকে হাতের ইশারায় ডাকলো। ঈনী দৌড়ে শারীনার কাছে এসে বসলো। সে ঐ মুজাহিদকে চিকিৎসা শিবিরে এখনই নিয়ে যাবে। কারণ, বিলম্ব হলে সে যখমী মুজাহিদকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

শারীনা অদূরে কয়েকজন মুজাহিদকে দেখলো, যখমীদের উদ্ধার কাজে ব্যস্ত। তাদের একজনকে ডেকে ঈনীর যখমী মুজাহিদের দ্বায়িত্ব দিলো। যে তাকে চিকিৎসা শিবিরে নিয়ে যাবে।

ঈনী আতরাবুনের লাশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শারীনা! এ নিশ্চয় বড় এক রোমী জেনারেল। আমি একে দু'বার দেখেছি। দু' বারই এ লোক আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদের বলতে শুনেছি, এটা রোমীদের সবচেয়ে বিখ্যাত জেনারেল। এর নাম আতরাবুন।'

'হ্যাঁ, এ লোকই আতরাবুন' শারীনা বললো, 'আতরাবুনের লাশ মুকাওকিসের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ তার এবং সভাসদদের বলেছে, একে দেখো আর শিক্ষা লাভ করো। মুকাওকিসকে এও বলবে যে, তিনি যেন তার ফৌজি অফিসারদের বলেন, তিনি

আতরাবুনকে বাঁধা দিয়েছিলেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেন তাড়াহুড়া করে লড়তে না যান। কিন্তু আতরাবুন শুনেননি। বিপুল জোশ-জযবা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন বিলবীস। আমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়তে আসবে তাদের পরিনামও হবে এরকমই। মুকাওকিস যেন হেরাকলকেও জানিয়ে দেন যে, মুসলমানরা আতরাবুনের লাশ পাঠিয়েছে কেবল শিক্ষা লাভের জন্য।'

দু'জন উচ্চপদস্থ রোমী বন্দিকে সেখানে হাজির করা হলো।

সেখানে হাদীদও ছিলো। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা) আতরাবুনের লাশের কি ব্যবস্থা করা যায় সে দায়িত্ব দিয়েছেন হাদীদকে। তাই হাদীদ রোমী দুই উচ্চ পদস্থ অফিসারকে আতরাবুনের লাশ হস্তান্তর করে তাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিলো।

✪ ✪ ✪

'এটাও শুনে নাও' হাদীদ এক রোমী অফিসারকে বললো, 'এ কাজের জন্যই শুধু তোমাদেরকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমাদেরকে কয়েদ করে রাখলে গোলাম বানানো হতো এবং জীবনভর চরম কষ্ট শ্রমে কাটাতে হতো। এ লাশ সোজা মুকাওকিসের কাছে নিয়ে যাও এবং আমাদের পয়গাম শব্দে শব্দে তাকে শুনিয়ে দাও, আমরা তোমাদের দু' জনকে ভালো করে চিনে রাখলাম। আমরা যেভাবে এ কেল্লা জয় করেছি সেভাবে ইনশাল্লাহ সামনের কেল্লাগুলোও জয় করবো। যদি জানতে পারি, এ লাশ তোমরা মুকাওকিসের কাছে পৌছাওনি এবং আমাদের পয়গামও দাওনি, তাহলে তোমাদেরকে ধরে এনে এমন মৃত্যুর ব্যবস্থা করবো যে, যে দেখবে সেই কেঁপে উঠবে।'

'এটা আপনারা সম্ভবত বুঝতে পারছেন না, আমাদের প্রতি আপনারা কত বড় অনুগ্রহ করছেন' উচ্চ পদস্থ রোমী অফিসার বললেন। একে তো আমারদেরকে বিনা রক্তপণে মুক্তি দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত ঃ এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, আমাদেরকে অনেক বড় মর্যাদাও দান করছেন আপনারা। আমরা এক জেনারেলের লাশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা আপনাদের পয়গাম হুবহু মুকাওকিসের কাছে পৌছে দিবো। আর এই লাশ তার সামনে রেখে তার প্রশংশাও অর্জন করবো। এমনকি তিনি কোন এনামও আমাদেরকে দিতে পারেন।'

দুই রোমীকে আতরাবুনের লাশসহ তিন মুজাহিদকে বিদায় করে দিলো হাদীদ। তারপর নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শারীনা ও ঈনীও যখমী মুজাহিদদের উদ্ধার কাজে চলে গেলো।

শারীনা ও ঈনী মিলে একজন যখমী মুজাহিদকে উঠাচ্ছিলো। যখমী মুজাহিদও উঠলো। শারীনা ও ঈনী দু' জন ধরে তাকে ধীর পদে নিয়ে যেতে লাগলো। অল্প পথ গিয়েই যখমী মুজাহিদ তাদেরকে বাঁধা দিয়ে বললো, সে নিজেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে যেতে পারবে। শারীনা লক্ষ্য করলো, যখমী ভালো করে পাও ফেলতে পারছে না। শারীনরা তাকে বললো, নিজের প্রতি তার এ রকম জোরজবস্তি করা ঠিক হবে না। শারীনা ও ঈনী দুজন তাকে আবার সাহায্যার্থে ধরতে গেলো। যখমী মুজাহিদ দু' জনের কাছ থেকে পৃথক হয়ে মুচকি হেসে বললো,

'না আমার বোনরা। আমাকে পর নির্ভলশীলতার প্রতি অভ্যস্ত করে তোলো না, আমরা যদি পর নির্ভরশীল হয়ে চলা ফেরা করতে শুরু করি তাহলে মিসর কে জয় করবে? তোমরা যাও। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা যখমীদের উদ্ধার করো। আল্লাহ্ তায়ালাই আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবেন।'

যখমী মুজাহিদ চলে গেলো। শারীনা ও ঈনী অন্য যখমীদের খুঁজতে এগিয়ে গেলো। চার দিকে আহতদের আর্তস্বর। রোমী ঘোড়া ও যখমী সওয়ারদের পলায়ণরত ছুটন্ত ক্ষুর ধ্বনি এবং রণাঙ্গনের রক্তাক্ত পরিবেশ শারীনাকে যেন কোন ঘোরের মধ্যে নিয়ে গেলো।

ঈনী তার ঘোর ভাঙ্গালো। ঈনী তার হাত ধরে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগলো,

দেখো শারীনা! ঐ যে একটি মেয়ে! আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানকার মেয়েরা সবাই বোরকা পরা থাকলেও চোখের দিক থেকে মুখের এটুকু অংশ খোলা রয়েছে যে, সবাই তাকে চিনতে পারে। অথচ ঐ মেয়েটির শুধু দুই চোখ ছাড়া আর কিছুই খোলা নয়। কেমন সন্দেহজনক।

শারীনা তাকালো সেদিকে। হ্যাঁ, আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত। শুধু চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে। তীর্যকভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন রহস্যময় হাবভাব। যুদ্ধের ময়দানে তো এমন অপরিচিতা কোন মেয়ের থাকার কথা নয়! কে এই মেয়েটি?

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের
ঐতিহাসিক উপন্যাস...

শেষ আঘাত-২

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন অনূদিত

সালারের নির্দেশে মুসলিম সেনারা গহীন জঙ্গলে হানা দিলো এবং সত্যি সত্যিই তারা ধরে আনলো এক প্রেতাত্মাকে। অপরূপ এক সুন্দরীর প্রেতাত্মা এটা। এটা কি করে সম্ভব? অশরীরী প্রেতাত্মা ধরলো কি করে সশরীরের সাধারণ মানুষ? তারপর সেই প্রেতাত্মার কি হলো ?

কুসংস্কারে বিশ্বাসী খ্রিষ্টান পাদ্রীরা রোজিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক করলো নীলনদে বলিদানের জন্য। পরীর মতো এমন রূপসী একটি মেয়ের জীবন সলিল সমাধির মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে ? পাদ্রীদের হাতে এভাবে বলির পাঠা হওয়া থেকে ওকে কি বাঁচানোর মতো কেউ নেই ?

অবিশ্বাস্য দু:সাহস দেখিয়ে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা:) হাতে গোনা কিছু সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করলেন পরাশক্তি শাসিত ভয়ংকর শত্রু দেশ মিসরে। তাদের জন্য পাতা হলো 'মৃত্যুফাঁদ'। তারা কি পারবে মিসরের একটি কেল্লাও জয় করতে ? নাকি পারবে নিজেদেরকে নিষ্ঠুর মিসরীয় সৈন্যদের মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বাঁচাতে ?

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা